বিষাদগাথা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী




বিষাদগাথা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

বিষাদগাথা

বিষাদগাথা

অমরেন্দ্র চ. বর্তী

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
www.swarnakshar.in

BISHADGATHA
A Novel by Amarendra Chakravorty

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৩

ISBN : 978-81-86891-76-6

প্রকাশক
সর্বাণী চক্রবর্তী
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন ২২৮৩-২৩২০, ২২৮০-৮৮১৮ ফ্যাক্স ২২৮৭-৬৪৪৮
ই-মেল info@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট www.swarnakshar.in
লেখকের ওয়েবসাইট www.amarendrachakravorty.com

মুদ্রক
বর্ণনা
৬/৭, বিজয়গড়
কলকাতা-৭০০ ০৩২

প্রচ্ছদ অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
শিরোচিত্র যুধাজিৎ সেনগুপ্ত
হরফ বিন্যাস স্বর্ণাক্ষর

সূচি

২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫
৪৬



১

. ামের পুবদিকে চালাঘরের হাসপাতাল, পশ্চিমে মরা নদী । বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে তার ওপর দিয়ে ঝিঙে-চিচিঙ্গা বোঝাই গোরুর গাড়ি চলে, রাস্তা সংক্ষেপ করতে চালের সাইকেল ছোটে । মরা নদীর ওপার থেকে ফুঁসতে ফুঁসতে কালবৈশাখী এসে পুবের গ্রামীণ হাসপাতালের প্রসবকালীন আর্তনাদও উড়িয়ে নিয়ে যায় । মাইলের পর মাইল শূন্য ভূমির ওপর হাওয়ার শব্দ কখনও হা-রে-রে-রে, কখনও হাহাকারের মতো শোনায় ।

একশো বছর আগেও এই নদী বইত । এই সেদিনও খাল, নালা, জল-কাদার চেহারা ধরে আনুমানিক ভাবে বেঁচে ছিল নদীটা । এখন দীর্ঘ বাদা অঞ্চলের পাশাপাশি আরও দীর্ঘ শুধুই নদীর কবর, মাঝে মাঝে দুয়েকটা রক্তমাখা ভাঙা পাঁজরের মতো ছেঁড়া ছেঁড়া নালা । বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে বাদা শুকিয়ে গেলে খালও শুকিয়ে যায় । গ্রামের বৃদ্ধরা শুধু হাওয়ায় নদীর দীর্ঘশ্বাস শোনে । এ-ভাষাও তাদের । তাদেরই কেউ কেউ এখনও বলাবলি করে- এই নদী বেয়ে ভেলায় লখিন্দরকে নিয়ে বেহুলা স্বর্গরাজ ইন্দ্রের সভায় গিয়েছিল । কেউ বলে লখিন্দরের বাবা চাঁদ সদাগর এ পথে নৌকোযাত্রা করেছিল । কারও কারও মতে, এটা বড় কোনও নদীই নয়, নামহীন একটা শাখানদী মাত্র ।

গোটা বালিসোনা গ্রামেই ঘরদোর কম, রাস্তাও কম, একটাই অপ্রশস্ত পিচরাস্তা, তিন জায়গায় বাঁক খেয়ে বড় শহরের দিকে চলে গেছে । সবুজই এ-গ্রামে বেশি । শুধু বালিসোনা গ্রামেই না, আশপাশের আরও ষোলটি গ্রাম জুড়ে গোটা বালিসোনা অঞ্চলেই অসীম সবুজ ।

এতো গাছপালা পরের চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে ক্রমশ উজাড় হয়ে যাবে । ঘরবাড়ি দোকান-বাজার, সেলুন, টিউটোরিয়াল হোম, মলমূত্ররক্ত পরীক্ষার ক্লিনিক, চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকান, রেস্টোর্যান্ট, আর মানুষের অবিরাম ভিড়ে এই নির্জন গ্রাম সব সময় চিৎকার করতে থাকবে । ক্রমশ এখানে দেখা যাবে অসংখ্য বিউটি পার্লার, কিন্ডারগার্টেন, নার্সিং হোম (গোপন গর্ভপাতের ব্যবস্থাসহ), লাইসেন্সড ও বিনা লাইসেন্সের

বার, মদের দোকান, জুয়ার আড্ডা, রাজনৈতিক দলের আঞ্চলিক অফিস, চওড়া রাস্তা, বাস, লরি, রিকশা, জিপগাড়ির ভিড় ।

তখন হারানো নদীরও নতুন আখ্যান রচিত হবে ।

হাসপাতালের মাটির ঘরে তার প্রথম সন্তান ফুটফুটে এক কন্যা- প্রতিবেশিনীর মুখে ভর সন্ধেবেলা এই সংবাদ শুনে সদ্য জমিদারি প্রথার অবসানে অসহায় অবনীমোহন চোধুরী বটতলার জনশূন্যিমোড়ের 'গাঁজা ও আফিংয়ের দোকান' থেকে কেনা এক ডেলা আফিং মুখে ফেলে দিলেন । মাথার ওপর বাপ আর বড় দাদারা থাকায় নিজের মধ্যে তাঁর কখনও জমিদারির বোধ ছিল না । তার ওপর বার বার নিজেদেরই বাগানের আম-কাঁঠাল চুরি করার অপরাধে দুমাস আগে তিনমাসের মেয়াদে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করা হয়েছে । জমিদারবাড়ি ছেড়ে এখন কাছেই একটা ছোট একতলা বাড়িতে তাদের থাকার ব্যবস্থা । প্রথম সন্তানও ভূমিষ্ঠ হল তাঁর এই চরম দুঃসময়ে ।

তালাক দেওয়ার মতো ত্যাজ্যপুত্র করার আদেশ শুনে ভুবনমোহন চৌধুরীর পঞ্চম সন্তান অবনীমোহন দমকা হাওয়ার মতন বাবার ঘরে ঢুকে বলেছিলেন, 'আপনি কি চান সরোজিনীকে নিয়ে আমি হাতানিয়া-দোয়ানিয়ায় গিয়ে ঝাঁপ দিই?'

অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেডমাস্টারের বউ তার ভাগের সকালের জলখাবার এক পোয়া নীলচে দুধ আর সিকি পাউন্ড পাউরুটি নার্সের চোখ এড়িয়ে তার ছেলের অ্যালুমিনিয়ামের কৌটোয় ঢেলে দিচ্ছে, পাশের খাটিয়ার ছোট জমিদারগিন্নি তাঁর বাচ্চা নিয়ে চলে যাচ্ছেন দেখে তাঁর দিকে তাকিয়ে চোখে হাসল । সেই হাসিতে সংকোচ অপরাধ ও অভ্যস্ত প্রণাম মিশে আছে । নার্স চলে যেতে আরও কয়েকজনের আসন্নপ্রসবা স্ত্রী তাদের বরাদ্দ দুধ-পাউরুটি ঘর থেকে আসা তাদের ছেলেমেয়েদের কৌটোয় সন্তর্পণে ঢেলে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ।

'তোর বাপকেও দিস এট্টু । রোজ দিস তো? গাছ থেকে পড়বার পর এগবারে অথব্ব হয়ে গেছে!' এক চাষী-বউ তার চার বছরের ছেলের মাথার চুল হাত দিয়ে গুছিয়ে দিতে দিতে বলল ।

ছেলেটি ডাইনে মৃদু মাথা হেলিয়ে জানাল, দেব । তার চোখদুটিতে সব সময় ঘুমভাঙা স্বপ্নের ঘোর, তাই সবাই তাকে নিদ্দা বলে ডাকে । ভালো নাম কেউ এখনও দেয়নি ।

বাপের নাম ফণাধর পদ্মরাজ । জন্মের পর-পরই শিশুর শিয়রে ফণাধর সাপ এসেও ছোবল না দিয়ে জঙ্গলে ফিরে গিয়েছিল, সেই গল্প দিনে অসংখ্যবার অসংখ্য জনকে বলতে বলতে নামই হয়ে গেল ফণাধর ।

ছোট জমিদারগিন্নি সরোজিনীকে তিন বছর আগের ফুলশয্যার রানির সাজ ছাড়াই পরমাসুন্দরী বলে চেনা যায় । শিশুকন্যা সহ রিকশায় তুলে তাদের আলাদা ছোট বাড়িতে নিয়ে গেলেন জমিদার বাড়ির সেজোগিন্নি ।

‘কী দিয়ে মেয়ের মুখ দেখবে দ্যাখো, ঠাকুরপো!’

অবনীমোহন নিজের ঘরেই দেওয়ালে আয়না ঝুলিয়ে দাড়ি কামাচ্ছিলেন । মেয়ের মুখ দেখলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে । পিতৃমুখী মেয়ে । যদি তার মায়ের সঙ্গে তাঁরও রূপ পায় তাহলে তো দারুণ সুন্দরী হবে, কিন্তু যদি বাপ-মার ভাগ্যও পায়, তাহলে?

মেয়ের নাম রাখা হল- লক্ষ্মীপ্রতিমা ।

অবনীমোহনকে সাময়িক ত্যাজ্যপুত্র করলেও ভুবনমোহন চৌধুরী তাঁর বড় ছেলের অকালমৃত্যুর পর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পৌত্র-পৌত্রীদের আনুমানিক সংখ্যা ধরে সকলের শিক্ষাখাতে সমপরিমাণ অর্থের আলাদা তহবিল তৈরি করে দিয়েছেন । সেই তহবিল থেকে লক্ষ্মীপ্রতিমাকে ভরতি করা হল গ্রামেরই বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়ে । কয়েক বছরেই দেখা গেল গণিতে তার অসাধারণ ক্ষমতা । বড় বড় যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সে নিমেষে করে ফেলে, অনেক সময় খাতায় না কষে মুখে মুখেই ফল বলে দেয় ।

প্রতি বছর ক্লাসে ওঠে ফার্স্ট হয়ে । তার রূপে ক্লাসঘর আলো হয়ে যায় । মায়ের আগ্রহে ও যত্নে চলতে লাগল তার নৃত্যশিক্ষা ও যোগব্যায়াম । একদিন হেড মিস্ট্রেস নিজে এসে সরোজিনীকে বললেন, ‘বলতে খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু না বলে পারছি না । আপনার মেয়েকে আপনি স্কুল ছাড়িয়ে দিন । বাড়িতে রেখে পড়ান, স্কুলের পর আমরাই না-হয় একেকজন স্কুল থেকে এসে ওকে পড়িয়ে যাব । পরে শুধু পরীক্ষাটা সেন্টারে গিয়ে দেবে । মেয়ের আপনার যা রূপ, আমাদেরই ভয় করে!’

তেরো বছর বয়সে তাকে কলকাতায় তার মেজজ্যাঠার বাড়িতে রেখে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হল । সেখানে তার বিধবা জ্যাঠতুতো দিদির সস্নেহ তত্ত্বাবধানে স্কুলের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত যাবতীয় লেখাপড়া ও রূপচর্চা ।

অবনীমোহনের সন্ধের আফিংয়ের নেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গতবছর নয়া পয়সা চালু হওয়ার আগের মুদ্রা জমানো । মেয়ের রূপ নিয়ে কোনও বিপদের আশংকা তার মনেই আসে না । মেয়ে তার মুখশ্রী পেয়ে রূপবতী হয়ে বেড়ে উঠছে দেখে তার ভালো লাগে । মেয়ের ভাগ্য নিয়েও তার ভয় কেটে গেছে । সে নিজে ম্যাট্রিকে দুবার অঙ্কে ফেল করে তৃতীয়বার ম্যাট্রিক পাশ করেছিল । মেয়ে প্রথম থেকেই অঙ্কে একশোয় একশো পেয়ে আসছে । গুণেই যখন এতটা তফাৎ, ভাগ্যও তখন নিশ্চয়ই তার বিপরীত হবে ।

কতটা বিপরীত তা বোঝা গেল কয়েক বছর পর ।

ভণ্ডুল বরাবর বেলায় গিয়ে রেলস্টেশনের চায়ের দোকান থেকে ষোল নয়া পয়সায় ‘যুগান্তর’ এনে দেয় । ‘যুগান্তর’ না পেলে পনের নয়ায় ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ । যুগান্তরের প্রথম পাতায় একদিন তাদের লক্ষ্মীপ্রতিমার বড় ফটো দেখে চৌধুরীবাড়িতে শোরগোল পড়ে গেল । লক্ষ্মীর মাথায় রানির মুকুট । বুকের ওপর উত্তরীয়ের মতো চওড়া ফালির গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা- MISS INDIA.

ছোট মেয়ে সরস্বতীপ্রতিমারও বিদ্যাভাগ্য নিয়ে অবনীমোহন যতটা নিশ্চিন্ত, প্রথম জীবনে তার সাংঘাতিক ভাগ্যবিপর্যয় বিষয়ে ততটাই অজ্ঞ ছিল । দৌহিত্রীর সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ভুবনমোহনকে কোনওদিন জানানোই হয়নি ।

ভুবনমোহনের রোজকার অভ্যাস পড়ন্ত বেলা থেকে সন্ধে নামার আগে পর্যন্ত লাঠিতে ভর দিয়ে বাড়ি থেকে তিনশো পঞ্চাশ পা হেঁটে এসে রাস্তার ধারে শিরীষগাছের তলায় তাঁর ঠাকুরদার কবরের অদূরে চেয়ারে বসে পথচলতি মানুষজনকে কুশলজিজ্ঞাসা করবেন । কাউকে কাউকে ডেকে বাড়িতে এসে একদিন ভোজ খেয়ে যাবার নেমন্তন্নও করবেন । তাঁর পরনে রোজই ধপধপে ফিনফিনে ধুতি আর ঘিয়ে রঙের সিল্কের ফতুয়া । আগের আমলের অনেকেই, চাষি, ধোপা, মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর, আসা-যাওয়ার পথে তাঁকে কেউ গড় হয়ে, কেউ জোড়হাতে নমস্কার জানিয়ে যায় । তাদেরও নেমন্তন্ন করেন । ‘একদিন’ মানে কোন দিন তা কখনও বলেন না । যারা তাঁকে চেনে তারা তৎক্ষণাৎ হেসে সম্মতি জানিয়ে যে যার পথে চলে যায় । অচেনাদেরও অনেকে থেমে দাঁড়িয়ে ভুবনমোহনের কথা শোনে, কেউ অবাক হয়, কেউ ‘নিশ্চয়ই আসব একদিন’ বলে মুচকি হেসে নিজের পথে এগোয় ।

সন্ধের ঠিক আগে তার খাস চাকর ভণ্ডুল যখন ভুবনমোহনের পূর্বপুরুষের ভারি চেয়ারটা তুলে নিয়ে যেতে আসে, ভুবনমোহন লাঠি ভর করে তার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলেন, ‘জেলেদের বলে রাখিস, পশ্চিমের বড় পুকুরে জাল ফেলতে হবে । চাঁদোখালির গয়লাদের একবার দেখা করতে বলিস । এবার অনেককে নেমন্তন্ন করা হচ্ছে ।’

ভুবনমোহন আগে বসতেন তাঁদের রাসমাঠে, প্রতিবছর রথযাত্রার পরে যেখানে তাঁদের পারিবারিক পাঁচতলা রথ ধুলো খায়, গায়ে মাকড়শা জাল বোনে, চৈত্র-বৈশাখে কাক বুলবুলি বাসা বাঁধে, সেই রথের ছায়ায় । যেদিন রাসমাঠে তেমন তেমন হাওয়া দেয় সেদিন শিরীষের ডালপালা তার মাথায় চামর দোলাত ।

এখন বসেন ঠাকুরদার কবরের কাছাকাছি, বাসরাস্তার ধারে ।

এই কবর তাঁদের বংশের প্রথম কবর । ঠাকুরদার আমলেই দাহ করার বদলে কবর দেওয়ার সূচনা ।

ভুবনমোহনের ঠাকুরদা মুরলীমোহন পরমাসুন্দরী পত্নী কুসুমবালাকে তার প্রথম যৌবনেই হারিয়ে দুঃখে পাগল হয়ে অবিকল-ঘুমন্ত স্ত্রীর শবদেহ আঁকড়ে ধরে বলেছিলেন, ‘কুসুমকে আমি পোড়াতে দেব না!’

সবাই মিলে অনেক বুঝিয়েও তাঁকে শান্ত করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত কবিরাজের পরামর্শে নানা কৌশলে অনেকটা আফিং খাইয়ে দেওয়া হল । তাতেও তাঁকে ঘুম পাড়ানো গেল না, তাঁর কুসুমকে কিছুতেই কাছ ছাড়া করবেন না ।

শ্মশানযাত্রার পুরো পথটাই তাঁকে শবদেহের পাশাপাশি চলতে দেখা গেল। কয়েকবার তাঁর আকুল অনুনয়-বিনয়ে ফুলে ঢাকা শববাহী খাট তাঁর চোখের নাগালে নামিয়ে আনতে হল। ঘুমন্ত কুসুমবালার মুখ থেকে তিনি চোখ আর সরাতে পারেন না। হরিধ্বনি সহকারে খাট আবার ওপরে উঠে গেলে তাঁর দৃষ্টি আরও ওপরের আকাশে প্রিয় পত্নীর উপযুক্ত বাসভবনের জমি খুঁজে বেড়ায়।

বালক ভুবনের জ্বলন্ত প্যাঁকাটি ধরা হাত দুহাতে ধরে কুল-পুরোহিতকে শবদেহের মুখাগ্নি করিয়ে দিতে দেখে মুরলীমোহন অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গিয়ে ঢুলুঢুলু চোখে দাহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চিতার আগুনের নৃত্যরত শিখার দিকে চেয়ে রইলেন।

সে-বছরই ফাগুন মাসে পাশের ছ-আনির জমিদার অধিকারী বৈষ্ণবদের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিলেন। অধিকারীরা মৃত্যুর পর শব দাহ করে না, গর্তে বসিয়ে কবর দেয়।

'জীবনের অন্তে তোমার আর তোমার সন্তানদের দেহ যদি মাটিতে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দিতে চাও, সে তোমার সিদ্ধান্ত, কিন্তু আমি আমার পিতৃ-পিতামহের শাস্ত্রের বিধান পাল্টে দিতে পারব না। আমাকে আর তোমার গর্ভধারিণীকে যেন শাস্ত্রমতে শ্মশানে নিয়েই দাহ করা হয়।'

ঠাকুরদা তাঁর বাবার আদেশমতো প্রথমে মা ও পরে বাবার মরদেহ শ্মশানে দাহ করার পর নিজেকে দিয়েই চৌধুরী পরিবারে কবরপ্রথা চালু করেন।

ছাদহীন, ঘুনধরা, ইট বের করা দেওয়ালে ঘেরা এই কবরগৃহের কাছে বসে রাস্তার মানুষ দেখা ভুবনমোহনের নেশার মতো।

আরও কয়েক বছর পরে ভণ্ডুল তাঁকে ধরে ধরে বসিয়ে দিয়ে যাবে বাড়ির সামনের পায়ে-চলা রাস্তার পাশে বকুলবেদির গা ঘেঁসে।

শিরীষতলা থেকে বাড়ি ফিরে ভুবনমোহন শ্বেতপাথরের গেলাসে বংশের ধারা মেনে রোজকার মতো হুইস্কি সোডা ও বরফকলের কাঠের গুঁড়োমাখা বরফ নিয়ে বসতেন। চাকরই বরাবরের মতো টেবিলে সাজিয়ে দিত।

তাঁর বাবার আমলে দারোগাকেও এই টেবিলেই হুইস্কি পানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নিজেরা নতুন বৈষ্ণব, সম্পূর্ণ নিরামিষাশী, তাই আস্তাবলে মুসলমান সহিসকে দিয়ে আগেই আস্ত মুরগি রোস্ট করা হয়েছে।

সরু বাসরাস্তা যেখানে মরা নদীর দিকে বেঁকে গেছে, সেই রাস্তার দুধারে তিনমাইল-কপিখেতে ভোরবেলা চাষিদের ওপর লাঠি বর্শা বল্লম নিয়ে জমিদারের লেঠেল বাহিনীর ঝাঁপিয়ে পড়ার দিনই বেলার দিকে এই দারোগা-আপ্যায়ন। আক্রান্ত হয়েই চাষিরা তাদের হাতের কাস্তে কোদাল নিড়ানি নিয়ে লড়াই শুরু করার পরে পরেই গ্রামের সব মেয়ে-বউ

বঁটি, খুন্তি, কাটারি, শাবল হাতে, অঘ্রাণের হিমেল হাওয়ায় শত্তুরের উদ্দেশে শাপ-শাপান্ত ছড়িয়ে স্বামী সন্তান ভাই ভাসুরদের সঙ্গে যোগ দেয় । ভুবনমোহনের তখন যৌবনকাল ।

দূর-শহরের এক শিল্পপতির কাছে এইসব জমি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, অথচ চাষিরা তখনও তাদের চাষ ছাড়েনি, তাই এই আক্রমণ । এখন সেই সুদীর্ঘ কপিখেতে প্লাইউডের কারখানা, গ্রিল কারখানা, আলকাতরায় লেখা ‘সাইট ফর গণপতি বিড়ি ফ্যাক্টরি’, রাস্তার ধারেই নতুন দেখা যাচ্ছে পাঁচিল-ঘেরা ‘সাইট ফর ঝুনঝুনওয়ালা টাইলস’ ।

এখনও জমিদারের সেই চাষি-উচ্ছেদ ‘কপিখেতের যুদ্ধ’ হিসেবে উল্লেখ করা হয় । জেলার একপৃষ্ঠার পাক্ষিক সংবাদপত্রে সেসময় এই যুদ্ধের বিবরণ ছাপা হয়েছিল । সেবার চাষিদের সাতটি শবদেহ ভোরের কুয়াশা থাকতে থাকতে বাদার শুকনো নদীবক্ষ খুঁড়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গোর দেওয়া হয় ।

রোস্টেড মুরগি সহযোগে মদ্যপান ছাড়াও নগদ পাঁচশো টাকা, সেইসঙ্গে এক কার্টন ভ্যাট সিক্সটিনাইন নিয়ে দারোগাসাহেব ভুবনমোহনের পিতৃদেব জগন্মোহন চৌধুরীকে মার্বেলের মেঝেয় সশব্দে পা ঠুকে স্যালুট করে থানার অন্দরে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে যান । বিকেলে থানায় এসে রিপোর্টে লেখেন- ভোরে অত্যধিক ঘন কুয়াশায় জমির পারস্পরিক সীমানা-বিভাজক আলগুলি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় চাষিরা নিজের নিজের খেতের অধিকার নিয়ে প্রথমে বচসা, তা থেকে অ্যাবিউজিং ও তা থেকেই কোদাল কাস্তে নিড়ানি নিয়ে প্রচণ্ড মারামারি করে আহত হয় ও আহত করে । তবে কারও আঘাত মারাত্মক নয় । জমিদারের লোক খবর পেয়ে স্থানীয় হাসপাতালের টিংচার আইডিন প্রয়োগে সকলকে সুস্থ করে তোলে ।

জেলার এস পি সাহেবকে রিপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা করে দারোগাসাহেব নিজের জিপে বেরিয়ে যান ।

জমিদারির এই শেষ যুদ্ধের রক্তপাতের পর এ-অঞ্চলে আর কোনও বড় রক্তপাত কেউ দেখেনি । আবার রক্তের ধারা বইতে দেখা যাবে এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পর, ততদিনে পুরো জেলাটা ভেঙে দুটো আলাদা জেলা করা হবে । বালিসোনা হবে জেলার সদরদপ্তর ।



২

অবনীমোহনের ছোট মেয়ে সরস্বতীপ্রতিমার জ্ঞানহীন দেহ প্রথম দেখেছে মন্থরোর মা । বাদায় নদীর শুকনো বুকে শাড়ি শায়া ব্লাউজ ধুলো-কাদা মেখে পড়ে আছে । চোখ মুখ গামছা দিয়ে শক্ত করে বাঁধা, দুহাত বাঁধা গোরুর দড়ি দিয়ে । কলকাতায় পার্ক সার্কাস এলাকায় স্থানীয় বনধ ঘোষিত হওয়ায় লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজও আজ বন্ধ । হঠাৎ ছুটির সুযোগ কাজে লাগিয়ে বেলা থাকতে থাকতে সরস্বতী গিয়েছিল দূরে কোথাও নদীর কোনও ঘাটে বসে নাকি বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী লিখেছিলেন বা লিখতে শুরু করেছিলেন তার খোঁজে ।

মন্থরোর মা আসছিল জমিদারের বড় নাতি দিল্লি থেকে এসেছে, তাকে এক ডজন তিতির দিতে অর্থাৎ বিক্রি করতে । চোখে ভালো দেখে না । কোমর প্রায় নব্বই ডিগ্রি ভেঙে হাঁটে, বাদা দিয়ে আসবার সময় সরোকে সে ঠিকই চিনিছে । দুই বোন লক্ষ্মীপ্রতিমা আর সরস্বতীপ্রতিমাকে শিশুকাল থেকে সবাই 'নকো-সরো' বলেই ডাকে ।

অবনীমোহন সেজো ও ন'বউকে নিয়ে মন্থরোর মার সঙ্গে প্রায় ঝড়ের মতো যখন অকুস্থলে পৌঁছলেন তখন সেখানেও আদিগন্ত বাদার বুকে হু হু হাওয়া বইছে । অদূরে একটা গাবগাছের নিচু ডালে সরস্বতীপ্রতিমার বডিস গাছে আটকানো কাটা ঘুড়ির মতো ওলোট পালোট খাচ্ছে ।

সেজোবউ সঙ্গে আনা শাড়ি-চাদরে সরোকে ঢেকে দিল । হাত-মুখের বাঁধন খুলতে অবনীকে হাত লাগাতে হল । সরস্বতী গোঙাচ্ছে, হয়তো জ্ঞান এসেছে ।

বার বার কোল বদল করে দুই বউ সরোকে বাড়ি এনে মাদুরে শুইয়ে দিল । রক্ত ধুলো কাদা ধুইয়ে পরিষ্কার করে এবার শুরু হল রক্ত বন্ধ করার পারিবারিক টোটকা চিকিৎসা । পুলিশকে খবর দেওয়া যাবে না । অবনীমোহন মেয়ের ঠোঁট ফাঁক করে ঘন্টায় ঘন্টায় হোমিওপ্যাথি আর বায়োকেমিক ওষুধ খাওয়াতে লাগলেন ।

সরোজিনী স্বামীর তিন মাস নির্বাসনের মধ্যে একবার শীতলক্ষার মন্দিরে গিয়েছিলেন । বহু বছর পর আজ আবার দুই মেয়ের জন্য মানত করে ইট বাঁধার কথা মনে হয়েছিল ।

বাড়ি ফিরে ঘটনা শুনে প্রথমে থম মেরে গেলেন, তারপর নিঃশব্দে কাঁদলেন, তারপর মাঝে মাঝেই শুধু ভারি দীর্ঘশ্বাস শোনা যেতে লাগল ।

লাস্ট ট্রেনে রাত সাড়ে বারোটায় অবনীমোহনের পিঠোপিঠি ভাই, বছর খানেকের ছোট অম্বরীশ বহুদিন পরে সেদিনই বাড়ি ফিরল । গায়ে ছাইরঙা শক্ত মোটা কাপড়ের শার্ট প্যান্ট, স্বাস্থ্যও আগের চেয়ে অনেক ভালো । শক্তপোক্ত, পেটাই করা চেহারা, মুখটা পাথরের । অনেক বছর আগে গয়ানাথ মেথর ক্রুদ্ধ বচসার সময় মাথার মলভর্তি ড্রাম অম্বরীশের মাথায় ঢেলে দিয়েছিল । সদ্য-তরুণ অম্বরীশ রোজকার মতো দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে সামনের বকুলবেদীতে দাঁড়িয়ে মুখে দেবে বলে এলাচের খোসা ছাড়াচ্ছিল, দুপুরের এই সময়টা সে প্রায়ই বাড়ির সামনে এই বকুলবেদীতে দাঁড়িয়ে একটা গোটা এলাচ একটু একটু করে খায়, তখন এ রাস্তা দিয়ে গয়ানাথকে যেতে এর আগেও কয়েকবার নিষেধ করেছে, অনেকদিন পর আজ আবার এপথে বকুলবেদীর সামনে দিয়ে ভরা মলপাত্র মাথায় মিউনসিপ্যালিটির মেথর গয়ানাথকে যেতে দেখে তার মাথায় আগুন ধরে যায় । বৈশাখ মাস, কালবৈশাখির দেখা নেই, রাস্তার পিচ গলন্ত, মলের ভরা ড্রাম মাথায় গয়ানাথের সারা মুখ গলা দরদর করে ঘামছে ।

অম্বরীশ রাগে উত্তেজনায় বেদী থেকে এক লাফে নেমে এসে হুংকার দিয়ে বলল, ‘এই শুয়োর! এ রাস্তায় তোকে দুপুরে আসতে বারণ করেছি না!’

‘আপনাদের গু নিয়েই তো যেতে হয় ।’

‘জুতিয়ে তোর মুখ লম্বা করে দেব, শুয়ার!’

হঠাৎ কী হল, গয়ানাথ তার মাথার ড্রামটা অম্বরীশের মাথায় উপুড় করে দিল ।

এরপর থেকে গয়ানাথ নিরুদ্দেশ ।

অম্বরীশ গয়ানাথের খোঁজে সেই যে বেরল আর ফিরল না ।

বহুবছর পর যেদিন কলকাতা থেকে লাস্ট ট্রেনে অম্বরীশ ফিরে এল, আশপাশের গ্রাম ধরে পুরো অঞ্চলটাই কিছুটা বদলে গেছে । সেদিনই সকালে সরোকে বাদা থেকে তুলে আনা হয়েছে । অত রাতেই সে ঘটনাটা বিস্তারিত শুনে, সরোর জ্ঞান ফিরেছে জেনে তার ঘরে গিয়ে মেয়েটার মাথায় খানিকক্ষণ হাত বুলোল, তারপর বলল, ‘ওরা ক’জন ছিল?’

অনেক সান্ত্বনা ও সাধাসাধির পরও বহুক্ষণ চুপ করে থেকে সরো উত্তর দিল ‘দুজন’ ।

‘চিনতে পেরেছিলি?’

আবার চুপ, তারপর কঁকিয়ে উঠে বলল, ‘গগন আর জালালউদ্দীন ।’

অম্বরীশ জিজ্ঞাসু চোখে ভাইয়ের দিকে তাকায় ।

অনেক সময় নিয়ে অবনীমোহন প্রায় অচেনা স্বরে বলল, ‘দুজনের ঠাকুরদাই কপিখেতের যুদ্ধে ঠাকুরদার বাহিনীর বল্লমে প্রাণ দিয়েছে । ভোরের কুয়াশায় অন্যদের সঙ্গে ওদেরও বাদায় পুঁতে ফেলা হয়েছিল । তুইও তো জানিস ।’

'ওদের ছেলেদের, তাদের ছেলেদেরও চিনি। আমি আসছি।'

ওই পোশাকেই রাতের অন্ধকারে অম্বরীশ বেরিয়ে গেল।

ফিরল প্রায় তিনঘন্টা পর।

অবনীমোহন কিছুক্ষণ ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা পড়বার চেষ্টা করে বলল, 'এত রাতে গিয়েছিলি কোথায়?' অম্বরীশকে নিরুত্তর দেখে এবার বলল, 'তুই কি আর্মিতে আছিস? গয়ানাথের খোঁজ পেয়েছিলি?'

'ওর খোঁজেই এসেছি। তুই জানিস কিছু? নিশ্চয়ই ফিরে এসেছিল?'

'তুই যাবার কিছুদিন পরই ফিরেছে। চাকরির কথা বললি না তো?'

'আর্মিতে ছিলাম। তারপর জাহাজে। এমাসেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। মুসৌরিতে একটা বাড়ি কিনেছি, এরপর ওখানেই থাকব।'

'বিয়ে করেছিস?'

'করবও না। প্রথম সবজির ট্রেনটা ক'টায় যেন এখানে আসে?'

'রাত ৩টে ৫৪-য়।'

'বাবা এখন কীরকম?'

'একইরকম। এখনও গিয়ে বসে, সবাইকে নেমন্তন্ন করে।'

'সরোকে বলিস, যারা ওর সর্বনাশ করেছে তাদের সঙ্গে ওর আর কখনওই দেখা হবে না। আর আমি যে বালিসোনায় এসেছি সেকথা কেউ কখনওই যেন জানতে না পারে।'

গয়ানাথকে তার চালাঘরে নয়, যে ঘাস-ওঠা সরু পথটা পুকুরপাড় ঘেঁসে তার গোবর নিকোনো উঠোনে ঢুকে গেছে, সেই মেটেপথের ওপর পাওয়া গেল। চোলাই খেয়ে দ্বাদশীর জ্যোৎস্নায় মুখ হা করে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সাইলেন্সার লাগানো রিভলবারের দুটো গুলিতে তার প্রাণ বেরিয়ে যাবার পরও পা দিয়ে ঠেলে তাকে পুকুরে ফেলে দেওয়া হল।

পরদিন একপৃষ্ঠার 'পাক্ষিক সংবাদ'-এ বড় হরফে ছাপা হল- 'আততায়ীর গুলিতে তিন তাজা প্রাণ হল বলিদান। পুলিশ যাই বলুক, জালালউদ্দীন ও গগনকে গুলি করেই মারা হয়েছে। গয়ানাথের মৃত্যুও জলে ডুবে নয়, গুলিতে।'

জালালউদ্দীন আর গগন দুজন তাদের পাড়ার দুপ্রান্তে থাকে, কিন্তু দুজনকেই পাওয়া গেল বাদার গাবগাছের ডালে। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে।

এর কয়েক বছর পর অম্বরীশ মুসৌরিতে নানা উদ্ভট কাজের কল্পনায় কাটিয়ে বাড়ি বেচে কলকাতায় ফিরে এল। সেখানে তার সমাজসেবার কাজে বাড়িতে লোক আসা-যাওয়ার বিরাম নেই।

কলকাতায় রোজই অম্বরীশের বেশ কয়েকবার স্নানের অভ্যেস। তার দীর্ঘ স্নানের সময় কেউ এসে বসে আছে দেখলে নেপালি বালকভৃত্য বাথরুমের দরজায় কপাল ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করবে 'বর্তমানে কে? নেপাল রুনছা, হিমল রুনছা, বর্তমানে কে?'

'তোর ভবিষ্যৎ রে ব্যাটা!' দু-তিনবার একই প্রশ্ন শুনে বাথরুম থেকে অম্বরীশের উত্তর ।

মুসৌরির হোটেলে কাজ খোয়ানোর পর অম্বরীশ ছেলেটাকে পাহাড়ের কোলে তার দু-ঘরের দেড়তলা বাড়িতে এনে কাজে বহাল করেছিল । কলকাতার বাড়িতেও সে-ই তার দিনরাতের সেবক । প্রভুর কাছে বাংলা শিখে সে বাথরুমকে 'বর্তমান' বলতে পারে ।

বরাবরের বিজয়ী দলের টিকিটে বিধানসভার ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনগুলোয় বাড়িতে বাইরের লোকের ভিড় খুব বেড়ে গেল । সব সময় কেউ না কেউ আসছে । তখনও 'বর্তমানে আর কতক্ষণ?'বলে বাথরুমের বন্ধ দরজার সামনে গান ধরবে- 'নেপাল রুনছা, হিমল রুনছা, বর্তমানে কতক্ষণ?' (নেপাল কাঁদে, হিমালয় কাঁদে, বাথরুমে আর কতক্ষণ?) সব কথাতেই নেপাল রুনছা, হিমল রুনছা বলা তার অভ্যাস ।

ভোটে হেরে কলকাতার পাঠ তুলে বালিসোনায় পাকাপাকি ফিরে আসবার সময়, বাড়ির চিলেকুঠুরি অনাথ ছেলেটাকে লিখে দিয়ে অম্বরীশ তার বাড়ি বিক্রি করে দিল ।

পরের বছর বালিসোনার মিউনিসিপ্যালিটি ভোটে জয়ী হয়ে সে চেয়ারম্যান হয়ে বসবে ।



৩

ভুবনমোহন বাড়িতেই রেজিস্ট্রার আনিয়ে ‘তেইশবিঘা-আমবাগান’ বিক্রির দলিল রেজিস্ট্রি করাচ্ছেন, এমন সময় প্রদীপ, অকাল-প্রয়াত জ্যেষ্ঠপুত্রের একমাত্র সন্তান, যে দুদিন আগে দিল্লি থেকে ক’দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে, ঘরে ঢুকে বলল, ‘ঠাকুরদা, আপনি নাকি সব বাগান বেচে দিচ্ছেন? আপনি নিশ্চয়ই জানেন, যে গ্রামে বা যে শহরে আমাদের বসবাস সেখানকার কোনও রূপান্তর উচিত না অনুচিত আগে সেটা বিচার করা দরকার?’

ঠাকুরদা অবোধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছেন দেখে প্রদীপ বলে চলল, ‘সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব জায়গায় কতগুলো অদলবদল ঘটে, সেটা ভালোর দিকে, না মন্দের দিকে যত আগাম বোঝা যায় ততই মানুষের ভালো।’

‘বাগান না বিক্রি করলে আমাদের চলবে কী করে? নেমন্তন্নও তো অনেক লোককে করতে হয়। বিক্রি করছি শুধু তেইশ-বিঘাটা।’

‘কাকাদের মধ্যে যারা কোনওদিন কিছু করেনি তাদের কাজ করতে বলুন। চাকরি বা ব্যবসা যে-কোনও একটা কাজে লাগতে বলুন। বাগান বেচে না দিয়ে বাগানের ফল বেচেও তো ব্যবসা হতে পারে। তেইশ বিঘা বাগান অন্যের হাতে গেলে তারা হয় গাছ কেটে কারখানা বসাবে, নয়তো সিনেমা হল বানাবে। আগে সিনেমা দেখতে এখানকার লোককে ট্রেনে পনেরো মাইল যেতে হত, এখন এখানেই তিনটে সিনেমা হল। এভাবে এই অঞ্চলটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ঠাকুরদা। জায়গাটার চরিত্রই বদলে যাচ্ছে। এ তো কুরূপান্তর। বদলাতে হলে চাই সুরূপান্তর। যাতে মানুষের ভবিষ্যৎটা ভালো হয়।’

ঠাকুরদা নাতির মুখে একসঙ্গে এত কথা কোনওদিন শোনেননি। বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘তোমার বাবা-কাকারা আমার মুখের ওপর কোনওদিন কথা কয় না, দু-দিন দিল্লি গিয়ে তুমি আমার সাতপুরুষের জায়গা-জমির চরিত্র বুঝে গেলে?’

‘আপনার মুশকিল হচ্ছে বাইরের পৃথিবীটা আপনি একদমই জানেন না।’

ভুবনমোহন হঠাৎ প্রচণ্ড রেগে তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ কণ্ঠে হুংকার দিয়ে উঠলেন- ‘চোপ!’

শতবর্ষ পূর্ণ হবার তেরোদিন আগে সে-ই তাঁর শেষ কথা । এরপর আবার তিনি কণ্ঠস্বর ফিরে পাবেন একশো তিন বছর বয়সে, মৃত্যুর ঠিক এগারো মাস আগে ।

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের তিনমাস পর যখন তাঁকে কলকাতার হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে আনা হল, তখন কথা বলতে গেলে ঠোঁট বেঁকে যায়, গালের মাংস কাঁপে । কথা যেটুকু মুখ থেকে বেরোয় বোঝা যায় না । অথচ দৃষ্টি দেখে বোঝা যায় চারপাশের সবই তিনি নিরীক্ষণ করছেন ও বুঝতে পারছেন । শুধু বোঝাবার ক্ষমতাই নেই । স্লেটে বা কাগজে লিখে বোঝাতে গেলে তাঁর হাতের আঙুল এতই কাঁপতে থাকে যে তিনি স্লেটের ওপর চকখড়ি বা কাগজের ওপর কলম ধরতেই পারেন না । আরও একটু সুস্থ হলে ভুবনমোহনকে তার খাস চাকর ধরে ধরে পূর্বপুরুষের একই চেয়ারে বাড়ির কাছেই পায়ে-চলা পথের ধারে বকুলগাছের বেদীর সামনে বসিয়ে দিয়ে আসে । বাসরাস্তার তুলনায় এ রাস্তায় লোক চলাচল কম । চেনা-জানারা, একদা-প্রজা চাষি-মজুররা কত্তাবাবুর সামনে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে যায় । কেউ কেউ হাতজোড় করে, মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করে ।

ভুবনমোহন সবাইকেই কিছু বলেন, কাউকে কাউকে নেমন্তন্নও করেন, কিন্তু তার সেই কথা কণ্ঠ পায় না ।

আগের বার প্রদীপকে তিতির দেওয়া হয়নি, ‘সে যা একখানা বেজম্মা দিন গিয়েছেলো, হাতে তিতির, কিন্তু মাথার ঠিক ছেলো নি ।’ এবার প্রদীপ আসার খবর পেয়ে মন্থরোর মা আবার চারটে তিতির ধরে লাঠি ঠুকে ঠুকে কত্তাবাবুদের বাড়ি এসে হাজির ।

চত্বরের লাগোয়া বারান্দায় প্রদীপকে পেয়ে বলল, ‘কলকেতা থেকে নাতি আসবে বলেছেল, এলোনি, ইদিকে সাঁঝ নাগতে নেগেছে, ভাবলুম পাখি কটা তবে খোকাকেই দে’আসি । দাও বাবা, চার আনা পয়সা দাও ।’

চারটে তিতির পাখি প্রদীপের সামনে নামিয়ে রেখে মন্থরোর মা হাত পাতল । পাখিগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটার পা সুতলি দিয়ে বাঁধা, সেই অবস্থায় তারা ডানা ফরফর করে মাঝে মাঝে ওড়ার চেষ্টা করছে, হাঁপিয়ে গিয়ে দম নেবার চেষ্টায় তাদের ছোট্ট পেট ফুলে ফুলে উঠছে ।

প্রদীপ বেশ মুশকিলে পড়েছে । মন্থরোর মা জানে না, বেশ কিছুদিন হল সে আমিষ ছেড়ে দিয়েছে । যদি তিতিরগুলো কিনে নিয়ে পরে উড়িয়েও দেয়, তার দাম মাত্র চার আনা?

জোর করে বেশি দাম দিতে গেলে সে কিছুতেই নেবে না । বোঝাতে গেলে বা বেশি জোর করলে সে এই বলে কাঁদতে বসবে- ‘খোকাও আমায় ভিখিরি ভাবলি বাবা!’ প্রদীপ আগেও অনেকবার দেখেছে । বছর কয়েক আগে, একবার মন্থরোর মা দুটো নারকেল নিয়ে এসে এক টাকা চাইল । বাজারে দুটো নারকেলের দাম তখনই সাত-আট টাকার কম নয়, কিন্তু সেকথা বোঝায় কে! শেষ পর্যন্ত তাকে সাহস করে প্রদীপ একটা দু টাকার

নোট দিল । চোখে তো প্রায় দ্যাখেই না, একটাকা আর দু-টাকার নোটে নিশ্চয়ই তফাত করতে পারবে না । মন্থরোর মা নোটটার ওপর ঝুঁকে পড়ে আঙুল দিয়ে প্রথমে তার ধারগুলো ও পরে জমি ও তারপরে দুটোই একসঙ্গে পরীক্ষা করতে করতে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল- 'তুমিও আমায় ভিখিরি ভাবলে বাবা! তোর দরজায় আমি কি ভিখিরি এয়েছি, খোকা!'

প্রদীপের দিক থেকে সাড়া না পেয়ে মন্থরোর মা অধৈর্য হয়ে বলল, 'দাও বাবা, চার আনা পয়সার জন্যি আর বোস থাকতি পারি না । অ্যাতটা আস্তা, ঘরে ফিরতি আত হয়ে যাবে ।'

প্রদীপ একটু নির্দয় হয়ে বলল, 'মাছ-মাংস আমি ছেড়ে দিয়েছি দাদিমা ।'

সে যখন এই বাড়িতে হামাগুড়ি দেয় তখন থেকেই (পরে শুনেছে, তারও অনেক আগে থেকে) মন্থরোর মা তাদের বাড়িতে ডিম, দুধ, নারকেল এইসব দিয়ে যেত । কথা বলতে শিখে মন্থরোর মাকে সে দাদিমা বলে ডাকত । তার রাঙাকাকিই শিখিয়েছিলেন । আরও কেউ কেউ মাঝে মাঝেই মাছ ডিম দুধ মধু ইত্যাদি দিত, তারা ছিল ব্যাপারী, সেসব ছিল জমিদারের সেবায় তাদের ভেট ।

'তুমি কি নিমাই সন্নিসি হবে নাকি? কচি বয়েস, মাংস না খেলি চলে? এখনও বে-শাদিও করলে নি!'

আসলে মন্থরোর মার সঙ্গে আজকাল প্রদীপের বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ হয় না । থাকে দিল্লিতে, কালে-ভদ্রে ছুটি নিয়ে দু-চার দিন আসে, আসে বালিসোনার সবুজের টানে । ছোটবেলা থেকেই গাছপালা আর লেখাপড়ার শখ, এর কোনওটাতেই সময় তত দিতে পারে না- এই তার এক ক্রমবর্ধমান দুঃখ ।

'কই, বাবা?'

অগত্যা ঘর থেকে একটা সিকি এনে মন্থরোর মার হাতে দিয়ে বলল, 'তোমার কাজকম্ম কেমন চলছে, দাদিমা?'

মন্থরোর মা সিকিটা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে সামনের দিকে বৃথা খানিক চেয়ে থেকে বলল, 'দিন আর কাটে না বাবা । ওজ সুয্যি উঠতিছে, ওজ সুয্যি ডুবতিছে, কিন্তু মনি হয় ঝ্যানো সুয্যি উঠতিছেও না, ডুবতিছেও না ।'

মন্থরোর মার আসল নাম কী কেউ জানে না । আদপেই তার কোনও নাম আছে বা ছিল কিনা, জানার দরকারই হয় না । এ বিষয়ে কেউ কখনও কিছু ভাবেও না । পাড়ার কেউ মন্থরোর মার উঠোনে দাঁড়িয়ে মন্থরোকেই জিজ্ঞেস করে, 'মন্থরোর মা মাঠ থেকে ফিরেছে রে, মন্থরো?'

দাঁত খোঁটা মন্থরোর আযৌবন অভ্যেস, দাঁত খুঁটতে খুঁটতে সেও জবাব দেবে, 'মন্থরোর মা কি তোমার ঝ্যামন-ত্যামন বংশের মেয়েছেলে নাকি গো, বেলা তিনটেতেও মাঠে-ঘাটে

ঘুরে মরবে? কী, বিছের ওষুধ নিতে এয়েছো, না কাছিমের ডিম?’

বা হয়তো বলে (বিশেষ করে সন্ধেবেলা কেউ এসে ডাকলে), ‘মন্থরোর মা কি তোমার জন্যি ডুমুরের মধু নে’ বসে ওয়েছে যে অ্যাগবারে হত্যে দে’ পড়লে?’

ডুমুরের মধু মানে অবশ্য চোলাই মদ। মন্থরোর মা নিজে চোলাই করে না, শুধু ছাপ্লাই দেয়।

শুধু মন্থরোই না, মন্থরোর মাও তার আব্বাকে লতায়-পাতায় মুর্শিদাবাদের নবাবের বংশধর বলে বিশ্বাস করে।

মন্থরোর মা’র ‘নানা’ ভাতের সন্ধানে মুর্শিদাবাদের লালবাগে গোরুর মেটের মতো পাতলা ইটের জরাজীর্ণ আব্বা-নানার ভিটে আর তাদের পরিবারের নিজস্ব কবরস্থানের মায়া ত্যাগ করে ঘুরতে ঘুরতে বালিসোনার এই পশ্চিম সীমানায় এসে যখন ডেরা বাঁধে তখন এখানকার এইসব গ্রাম বলতে ছিল শুধু বন-জঙ্গল। জঙ্গলের শেষে জলা। মন্থরোর মা’র নানা জঙ্গল কেটে প্রথমে নিজের চাষ-বাস ও পরে ক্রমশ আরও পাঁচজনের চাষ-বাসের ব্যবস্থা করে। ক্রমে ক্রমে এখানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে চাষি তাঁতী জেলে কামার কুমোর গয়লাদের এনে বসায়। প্রথম প্রথম সে জমিদারকে কোনওরকম খাজনা দিত না। জঙ্গল কেটে জমি চাষ-বাসের যোগ্য করে তুলে সে নিজেকে এই নতুন জনবসতির একরকম জমিদারই ভেবে নিয়েছিল। তার পত্তন করা এলাকার নামও দিয়েছিল ‘ছোট লালবাগ’। পরে চৌধুরীবাড়ির চোরা কুঠুরিতে তিন রাত কয়েদ খেটে সে জমিদারের বশ্যতা মেনে নেয় ও খাজনা দিতে শুরু করে। তার শাদিও হয় এই নতুন বসতি করা ঘরের মেয়ের সঙ্গে। মাটিও নিল এখানেই। নানা বেঁচে থাকতে থাকতেই মন্থরোর মা’র আব্বার শাদিতে কার্বাইডের বড় বড় বাতি জ্বালিয়ে ঘটা করে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। তারপর গৌরবর্ণা সুন্দরী কিশোরী মন্থরোর মা’র শাদি হল, এই গাঁয়েরই ছেলের সঙ্গে। বছর চোদ্দ-পনেরো পরে চার ছেলে তিন মেয়ে রেখে সে-মানুষটাও মরে গেল। সেই থেকে মন্থরোর মা-ই সংসার চালায়। সে-সময় প্রদীপের মা বুকের শ্বেতিকে কুষ্ঠ ভেবে হতাশায় ভুগছিলেন। তার ওপর অদ্ভুত এক স্নায়ুরোগে কড়া ওষুধ খেয়ে দিনরাতের বেশির ভাগ সময় তার নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কাটত। সে-সময় প্রায় দুবছর মন্থরোর মা-ই তাঁর সবরকম সেবাশুশ্রূষাও করেছে। চব্বিশ ঘন্টা রোগী পরিচর্যার জন্য পাশের ছোট ঘরে তার থাকার ব্যবস্থা ছিল। ডাক্তার, মন্থরোর মা ও ভুবনমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র ছাড়া সে-ঘরে আর কারও প্রবেশের অনুমতি ছিল না। বড় বউরানির গর্ভসঞ্চারের খবর হওয়ার সাত মাস এগারো দিন পর শুধু একজন ধাই ওঘরে ঢুকেছিল। প্রদীপকে ভূমিষ্ঠ করিয়ে সে চলে যায়।

তা সেই এক-দেড় কুড়ি বয়েস থেকে আজ এই চার কুড়ি পেরনো বয়স অব্দি মন্থরোর মাকে করতে হয়নি, গোটা জেলায় এমন কাজ বোধহয় বেশি নেই। তাছাড়া উপায় কী,

বাপ-মরা অতগুলো ছানাপোনা নিয়ে বিধবা হওয়া- উদয়-অস্তে তা ধরো গে তোমার এক কুড়ি পেট । মজার কথা, মন্থরোও বুড়ো হত চলল, তবু আজও সে মাকে খাওয়ানো দূরের কথা, মা না হলে তাকেই উপোস করে থাকতে হত ।

মন্থরোর নিজের চার ছেলে সেয়ানা হয়ে কে কোথায় ছিটকে-ছড়িয়ে গেছে মন্থরো জানে না । ছোট ছেলেটাও মাঝে মাঝে চলে যায় । রাজমিস্ত্রির সঙ্গে যোগাড় দেয়, জনমজুর খাটে, মাটি কাটে । তখন চুলে খুব তেল দিয়ে টেরি বাগায় । তারপর চুলে ধুলো পড়লে বাড়ি ফিরে আসে । তখন রোজ রোজ শাক-ভাতে কি গুগলির ঝোলে বিরক্ত হয়ে কোনওদিন একমুঠো কাছিমের ডিম, কোনওদিন কয়েকটা পাখিটাখি খুঁজে আনে ।

মন্থরোর ছেলেরাই শুধু নয়, মন্থরোর মার মেয়েদের ছেলেমেয়েরাও কে কোথায় আছে, কে কে বেঁচে আছে, কাদের শাদি হয়েছে, কার ক'টা ছেলেমেয়ে হয়েছে- এসব হিসাবও মন্থরোর মা'র ভারি গোলমাল হয়ে যায় । একটা সময় ছিল যখন আশপাশের দু-চার গাঁয়ের সিকিভাগ ছেলেমেয়েই মন্থরোর মা'র নাতিপুতি । তারাও বেশিরভাগ অন্তত বছরে কোনও না কোনও সময় মন্থরোর মা'র বাড়িতে এসে থেকে যেত । মন্থরোর ছেলেরাও তখন বাড়িতেই থাকত । মন্থরোর মা তখন লোকের বাড়ি-বাড়ি দুধ বেচত, ডিম বেচত, ছালা ভরা নারকেল বয়ে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসত । তখনও যেটুকু জায়গা-জমি ছিল তাতে শশা ফলাত, বরবটি চিচিঙ্গা ফলাত । পালং মটর বুনত । কাজের তার শেষ ছিল না । তার কারণ মন্থরোর মা'র সারা জীবনে একটাই কাজ- যেভাবে হোক সংসারের দুটো ভাত যোগাড় করা ।

কার্তিক মাস শেষ হতে চলল, সন্ধের মুখে এখনই ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে । মন্থরোর মা এই বয়সে, এই কুয়াশায়, ঝাপসা অন্ধকারে লাঠি ঠুকে ঠুকে চলে যাচ্ছে, কোমর থেকে শরীরটা ভেঙে রাস্তার হাত তিনেক ওপরে প্রায় রাস্তার সমান্তরালে সে হাঁটে । মন্থরোটা একেবারে অপদার্থ । প্রথম থেকেই হাবা-গোবা তো ছিলই, তার ওপর বয়স হবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে যেন ক্রমশ আরও অপদার্থ হয়ে পড়েছে । মন্থরোর মা'র ছোট ছেলে দুটি বেঁচে থাকলে এই বয়সে তাকে হয়তো এত কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করতে হত না । মারা যাবার সময় ওদের কত আর বয়স । জন্মেছিল এক বছরের ব্যবধানে, মরল একই বছরে । তার মধ্যেই দুজনে নিজেদের সাধ্যমতো পয়সা এনে মাকে দিয়েছে । ফোজোর ছিল বন-জঙ্গল ঘুরে হরেক পাখি ধরে কলকাতায় নিয়ে বিক্রির ব্যবসা । পাখির বাসা থেকেও ছানা বের করে আনত । ঘরে রেখে তারপর খাইয়ে-দাইয়ে একটু বড় করে বিক্রি করে দিত । দু-তিন বছরেই এই কাজে সে দিব্যি হাত পাকিয়ে ফেলেছিল । একবার চৈত্রমাসে আমলকী গাছের কোটরে হাত গলিয়ে সাপের ছোবল খেয়ে গাছ থেকেই মাটিতে পড়ে যায় । মন্থরোর মা-ই প্রথম খবর পেয়ে দৌড়ে এসে ছেলেকে কোলে করে ঘরে নিয়ে

যায় । উঠোনে মরা ছেলেকে বুকে নিয়ে সে নাকি সারা দিন শুধু কেঁদেছে । সে তো তখন জানত না মাস কয়েক পরে তাকে আবার এভাবেই কাঁদতে হবে!

এরই মাস কয়েক পরে, প্রদীপ সপ্তাহ দুয়েকের ছুটি নিয়ে গ্রামে এসে মন্তুরোর মার বাড়ি গিয়ে দেখে সে উঠোনে বসে একমনে বেতের ঝুড়ি বুনছে ।

ক'মাস আগে ফোজো মারা গেছে, কী বলা যায় ভেবে না পেয়ে খানিকক্ষণ রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে সে বলে, 'দাদিমা কি আজকাল বেতের কাজও করছ নাকি?'

একটু দূরে, কোনাকুনি দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছিল, এতক্ষণ দেখতে পায়নি । গলার স্বর শুনে মন্তুরোর মা মুখ তুলে তাকে দেখে বলল, 'কবে এলে বাবা? ক'দিন আর তোমাদের বাড়ি যাওয়া হয়নি । ফোজো নেই, পাখির ছানা ধরতে গে'- বলতে বলতে মন্তুরোর মা মাথা নামিয়ে আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকা দিল ।

তারপর চোখ মুছে হাতের কাজ করতে করতে আবার বলল, 'দাউদ ফিরবে সাঁঝের বেলা ব্যাঙ নে' । থলেয় ভরে নে' আসে । তা ফড়েদের আসবার তো কোনও টাইম নেই । আতেও আসতি পারে, কাল ভোরেও আসতি পারে । থলের মধ্যি গাদাগাদি ব্যাঙ কি অতক্ষণ বাঁচে? ঝুড়ি চাপা দে রাখলি নিশ্চিন্দি । মরা ব্যাঙ ফড়েরা আঙুল দে তুলে হুই বাদায় ফেলে দেবে ।'

কথা বলতে বলতে ওরই মধ্যে শক্ত দেখে একটা ঝুড়ি প্রদীপের সামনে উপুড় করে দিয়ে বলল, 'দ্যেঁইড়ে কেন বাবা, বোসো । এর উপরিই বোসো । হ্যাঁ বাবা, বিদেশ-বিভুঁয়ে চাকরি করো, সেখানকার সাহেবরা নাকি ব্যাঙের ঠ্যাং খেতে ভালোবাসে? ফড়েদের মহাজন নাকি বরফ চাপা দে সে-দেশে ওজ এলগাড়িতে ব্যাঙের ঠ্যাং পাঠাচ্ছে?'

প্রদীপ হুঁ-হাঁ করে উত্তর দিয়ে বলল, 'তোমার বড় ছেলে কাজকম্ম কিছু ধরেছে?'

'ওই দ্যাখো না, কদমতলায় গামছা পেতে শুয়ে শুয়ে দাঁত খুঁটতিছে ।'

প্রদীপ সেবার কর্মস্থলে ফিরে যাবার আগেই দাউদ মারা গেল ব্যাঙ ধরতে গিয়ে, সে-ও সাপের বিষে ।

কলকাতার নাতি মানে ফোজোর ছেলে, সুজা । ফোজোর অপঘাত মৃত্যুর সময় একেবারে শিশু ছিল । ছেলেটা কিছুদিন তাদের বাড়িতে রাঙাকাকির ফাইফরমাশ খেটেছিল । রাঙাকাকির ফুলবাগানের কাজকর্ম করত । প্রদীপ দুয়েকবার ছুটিতে এসে ওকে একটু লেখাপড়াও শিখিয়েছিল । তারপর সুজাও একদিন গ্রাম ছেড়ে চলে গেল । মন্তুরোর মা বলে, এখন নাকি কলকাতায় কোন লটারির দোকানের গাড়ি চালায় ।

মন্তুরোর মা সেই নাতির জন্যেই সেদিন তিতির রাঁধবে ভেবেছিল । ছেলেটা নাকি তিতিরের মাংস খুব ভালোবাসে । নাতি না আসায় পাখিকটা প্রদীপকে গছিয়ে গিয়েছিল ।

মন্তুরোর মা'র জীবন ছেলেবেলা থেকে প্রদীপ যতটুকু দেখেছে, তা হল দারিদ্র থেকে আরও দারিদ্রের মুখে ধাবমান একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা । এর মধ্যে যা কিনা চরম

বিস্ময়ের, তা হল তার অদ্ভুত সততা আর আত্মমর্যাদা বোধ । সে তার সংসারের দুমুঠো ভাতের জন্য কী না করে! তারপরও হয়তো উপোস করে, কিন্তু কখনও মুখ ফুটে দুটো পয়সা চাইবে না । কাউকে ঠকানো তার স্বভাবেই নেই, বরং নিজেই ঠকবার জন্য স্বভাবটিকে বাগিয়ে রেখেছে । প্রদীপের বাবার অকালমৃত্যুর পর মন্টুরোর মা দুধ ডিম নারকেলের দাম নেওয়া ছেড়ে দিল । মনে আছে, তার মা একবার বহু চেষ্টাতেও ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত কিছুটা রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'শোনো মন্টুরোর মা, তুমি যখন দাম নেবে না, কাল থেকে আর আমাদের দুধ-ডিমও তুমি দেবে না ।'

'তা বললি হয়! তোমরা না নিলি, গরিব নোক, না খেতি পে মারা যাব, মা!'

'সে তো তুমি টাকা না নিলেও না খেতে পেয়ে মরে যাবে ।'

'টাকা নিই কী করে মা! তুমি মা-নখ্যি গত মাসে এক কুড়ি টাকা দেছেলে, বললে, দুখানা কম্বল কিনে নাও মন্টুরোর মা, যা শীত! তা সে তো তেনারই টাকা । তিনি আর নেই, দুধ ডিম নারকেল দে সে টাকা শোধ করতি হবে না?'

সন্ধ্যা গাঢ় হতে হতে ক্রমশ রাত নামছে । লেবু গাছগুলোর মাথায় ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি । ঠাকুরদার ঘরের মাথায় চিলেকোঠায় বাড়ির পোষা তক্ষক তালে তালে ডাকতে শুরু করেছে । তিতিরগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো, বিশেষ সাড়াশব্দ নেই । ঘর থেকে গোঁপ-ছাঁটা কাঁচি এনে প্রদীপ পাখিগুলোর পায়ের সুতলি কাটার চেষ্টা করতেই একসঙ্গে চারটি পাখিই প্রবল ডানা ঝাপটাতে লাগল ।

শনিবার ঘুম ভেঙেই প্রদীপের মনে পড়ল, রাজধানী এক্সপ্রেস ধরতে হবে । সোমবার থেকে আবার অফিস ।

অনেক কাল পর সে সকালে দিঘিতে স্নান করতে গেল । আসলে দিঘিটা দেখারও ইচ্ছে । দিঘিতে যাবার পথে কিছুটা ঘুরে মন্টুরোর মার বাড়ি গিয়ে দেখে মন্টুরোর মা বাড়ি নেই । উঠোনেও নেই, ঘরেও নেই ।

ফিরে আসতে আসতে ঝোপঝাড়ের এদিকে-ওদিকে তাকাল, যদি কোথাও উবু হয়ে বসে শাকপাতা কাটে কী আর কিছু করে । চোখে পড়ল না ।

আরও খানিক এগোতেই দেখা হল মন্টুরোর সঙ্গে । কোত্থেকে ফিরছে । মাথায় কাপড়ের টুপি, হাতে একটা গাছের ডাল- লাঠির মতো ধরে আছে ।

প্রদীপকে দেখেই বলল, 'ফিরি যাচ্ছ খোকা?'

'মন্টুরোর মাকে দেখলাম না-'

'তার কি কাজের কামাই আছে? তার বসি থাকলি চলে?'

প্রদীপ বিরক্তি চাপবার চেষ্টা করে বলল, 'তা বুড়ো মাকে এবার ছুটি দিয়ে নিজে কিছু করলেও তো পারো?'

‘আমি ফকির হয়িছি ।’ বলে মন্থরো দাঁত বের করে একগাল হেসে হাত বাড়াল ‘একটা সিগ্রেট দাও দিকি খোকা ।’

‘চান করতে যাচ্ছি, সিগারেট কোথায় পাব? তাছাড়া সিগারেট আমি ছেড়ে দিয়েছি ।’

‘তা’লি দশ নয়া দে যাও ।’

মন্থরোর বয়েস এখন কত হবে? ঠিক ঠিক হিসেব করা মুশকিল । চল্লিশ-পঞ্চাশ হবে হয়তো । অথবা আরও বেশি । ছিল নিষ্কর্মা, হল ফকির!

দিঘিটা বছর-বছর ছোট হয়ে আসছে । জলও আগের মতো তেমন টলটলে নেই । তার ওপর কার্তিক-শেষের ঠান্ডা । তাছাড়া প্রদীপের সময়ও সংক্ষেপ । ১টা ২৩-এর বালিসোনা লোকালে না গেলে হাওড়া থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস ধরা কঠিন ।

বালিসোনা-লোকাল প্ল্যাটফর্ম বদলে শিয়ালদামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । ফাঁকা ট্রেন । জানলার ধারে বসে ঠাকুরদার কথা ভাবতে ভাবতে কানে এল- দুটো পয়সা দে যাও বাবা । আল্লা তোমার ভালো করবে, গরিবকে দুটো পয়সা দে যাও বাবা-

মন্থরোর মা কোমর থেকে প্ল্যাটফর্মের সমান্তরালে ঝুঁকে লাঠিতে ভর দিয়ে কোনওক্রমে তার সাদা মাথা তুলে আশপাশের লোকেদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে ।

এক দম্পতি বোধহয় তাদের ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল, ভদ্রলোকটি ভুরু কুঁচকে মন্থরোর মার বাড়ানো হাতে ছোট কোনও একটি মুদ্রা ফেলে দিল । মন্থরোর মা হাতের লাঠিটা গলা আর কাঁধের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে খুব যত্ন করে পয়সাটা আঁচলে বাঁধল । তারপর লাঠি ঠুকে ঠুকে আরেক দলের কাছে গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল- দুটো পয়সা দে যাও বাবা-

ঢং ঢং করে ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা বাজল ।

প্রদীপ পার্স থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে মন্থরোর মাকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেল । মন্থরোর মা যাদের কাছে ভিক্ষে চাইছিল সেখানে কিছু না পেয়ে পাশের লোকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে ডাকল- দাদিমা! এই নাও- এদিকে, এই যে, ট্রেনের জানলায়-

মন্থরোর মা মাথা এদিকে ওদিক ঘুরিয়েই প্রদীপকে দেখতে পেল । অথবা তার গলা শুনে আন্দাজে তাকাল ।

‘এসো তাড়াতাড়ি । ট্রেন ছেড়ে দেবে ।’

মন্থরোর মা লাঠি ঠুকে এগিয়ে এল- ‘খোকা! কবে এলি বাবা?’

‘এলাম কী, যাচ্ছি । দিল্লি যাচ্ছি । তুমি তো আর তিতির নিয়ে এলে না?’

‘তিতির ভালো নেগেছে তো খোকা? বর্ষায় এয়ো, কাছিমের ডিম দেব । কাত্তিক অব্দি থাকলি তালের আঁটির ফোঁপরা দেব ।’

শেষবার ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল ।

প্রদীপ নোট-সুদ্ধু হাতটা জানলা দিয়ে বাড়িয়ে দিল।

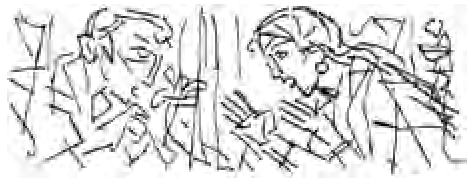
মন্থরোর মা নোটটা দেখে নিমেষের জন্য থমকে গেল।

'ধরো, ধরো।'

মন্থরোর মা হাত বাড়াল না, শুধু তার লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ট্রেনের পিছন দিকে মিলিয়ে গেল।

পরের বছর বাদায় হাতের আন্দাজে শাক তুলতে তুলতে সাপের ছোবলে নেতিয়ে পড়ার পর-পরই চৌধুরীবাড়ির দুজন মুনিষ দেখতে পেয়ে কাঁধের গামছা পাকিয়ে মন্থরোর মার বাহুতে বাঁধন দিয়ে কোলে করে হাসপাতালে নিয়ে এল। ভণ্ডুলের মুখে খবর পেয়ে সরোজিনী প্রদীপকে তাড়া লাগায়, 'তুমি আমার সঙ্গে চলো। এখনও যদি জ্ঞান থাকে, নিজের হাতে ওর মুখে একটু জল দিয়ো। এসো তাড়াতাড়ি।'

প্রদীপের মা এগিয়ে এসে কঠিন স্বরে বললেন, 'না, খোকার যাবার দরকার নেই!'



৪

সরস্বতীপ্রতিমার আতঙ্ক এখনও কাটেনি । অবনীমোহনের হোমিওপ্যাথি আর বায়োকেমিক ওষুধ খেয়ে সে দিন-রাতের বেশিটাই ঘুমোয় । কলেজে দীর্ঘ অনুপস্থিতি দেখে ইতিহাসের অধ্যাপিকা খোঁজ নিতে এসেছিলেন । সরস্বতীর মাথায় আঘাত লাগার কাল্পনিক ঘটনার বর্ণনা শুনিয়ে তাঁকে বলা হয়েছে, আরও কিছুদিন ও কলেজে যেতে পারবে না ।

'বেশ তো, বাড়িতে বসেই সে-ক'দিন পড়ুক না । অনেকদিন ব্র্যাবোর্ন থেকে ইতিহাসে কেউ ফার্স্ট ক্লাস পায়নি, তোমাকে কিন্তু পেতে হবে । আমি জানি তুমি পারবে ।'

সরস্বতীর দুচোখ জলে ভরে এসেছে ।

এর দুদিন পর চাকর ঘরের বাইরে থেকে বলল, 'একবার বাইরে আসবেন মা?'

সরস্বতীর মা মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন, বাইরে এসে চাকরের হাতে সরস্বতীর কোমরের মাদুলি ঝুলতে দেখে ছিনিয়ে নিলেন, প্রথমেই চোখে পড়ল কারটা ছেঁড়া ।

'তোরা কোথায় পেলি?'

'নিদ্দা এনেছে ।'

নিদ্দাকে কিছু বলতে হল না । জোড়হাতে কোমর ভেঙে সরোজিনীকে নমস্কার করে বলল, 'তখন সন্ধে হব-হব ভাব, বাদায় গেছি গোরু তুলতে, দেখি এটা পড়ে আছে । উপোর দেখে মনে হল এ নিচ্যয় কত্তাবাবুদের বাড়ির হবে । এই ভাবখানা মনে উঠতিই সোজা চলে এনু ।'

এ সেই নিদ্দা, লক্ষ্মীপ্রতিমার জন্মের সময় যার মা নিজের জন্য বরাদ্দ হাসপাতালের জলমেশানো নীল দুধ আর পাউরুটি নার্সের চোখ এড়িয়ে ছেলেকে দিয়ে ঘরে পাঠাত ।

'ওকে পেট ভরে খই-চিঁড়ের মোয়া খাইয়ে দে । মাদুলির কথা আর কাউকে তোরা বলিস না ।'

শরৎকালের এক বিকেলে এল অনসূয়া, তার কলেজের প্রিয়তম বন্ধু, সঙ্গে তার দাদা তাপস । সরস্বতী অসুস্থ শুনে তাকে দেখতে এসেছে । তাপসের সঙ্গে প্রথম দেখা ১২ই

জানুয়ারি, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে, সিমলা স্ট্রিটে, বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়িতে। দ্বিতীয় দেখা সেবছরই বসন্তে, সরস্বতীপুজোর দিন, অনসূয়াদের বাড়িতে। অনেকদিন পর এই তৃতীয় দর্শনে তাপসের মুখের দিকে সরস্বতী চোখ তুলল না।

তাদেরও মাথায় ধাক্কা লাগার গল্প বলা হয়েছে।

'দাদাকে দেখে আজ হঠাৎ লজ্জা পেলি যে?'

'ওদিকটায় জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে, সোজাসুজি আলোর দিকে আর তাকাতে পারছি না।'

'তুই যে বলিস তুই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসিস আলো! ভোরের আলো, বিকেলের আলো, চাঁদের আলো, তারা ভরা আকাশের আলো- আলোর তো তোর লম্বা লিস্ট!'

বোনের এই কথায়ও তার মুখে কোনওরকম ভাব ফুটতে না দেখে এবার তাপস বলল, 'আপনার আঘাত খুব বেশি, বুঝতে পারছি। তবে তা যত বড়ই হোক তার চেয়ে বড় আঘাত এই পৃথিবীতে সর্বদাই কেউ না কেউ পাচ্ছে। গত তিনদিনে এরকম তিরিশটা সাংঘাতিক ঘটনা বা দুর্ঘটনার কথা নিউজ পেপারে সারা দুনিয়া পড়েছে। আন্দিজ পাহাড়ে বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনা জানেন তো? পাহাড়ের ওপর শত শত মাইল শুধু জমাট বরফ। তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে এরোপ্লেনটা ঠিক মাঝখান থেকে দু-টুকরো হয়ে গেল। ভেতরে তখন ১৮০ জন যাত্রী, এয়ার হোস্টেস, পাইলট- যারা তখনও বেঁচে সবাই মারাত্মক আহত, একশোর বেশি যাত্রীর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। দুজন পাইলট ও সাতজন এয়ার হোস্টেস কেউ বাঁচেনি। যারা বেঁচেছে তাদের কারও পেট ফেঁড়ে সামনের আসনের ব্যাকরেস্ট ঢুকে গেছে, কেউ নিজের দুহাতে পেটের বেরিয়ে আসা নাড়িভুড়ি ধরে আছে, কারও পা হাঁটু থেকে খুলে গেছে, সব বর্ণনা করব না। মারাত্মক আহতদের অনেকেই দু-তিনদিন ধরে বাঁচবার প্রবল চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত মারা গেল। ছজন মাত্র যাত্রীর আঘাত অল্প। তাদের মধ্যে একজন ডাক্তার। তিনি এক তরুণীর ভাঙা পাঁজর হাতের চাপে ঠেলে সামনের মৃতদেহের স্কার্ফ টেনে নিয়ে জোরে বেঁধে দিলেন। সেইসঙ্গে পর পর চারটে ইনজেকশন। অন্য এক মধ্যবয়সির বাহুমূল থেকে উল্টে যাওয়া হাত হ্যাঁচকা টানে ফের সোজা করে দিলেন। ছজনে মিলে প্রথমে অখণ্ড মৃতদেহগুলো ধরাধরি করে বাইরে তুষারের মধ্যে ছ-ফুট অন্তর অন্তর মাত্র দু-ফুট গভীর গর্ত করে কবর দেওয়া হল। হিমাঙ্কের অনেক নীচের তাপমাত্রায় বেশিক্ষণ বিমানের বাইরে থাকা অসম্ভব। দৌড়ে ভেতরে ঢুকে খণ্ড বিখণ্ড মৃতদেহ, ভাঙাচোরা হ্যান্ডব্যাগ সুটকেশ ডিঙিয়ে মাড়িয়ে যাবার সময় দেখল চকোলেট ভরা একটা সুটকেশ তুবড়ে গিয়ে খুলে পড়ে আছে। প্রত্যেকেই হাতে যতটা পারে চকোলেট তুলে নিয়ে প্রথমে নিজেরা কয়েকটা করে খেয়ে তারপর যাদের কোনওরকমে বাঁচাবার চেষ্টা চলছে তাদের কারও কারও মুখের সামনে ধরছে, যদি কেউ কোনওক্রমে খেতে পারে।'

সরস্বতী কখন যে তাপসের চোখে চোখ রেখে এই দুঃসহ মর্মান্তিক দুর্ঘটনার বর্ণনা শুনতে শুরু করেছে, সে নিজেও জানে না। শুনতে শুনতে ব্যথায় তার বুক ভেঙে যায়, তা সত্ত্বেও তাপস থামতেই বলে উঠল, 'তারা কি বাঁচল? তারা বাড়ি ফিরতে পারল?'

তাপস একথার উত্তর না দিয়ে শুরু করল, 'নিজের দেশে গিয়ে বিয়ে করবে বলে চিলির একটা মেয়েকে নিয়ে পেরু যাচ্ছিল একটা ছেলে। ছেলেটার কোমর থেকে মেরুদণ্ড দু টুকরো হয়ে গেছে, ঘাড়ও ভাঙা, মেয়েটা দুহাতে প্রেমিকের ভগ্নদেহ বুকে জাপটে ধরে শুধু কেঁদে চলেছে।'

'বেশিরভাগ ক্যাবিন-ব্যাগেজই ছেঁড়া ফাটা কিংবা খোলা। অনেক ব্যাগের লকিং অক্ষত থাকলেও পিছন বা পাশ ফেঁড়ে গেছে। যদি কোনও ওষুধ পাওয়া যায়- সুস্থ ছজন দ্রুত ব্যাগগুলো ঘাঁটতে লাগল।

'একজনের মনে পড়ে গেল মৃতদের মধ্যে দুজন ডাক্তার ছিলেন, ফলে আরও তন্ন তন্ন করে ওষুধের সন্ধান চলল।

'একটা স্টেথোস্কোপ, একটা ব্লাড প্রেশার মাপার যন্ত্র, সঙ্গে কয়েকরকম জীবনদায়ী ওষুধ মিলল দুটো ব্যাগ থেকে।

'মেয়েটির বুকের ওপরই শেষ রাতে ছেলেটি মারা গেল, তখন ঘন তুষারাবৃত আন্দিজ পাহাড়ের শিখরশ্রেণী সূর্যের প্রথম কিরণে রঙিন হয়ে উঠছে।

'ভেবে দেখুন, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে এদের কারও কোনও যোগাযোগ নেই। এই বিমান বা এই দুর্ঘটনার কথা কেউ জেনেছে কিনা এরা জানে না। একদিন বিমানের ল্যাজের দিকে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া একটা ট্রানজিস্টার রেডিও পাওয়া গেল। ছজনের একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। অনেক কসরৎ করে রেডিও চালু করে পর পর নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হঠাৎ শোনা গেল- ভয়ানক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য আন্দিজ পাহাড়শ্রেণীতে ভেঙে পড়া চিলির বিমান সন্ধানের চেষ্টা আগামী গ্রীষ্ম পর্যন্ত বন্ধ রাখা হল। তবে এই সময়টা আন্দিজে ঘন ঘন তুষারঝঞ্ঝার কারণে বিমানটি তুষারে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যাওয়ার কথা। যাত্রীদের কারও বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও কম।'

তাপসের বোনও রুদ্ধশ্বাস শ্রোতা। তারই মধ্যে একবার দাদার মুখে আরেকবার বন্ধুর মুখে অন্যমনস্ক চেয়ে থাকছে।

'মেয়েটার কী হল?' সরস্বতীর গলায় চাপা উদ্বেগ।

'একাত্তর দিন মৃত্যুর সঙ্গে সম্ভব-অসম্ভব সবরকম লড়াই চালিয়ে শেষপর্যন্ত চারজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে পেরুর রাজধানী লিমায় ফিরিয়ে আনা হয়। ওই মেয়েটি সেই চারজনের একজন। ছজন সুস্থ পুরুষের তিনজনই মারা গিয়েছিল। শেষ জন শেষ নিশ্বাস নিয়েছিল উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার আসবার ঠিক আগের মুহূর্তে। ওই সাতজনের খাদ্য কী ছিল ভাবতে পারেন? সহযাত্রীদের মৃতদেহের মাংস, তুষারের তলা থেকে বের করে রোদে

পুড়িয়ে তাদের খেতে হত। কখনও প্লেনেরই ভাঙা একটা টুকরো দিয়ে মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করা হত। কতক্ষণ সূর্যের দেখা পাওয়া যাবে সেটাই তখন প্রত্যেকের জীবনের একমাত্র প্রতীক্ষা।'

'মেয়েটার কী হল?' সরস্বতীর একই প্রশ্ন।

'অনেকদিন পর তিনজনের একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হল।'

এর ছ-বছর পর সরস্বতী-তাপসের বিয়ের বাহাত্তর ঘন্টা আগে সরস্বতী তাপসের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ নামিয়ে রেখে বলল, 'অনেক ভাবলাম, আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না। ছ-বছর ধরে কথাটা বলতে পারিনি। এখন না বললেই নয়।'

'আবার নতুন কী হল?'

'নতুন না, পুরনো।'

'আন্দিজ পাহাড়ে বিমান ভেঙে পড়ার সেই সাংঘাতিক দুর্ঘটনার কথা বলেছিলাম মনে আছে?'

'তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? তাছাড়া আমার এটা দুর্ঘটনা নয়,' সে মুখ তুলে তীব্র স্বরে বলল, 'আই হ্যাড নো হেড ইনজুরি। আই ওয়াজ রেপড।'

'তোমাদের মন্থরোর মাকে তোমার মনে আছে তো? তোমার ওই দুর্ঘটনার দিন-কয়েক পর টানা ক'দিন কলেজে যাচ্ছ না- রুমকি মানে অনসূয়ার কাছে জেনে আমি তোমাদের বাড়ি যাচ্ছিলাম তোমাকে ই এইচ কার-এর ইতিহাসের একটা দর্শন পড়তে দেব বলে, তোমাদের বাসস্টপ চিনতে না পেরে আরও পাঁচ-ছটা স্টপ পরে গিয়ে নেমেছিলাম। ঠিক করলাম হেঁটেই ফিরব। এক জায়গায় দেখি একটা বুড়ি রাস্তার অনেক নীচে বাদা অঞ্চল থেকে মুখে কী একটা বিলাপ করতে করতে উঠে আসছে। কাছে আসতে কানে এল- 'ও মা সরো, ওমা সরস্বতী। কে তোর এ সব্বোনাশ করল রে?' একবার এই বিলাপ, আর পরের মুহূর্তেই অদৃশ্য সেই শয়তানের উদ্দেশে অশ্রাব্য সব খিস্তি, গালিগালাজ। মাথা নেড়ে ঘাড় দুলিয়ে মুখ যতটা পারে তুলে রাস্তার ধুলোয় পৃথিবীর হাওয়ায় সে ছড়িয়ে দিতে চাইছিল তার রাগ, দুঃখ, ঘৃণা।

মনে সমবেদনা নিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করতেই বুক উজাড় করে সে আমাকে অনেক কথা বলল। বালিসোনা গ্রামের মানুষ কী করে এমন শয়তানের কাজ করল সে ভেবে পায় না। মন্থরোর মা তিন পুরুষ এই বালিসোনার আলো-বাতাস নিচ্ছে। এখানকার অনেকেই পুরুষানুক্রমে তোমাদের বাড়ির নুন খেয়েছে, সবই বলল। সে আমাকে বাদায় নিয়ে গিয়ে জায়গাটাও দেখিয়েছে, হয়তো আমার কাছে প্রতিকারের আশায়। মানুষটা এমনিতেই তো কোমর ভেঙে মাটির সঙ্গে প্রায় সমতলে হাঁটে। এক হাতে লাঠিতে ভর দিয়ে আরেক হাত একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে একবার সামনের দিকে আকাশে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেখায়- 'হুই দিকে শাড়ি, হুই দিকে বেলাউজ, হুই দিকে শ্যায়া-'

'প্রথমে যন্ত্রণায় আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম । তারপর নিজেকে, আর তোমাকেও, কিছুদিন সময় দিয়ে রুমকিকে নিয়ে তোমার কাছে গিয়েছিলাম । তার আগে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে বড় বড় দুর্বিষহ অনেকগুলো দুর্ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত পড়ে আন্দিজের বিমান দুর্ঘটনা বেছে নিয়েছিলাম ।'

সরস্বতী প্রায় যেন হৃদপিণ্ড গলায় নিয়ে শুনছিল, শেষটা শুনে তার মন আরও স্তব্ধ হয়ে গেল । সে নির্বাক, দুচোখ বেয়ে শুধু জল নামছে ।

তাপস বেশ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'মন্তুরোর মা হয়তো আজও অদৃশ্য শয়তানদের উদ্দেশে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে । এর অনেক শব্দই আমার অজানা, শুনিনি কখনও, তার মধ্যে একটা কথা এখনও মনে আছে । বেজম্মার বিছে । বেজম্মা জানি, কিন্তু বেজম্মার বিছে শুনিনি বা পড়িনি কোথাও । বলল বাদায় নাকি প্রায়ই যায় । গিমেশাক, ঢেঁকিশাক, শুশনি, আমরুল, ধুলো, ব্রাহ্মীশাক যখন যা হয়, তুলতে যেতে হয় । যুক্তিফুল বলে একটা ফুলের কথাও বলেছিল । আমি নিজেকে খানিকটা সামলে নেবার পর নামগুলো মনে করে করে লিখে রাখি । এর মধ্যেও হয়তো ইতিহাসের আঁকিবুঁকি আছে ।'

চোখের জল মুছে সরস্বতী বলল, 'মন্তুরোর মা যে-শয়তানদের উদ্দেশে শাপশাপান্ত করত সেই দুজনকেই পরদিন ভোরে বাদায় গাবগাছের ডালে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় ঝুলতে দেখা গেছে । গ্রামের একপাতার পত্রিকায় লিখেছিল দুজনকেই নাকি আগে গুলি করে মেরে তারপর গলায় দড়ির ফাঁস লাগানো হয়েছে । তবে পুলিশ জোড়া আত্মহত্যা বলেই চালিয়ে দিয়েছে ।

'আসলে আগের দিন গভীর রাতে লাস্ট ট্রেনে আমার মিলিটারি কাকা এসেছিল, সব শুনে, তখনই গিয়ে দুজনকে আর্মিতে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের চাকরি দেবে বলে ভুলিয়ে বাদায় এনে গুলি করে ।'

এই অংশ তাপসের সম্পূর্ণ অজানা ছিল । বলল, 'মন্তুরোর মা হয়তো এটা জানে না ।'

'ভোরে শুশনিশাক তুলতে গিয়ে জোড়া শব সে-ই তো প্রথম দ্যাখে । কিন্তু ওরাই যে সেই দুটো শয়তান সেটা জানত না ।'

'জানলে ওর প্রাণ ঠান্ডা হত । ওর বুকের মধ্যে আগুন জ্বলতে দেখেছিলাম । সেবার অবশ্য তোমাদের বাড়িতে আর যাইনি ।'

'মন্তুরোর মা আর নেই । একদিন বাদায় শাক তুলতে তুলতে সাপের ছোবলে সেখানেই লুটিয়ে পড়ে । কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখো! ওর দুই জোয়ান ছেলেও অনেককাল আগে সাপের কামড়েই মারা গিয়েছিল । আজীবন নিষ্কর্মা মন্তুরো আগেই ফকির হয়েছিল, এখন একেবারে একা হয়ে গেল । সত্তর-আশি বছরের বুড়ো মানুষ, মাথায় মুসলমানী জালি টুপি, গলায় ফকিরি মালা, কপাল চাপড়ে কাঁদে আর বলে, 'আম্মা ভেন্ন কে আমার ক্ষুদার অন্ন জোগাবে ।'

বক্তা শ্রোতা দুজনই হেসে ফেলল ।



৫

নোকো অর্থাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা একটা নতুন ল্যান্ডমাস্টার গাড়িতে বালিসোনার চৌধুরীবাড়ির গেটে এসে যখন পৌঁছল তখন সরস্বতীকে তার মা টেনে টেনে চুল আঁচড়ে জোড়া বিনুনি করে দিচ্ছে। মিস ইন্ডিয়া হবার পর এই প্রথম তার বালিসোনায় আসা। ক্লাস এইট-এ পড়তে পড়তে সেই যে বালিসোনা ছেড়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিল তারপর থেকে সে বালিসোনায় আসত বছরে একবার, শুধু পুজোর সময়।

মায়ের হাত থেমে গেছে, বোনের চোখে পলক পড়ে না।

তিনজনে যখন গল্প-কথা-হাসি-খুশির ঝড় তুলেছে লক্ষ্মী তখনও গত একবছরে তার ভারতসুন্দরীর অভিজ্ঞতার ঝাঁপি খুলতেই পারেনি, ভণ্ডুল দরজার বাইরে থেকে বলল, 'কত্তাবাবু জানতে চাইলেন গাড়ি চড়ে এ বাড়িতে কে এল? আর একটা কথা, বড়দিদিমণির ড্রাইভারসাহেব দুহাতে ধরে পেট থেকে গলা অব্দি গাদাগাদা কাগজের বাক্স নামিয়ে দিয়ে গেলেন।'

'বাক্সগুলো এঘরে দিয়ে যা। ঠাকুদ্দা কি এখন ঘরে, মা?'

'তোকে দেখেছেন, তাহলে বকুলবেদীর সামনে চেয়ারে বসে আছেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো দেখলাম একজন ওখানে চেয়ারে বসা। খুব রোগা-পাতলা চেহারা। ঠাকুদ্দা তো পাঠানদের মতো লম্বা-চওড়া।'

'অসুখের পর ওরকম হয়েছে। কথাও বলতে পারেন না।'

কার্ডবোর্ডের বাক্সগুলোর মধ্যে থেকে বেছে বেছে 'মা' 'সরো' 'বাবা' লেখা তিনটে বাক্স টেনে নিয়ে প্রথমেই খুলল সরোর বাক্স। এক সেট রাজস্থানী ঘাগড়া ব্লাউজ, চুনরি, সঙ্গে উটের হারের রাজস্থানী গয়না। আর এক সেট হায়দ্রাবাদী ইক্কত শাড়ি, সঙ্গে মুক্তোর দু সেট অলংকার। একটা একটা করে পরিচয় দিয়ে সবটাই বোনের কোলে ঠেলে দিয়ে লক্ষ্মী বলল, 'কীরে, পছন্দ তো?'

সরস্বতী উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে হাঁটু ভেঙে দিদিকে জাপটে ধরে 'তুই কী ভালো রে দিদি, তুই কী ভালো!' বলতে বলতে দিদির বুকেই হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

অবনীমোহন ঘরে ঢুকে সরো কাঁদছে কি হাসছে বুঝতে পারেনি, নোকোর উদ্দেশে বলল, 'আমার জন্যে কিছু আনিসনি?'

সরস্বতী ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে । বোনকে বুক থেকে নামিয়ে, অবনীমোহনের বাক্স খুলে হায়দ্রাবাদী চোস্ত-শেরোয়ানির প্যাকেট আর মাদার পার্লের ছোট একটা কৌটো বাবার হাতে দিয়ে বলল, 'তোমার আফিং রাখার কৌটো! কী চমৎকার না, বাবা?'

'ও ঘুম-পাড়ানো নেশা ছেড়ে দিয়েছি রে । কতদিন পর তোকে দেখছি বল তো? তুই কলকাতায় চলে যাবার পর পরই বকুলতলাটা বাঁধানো হল । বেদীর পশ্চিমদিকে দেখিস, গায়ে একটা তারিখ লেখা আছে । তোর চলে যাওয়ার তারিখ । কাঁচা প্লাসটারে লিখেছিলাম । ক'দিন ধরে তোকে দেখবার জন্যে মনটা বড় ব্যাকুল হয়েছিল ।'

'তাহলে দাও, মা ওতে সিঁদুর রাখবে । তোমার যা কমপ্লেকশান, চোস্ত-শেরোয়ানিতে তোমাকে দারুণ মানাবে বাবা । মায়ের জন্য কী এনেছি বলো তো? আসামের মুগা শাড়ি, সঙ্গে তসরের শাল ।'

সকালে সকলে মিলে আগের মতো ভেতরের বরান্দায় টানা আসন পেতে জলখাবার খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, ভুবনমোহনের আত্মঘাতী কুঁজওলা বড় মেয়ের দুই শিশুপুত্র আগেরদিন তাদের কাকার সঙ্গে মামার বাড়ি এসেছে, প্রথমে তাদের এনে বসানো হল । কাকাকে মূল বাড়ির বাইরে আলাদা করে অতিথিগৃহে রাখা হয়েছে, তার একটা বদ অভ্যাস- রাতে মশারির তলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত মেয়েদের ছুঁয়ে দেখা । তাকেও ডাকা হল । ভণ্ডুল নিয়ে এল কত্তামশাইকে । সেজো তার শ্যালকের সঙ্গে আগের রাত থেকে নিজের ঘরে মদ ও তাস নিয়ে জুয়ায় মেতে আছে, বউকে দিয়ে বলে পাঠাল, পরে খাবে । লক্ষ্মী সরস্বতী আর ন'ভাইয়ের বালিকা কন্যা নন্দিনী, তিন বোন এমনিতেই সুন্দরী, তায় সাত-সকালেই সুন্দর করে সেজেছে, এল কলকল করতে করতে, বসেওছে পাশাপাশি । বেগুন ভাজা ছোলার ডালের পর দুই বউ আর এক বিধবা আত্মীয়া লুচির ডালা নিয়ে এল । সরোজিনীর হাতের বালতিতে ধোঁকার ডালনা, লক্ষ্মীর পাতে দিতে দিতে বলল, 'তোদের বাবাকে ডেকে আসিসনি?'

'না তো । আসছি এক্ষুণি ।' বলে লক্ষ্মী হাতের লুচির টুকরোটা নামিয়ে রেখে উঠে গেল । ফিরল প্রায় দশ মিনিট পর, মুখ থমথমে । হাতে একটা কাগজ । গলায় কান্নার ঢেলা ঠেলে লক্ষ্মীর মুখ দিয়ে বেরল- 'বাবা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন!'

'মামা বেইবেই গেছে, বউ নিয়ে আব্বে ।' আত্মঘাতী মেয়ের দুই শিশুপুত্রের একজনের মন্তব্য । তাদের কাকাকে দেখেছে, যখনই কোথাও চলে যায়, তার কিছু দিন পর লাল শাড়ির ঘোমটা দেওয়া একটা বউ নিয়ে বাড়ি ফেরে ।

লক্ষ্মী তাকে থামিয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা চিরকালের মতো চলে গেছেন। লিখেছেন সন্ন্যাসের পথে যাচ্ছেন। আর ফিরবেন না।'

ভুবনমোহন লক্ষ্মীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে সব শুনছিলেন, হঠাৎ একশো তিনবছর বয়সি বাকশক্তিরহিত বৃদ্ধ সবাইকে চমকে দিয়ে 'ও হো হো হো!' করে আর্তনাদ করে উঠলেন।

বুকফাটা আওয়াজ শুনে সেজো ভাই হন্তদন্ত হয়ে তাস-হাতেই বেরিয়ে এল।

'কী হয়েছে এখানে? এখানে হয়েছেটা কী? কে অমন চ্যাঁচালো?' কথা শেষ হবার ঠিক আগেই চোখে পড়ল বাবার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নামছে।

'সেজ্জ্যাঠা, ছোটকা বাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে চলে গেছেন। চিঠি লিখে গেছেন।'

'বরাবরই ওর নাটক করা অভ্যেস। একবার তো কোন যাত্রাদলের সঙ্গে পালিয়েও ছিল। এবারও ওইরকমই কিছু হবে, একটু ড্রামা করে গেল। কই, আমাদের খাবার কই? হাতমুখ ধুয়ে আসছি।'

কেউ কেউ খাওয়া শেষ করছে, বাকিরা সবাই ঠাকুরদাকে ঘিরে আছে।

ঠাকুরদার ঘরে লক্ষ্মীকে তার বাবার চিঠি পড়তে হল: 'আমি স্বজ্ঞানে চিরকালের মতো সংসার ছাড়িয়া যাইতেছি। যে পিতৃদেবকে শিশুকাল হইতে বিশাল-দেহ দোর্দণ্ডপ্রতাপ দেখিয়াছি তাঁহাকে এমন বালকের মতো শীর্ণকায় দেখিয়া সংসারজীবন সম্বন্ধে আমার মনে ঘোর সংশয় জাগিয়াছে। তদ্ব্যতীত নোকো-সরোর ন্যায় দুই অসামান্যা কন্যার রত্নগর্ভা জননীর স্বামী হিসাবে কোনও দায়িত্বই আমি পালন করিতে পারি নাই। নিজেদের বাগানের ফল চুরির পাপের শাস্তি স্বরূপ পিতৃদেব কর্তৃক গৃহ হইতে বিতাড়িত ও সাময়িক ত্যাজ্য পুত্র হইয়া আমার সহধর্মিণীকে তিনমাস কত কষ্টই না দিয়াছি। প্রথম সন্তানের জন্ম হইল কি না চাষীভূষিদের পরিবারের সঙ্গে খোড়োচলের গ্রামীণ হাসপাতালে। সংসারী মানুষের সুখদুঃখ, পাপপুণ্য লইয়া বিগত অনেকগুলি বৎসর আমি ক্রমাগত ভাবিয়া আসিতেছি। আফিং ছাড়িয়া ইহাকেই নেশা করিয়াছি। এই ভাবনার নেশায় আমার মনের বহু গ্লানি কাটিয়াছে। আমি আমার জীবনের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছি।

'সংসারজীবন ত্যাগ করিলাম। নোকোকে একবার দেখিবার জন্য এতদিন অপেক্ষা করিয়াছিলাম। তাহার উপহার আমার কোনও কাজে আসিবে না, তাই রাখিয়া গেলাম। সন্ন্যাসই মানুষের সত্যকার পথ।'

সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে ভুবনমোহন স্পষ্ট গলায় বললেন, 'নিজে চলে গেল, আমার গলায় স্বর দিয়ে গেল। তোকে তিনমাস ত্যাজ্য করেছিলাম, তুই আমাকে সারাজীবনের জন্য ত্যাজ্য করে গেলি, বাবা?'

পরের বছর, গ্রীষ্মের ধুলোবালি ধুয়ে মুছে বাদা-ভাসানো বর্ষার পরে আসন্ন শরতের মুখে, বাদার জল নেমে গিয়ে জলার অংশে পানিফল তোলার শেষে, ব্যাপারিরা কোমরজলে

নেমে জাল পেতে ঘাই দিয়ে মাছ ধরে নেওয়ার পর চাষি তাঁতী নাপিত কুমোরদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল পাঁক ঘেঁটে হাত দিয়ে অবশিষ্ট শোল, ল্যাটা, বান, মাগুর নিয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেছে, বহুদিনের পুরনো কর্মচারী যতীন বরের ছেলের মুখে বাদার প্রতিবছরের মতো এই ক'মাসের একই ঘটনাচক্র- জলে ভাসা, জল নামা, পানিফলের চাষ ও ফসল তোলা, ব্যাপারিদের মাছ ধরা ও গরিবঘরের ছেলেদের হাত দিয়ে মাছ পাকড়ানো তারপর আবার শাকের সবুজ আস্তরণ, বাসরাস্তার দিকের উঁচু জমি নতুন ঘাসে ভরে যাওয়া- শুনতে শুনতে ভুবনমোহন একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্বগতোক্তির মতো বলে উঠলেন- 'অভিমানে বৈরাগী হয়ে গেলি, বাবা!'

যতীন বরের ছেলে ব্রতীন বুঝল, কত্তামশাই বাদার বৃত্তান্ত কিছুই শুনছেন না। দিনের শেষে ভণ্ডুল তাঁকে ঘরে নিয়ে যেতে এসে দেখল তাঁর মাথাটা খড়ের চালা থেকে লিত লাউয়ের মতো চেয়ারের হাতলের দিকে ঝুলে আছে।

বকুলগাছের মাথা ততক্ষণে বকে সাদা হয়ে গেছে। এতো বক এই বকুলগাছে আগে কখনও দেখা যায়নি। বাদা ছেড়ে সন্ধের মুখে সার বেঁধে সব এখানে উঠে এসেছে।

ভুবনমোহন যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি ছাড়া আর কারও তাঁর ঘরের সিন্দুকে হাত দেবার অনুমতি ছিল না। এখন সেই সিন্দুক খুলে পাওয়া গেল খামে সাতটা ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট। প্রত্যেকটি পঞ্চাশ হাজার টাকার। প্রতিবছর একটা করে কিনেছেন, প্রত্যেকটাই কেনার তারিখ থেকে দশ বছর মেয়াদের। ম্যাচিওরিটিতে দেড় লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। সবকটি সার্টিফিকেটেই নমিনি করে গেছেন সরোজিনীকে। এর মধ্যে দুটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। চারটি খামের ওপর লেখা- 'পৌত্র-পৌত্রীদের শিক্ষা ও পৌত্রীদের বিবাহ খরচ'। একটিতে 'জ্যেষ্ঠ পুত্রবধুর সাধ-আহ্লাদের খরচ ও বিদুষী সরোজিনীর বিলাতি গ্রন্থ আনাইবার খরচ।' আরেকটিতে লেখা 'হিন্দুশাস্ত্র মতে আমার শ্রাদ্ধ ও দরিদ্রভোজনের খরচ।'

সিন্দুকের এক কোণে ঘোড়ার পিঠে বসবার পার্সিয়ান কার্পেট, তার নীচে একটা না-খোলা হুইস্কির বোতল, গাঁজলা ওঠা। ভুবনমোহন অসুস্থ হবার পর আর হুইস্কি ছোঁননি। শীতের ভোরে খেজুর রস, গ্রীষ্মের দুপুরে ডাবের জল, বিকেলে সারা দিন ঘরের কোণে রাখা ঠান্ডা তরমুজের রস- এইসব হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রিয় পানীয়।

সিন্দুকের তলা থেকে বড় বড় খামগুলো তুলে নেবার পর পাওয়া গেল তাঁর উইল। নিজের হাতে লেখা। মাত্র কয়েক লাইন:

'আমার পিতার কবরের পাশে আমাকে যেন কবর দেওয়া না হয়। রাসমেলায়, রথযাত্রায় বালিসোনা অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা যে পথে রাসমাঠে প্রবেশ করে সেই প্রবেশপথে আমাকে কবর দিও। তাহার উপরে কোনও কাঠামো গড়িও না। যেন আবার সেখানে স্বাভাবিক ঘাস গজাইতে পারে।'

এই অবিশ্বাস্য অসম্ভব ইচ্ছা শুধু জ্যেষ্ঠপুত্রের বিধবা ও কনিষ্ঠা পুত্রবধু ছাড়া আর কেউ মানতে চায় না । বিশেষ করে পিতার কবর মাড়িয়ে আপামর জনসাধারণ রথযাত্রা রাসযাত্রায় যাবে আসবে এ যে কল্পনার অতীত । কিন্তু সদ্য প্রয়াত পিতার শেষ ইচ্ছা অমান্য করাও যায় না ।

মেজো ছেলে কলকাতা থেকে এসে বাবার কবরের আদেশনামা নিজের হাতে নিয়ে দুবার পড়ে 'ডিসগাস্টিং' বলে গাড়ি ঘুরিয়ে সেদিনই কলকাতায় ফিরে গেল । তার হাইকোর্ট ফেলে এসব বাজে সেন্টিমেন্টাল ব্যাপারে সময় নষ্ট করা অর্থহীন । তার স্ত্রী সুনয়নী অবশ্য শ্রাদ্ধ না মেটা পর্যন্ত থেকে গেল । লক্ষ্মীপ্রতিমা তার জ্যাঠতুতো দিদিকে নিয়ে গুজরাটে গেছে তার হাসপাতালের জন্য ডোনেশান সংগ্রহে, তারা ঠাকুরদার শ্রাদ্ধে আসতে পারেনি ।

শ্রাদ্ধের সাতদিন আগেই বাসরাস্তার ধারে রাসমাঠের কিনারে সিনেমা হলে নায়ক-নায়িকার ছবি-আঁকিয়ে দুলাল পটুয়াকে দিয়ে ৩০x১২ ফুট বোর্ডে স্বর্গীয় পিতা ভুবনমোহন চৌধুরীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সার্বজনীন মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ জানানো হল । সঙ্গে লেখা হল- পিতৃদেব জীবদ্দশায় যে সকল পথচারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছেন, এবং যাহাদের করিতে পারেন নাই, সমগ্র বালিসোনা অঞ্চলের এমন সকল আবালবৃদ্ধবনিতাকে ঐ দিবস বেলা এগারো ঘটিকা হইতে রাসমাঠে ভোজে যোগ দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো যাইতেছে ।

ঘিয়ে ভাজা লুচি, ছোলার ডাল, মুগডালের খিচুরি ও পাঁচমিশেলি সবজির ঘন্ট, চাঁদোখালির দই, সুবল সাউয়ের ছানাপোড়া, আর স্থানীয় ময়রাদের আগের দিনই বাড়িতে আনিয়ে ভিয়েন বসিয়ে সারা রাত ধরে বানানো সন্দেশ রসগোল্লা লেডিকেনি দানাদার- সন্ধে ছ'টা অব্দি দূর দূর থেকে দলে দলে লোক এসেও খেয়ে শেষ করতে পারেনি । বালিসোনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কলকাতা থেকে ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের জন্যও একই নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা ।

শ্রাদ্ধ মিটে যাবার কয়েকদিন পরই সরোজিনী কবরের দুপাশে কল্পনায় দুটি তোরণস্তম্ভ ধরে নিয়ে তার একপাশে একটা শিউলিচারা আরেক পাশে একটা স্বর্ণচাঁপার কলম পুঁতে দুবেলা তাতে জল দিতে ভোলে না ।

পরের বছর শিউলির সময় পার করে কালীপুজোর শেষে দুটো একটা করে শিউলি ঝরতে দেখা গেল । পুরো হেমন্তকাল কবরের বুকে নতুন দুর্বাঘাস শিউলিতে সাদা হয়ে উঠল । বর্ষায় কবরের ওপরের আকাশ-বাতাস স্বর্ণচাঁপার বর্ণে-গন্ধে দৈবভাব ধারণ করল । ক্রমশ রাসমাঠের এই প্রবেশপথটি লোকের মুখে মুখে শিউলি-চাঁপা গোরস্থান নামে খ্যাত হল ।



৬

বাবার গৃহত্যাগের পরদিনই লক্ষ্মী তার সংবর্ধনা বাতিল করে দিয়েছে । বিকেলে ভণ্ডুল এসে বলল, ‘এস-ডি-ও সাহেব এসেছেন পুলিশ নিয়ে । বড়দিদিমণিকে চাইছেন ।’

ভণ্ডুলের পিছন থেকে যতীনবাবু জানালেন, ‘পুলিশের জিপগাড়ির পিছনে অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে এস-ডি-ও এসেছেন, এই যে কার্ড দিয়েছেন ।’

‘বসবার দালানে নিয়ে বসাও । আমি আসছি ।’

লক্ষ্মী আসা মাত্র অল্পবয়সি এস-ডি-ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে বললেন, ‘একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি, সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আপনি অনুগ্রহ করে ক্যানসেল করবেন না ।’

সাদা শাড়ি সাদা ব্লাউজ পরা লক্ষ্মীকে দেখে এস-ডি-ও-র চোখে মুখে মুগ্ধতা তার চোখ এড়ায়নি । সেও প্রতিনমস্কার করে বলল, ‘আমাকে আপনারা মার্জনা করবেন । কোনও পাবলিক অনুষ্ঠানেই আমার পক্ষে এখন যাওয়া সম্ভব নয় । তবে সংবর্ধনার চেয়ে অনেক বড় একটা কাজে আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই । আমি এখানকার গ্রামীণ হাসপাতালকে বড় করে গড়তে চাই । ধরুন পুরনোটা ভেঙে এক বিঘের ওপর দোতলা বিল্ডিং তৈরি করা । এবারও আসবার সময় সেই খড়ের চালা আর মাটির দেওয়াল দেখেছি । বাইশ বছর ধরে কোথাও এর এতটুকু বদল হল না ।’

‘এটা নিয়ে তো একটা সিরিজ অব মিটিং দরকার । তাছাড়া এই মুহূর্তে ফান্ডের ব্যবস্থাও করা যাবে না । ফাইনান্স থেকে অ্যাপ্রুভাল দেবে না । স্যাংশান পাওয়া অসম্ভব ।’

‘বেশ তো, আমরাই ক’জন একটা প্রাথমিক আলোচনা শুরু করতে পারি । আপনি ফ্রি থাকলে আমি কাল বিকেল চারটের সময় আপনার অফিসে চলে যাব । মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান আর হাসপাতালের সুপারিন্টেনডেন্ট বা ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারকে আপনি যদি আসতে বলে দেন তাহলে একটা ফ্রুটফুল আলোচনা কালই হতে পারে ।’

যেতে যেতে এস-ডি-ও ফিরলেন- ‘এখানে আপনার কোনও অসুবিধা হলে বা কিছু দরকার হলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন ।’

এর সাড়ে-চার বছর পর গ্রামীণ হাসপাতালের দোতলা ভবন উদ্বোধনের দিন লক্ষ্মী, স্থায়ীভাবে ফিরে আসার আগে এই শেষবার বালিসোনা গ্রামে এল । আগের এস-ডি-ও নেই, নতুন এস-ডি-ও-কে আনা হয়েছে, তিন স্কুলের দুই প্রধানশিক্ষক ও এক প্রধানশিক্ষিকা মঞ্চে আসীন । মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান তখন তার কাকা, বাবার পিঠোপিঠি ভাই, তার আসন এস-ডি-ও-র পাশেই । এস ডি পি ও, সার্কেল অফিসার, ও সি সবাই নিমন্ত্রিত । স্থানীয় ডাক্তারদের প্রায় সবাইকেই বলা হয়েছে, তারা দর্শক-শ্রোতাদের আসনে বসেছেন । সরোজিনীকে হাত ধরে মঞ্চে তুলে নিল লক্ষ্মী ।

'ভাগ্যদোষে এখানেই, তখনকার সেই মাটির দেওয়াল খড়ের চালার হাসপাতালে আমার মাকে আমার জন্ম দিতে হয়েছিল ।'

মঞ্চের সকলেই স্তম্ভিত । এ কি বিশ্বাস্য? সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে ।

'আপনারা অবাক হবেন না, অবিশ্বাস করারও কিছু নেই । যেটা সত্যিই বিস্ময়ের, সেটা হল এত দিনেও এই হাসপাতালে কোনও পরিবর্তন হল না । আসুন, সবাই মিলে আমরা প্রদীপ জ্বালাই, তারপর আমার মা ফিতে কেটে নতুন হাসপাতালের দ্বরোদঘাটন করবেন ।'

এস-ডি-ও বলে উঠলেন, 'সি ইজ দ্য ফিটেস্ট পারসন ফর দ্য গ্রেট অকেশান ।'

সবাই বলাবলি করতে লাগল, 'এরকম একটা শুভ অনুষ্ঠানে এর থেকে ভালো আর হয় না ।'

মঞ্চের সকলের হয়ে প্রথমেই লক্ষ্মীর উদ্দেশে সংবর্ধনা-পত্রটি পড়লেন উদ্বাস্তু উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকা প্রজ্ঞাপারমিতা মৈত্র । তাঁর কণ্ঠস্বর কিছুটা মাদকতাময় ও সুখশ্রাব্য । বালিসোনায় আসবার আগে কয়েক বছর তিনি আকাশবাণীর ঘোষিকা ও পরে প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ ছিলেন । কেন তিনি আকাশবাণীর অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছেড়ে গ্রামের উদ্বাস্তু বালিকা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়ে চলে এসেছেন, তাই নিয়ে এখনও কেউ কেউ কথা বলে ।

সম্ভাষণপাঠ শেষ হতেই এস-ডি-ও মাইকের কাছে এগিয়ে আসছেন দেখে লক্ষ্মী মাইকের সামনে এসে বলতে শুরু করল, 'আমরা এখানে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের জন্য আসিনি । তার চেয়ে অনেক বড় একটা কাজে মিলিত হয়েছি । আপনাদের সকলের সহযোগিতায় এর সূচনা হয়েছে, এখন সকলের আন্তরিক চেষ্টায় এর অগ্রগতি দেখার অপেক্ষায় থাকব । সরকারি ফান্ডের জন্য সময় নষ্ট না করে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করুন পরিকাঠামোর উন্নয়নে । সেটাই সরকারের কাজ । রাস্তা বাড়ানো, ইলেক্টিক ছড়িয়ে দেওয়া সরকার ছাড়া আর কেউ তো করতে পারে না । এই যে এখানে একটা নদী মজে আছে, শুনেছি ওটাই নাকি আদি গঙ্গা । সেটা খুঁড়ে বের করে আবার সমস্ত বালিসোনা

অঞ্চলকে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত জলপথে যুক্ত করা যায় কি না তার চেষ্টাও সরকারি উদ্যোগ ছাড়া করা যাবে না ।'

অম্বরীশ খানিকটা বিস্ময় নিয়ে ভাইঝির কথা শুনছিল, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'নদী উদ্ধার সরকারি কাজ হতে পারে না । তাহলে তো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দায়িত্বও বিজ্ঞানীর হাত থেকে সরকারের হাতে দিয়ে দেওয়া উচিত । ল অব গ্রাভিটেশন বা থিওরি অব রিলেটিভিটির আবিষ্কারক নিউটন, আইনস্টাইন, কোনও দেশের সরকার নয় ।'

কাকার হঠাৎ এই উত্তেজনায় লক্ষ্মী অবাক ।

মঞ্চে সমান উদ্দীপনায় 'মিস চৌধুরী, আপনি বলুন, মিস ইন্ডিয়া, আপনি বলুন' শুনে দুয়েকটি মুহূর্ত নীরব থেকে লক্ষ্মী বলল, 'আমি খুব খুশি হব, নতুন এই হাসপাতালের নাম যদি আমার মায়ের নামে রাখা হয় । আমার দুঃখী মা তাতে কতটা আনন্দ পাবেন জানি না, কিন্তু আমার আনন্দের সীমা থাকবে না ।'

সহস্র হাততালি থেকে কান বাঁচাতে সরোজিনী কানে আঙুল দিলেন ।

শীত পড়তেই চাষিরা গায়ের খাটো ধুতিতে গা ঢেকে ভোরের কুয়াশার মধ্যে খেজুররস নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে । যাদের মাঠের কাজ তারা লাঙল বা কোদাল নিয়ে মাঠের পথে । বাদার মাটি-কাদার ওপর কচি কচি শাকের বিস্তৃত আবরণে হিল্লোল তুলতে শুধু হাওয়াই পারে । বাদায় এ যেন প্রতি বছরের প্রাকৃতিক উৎসব ।

বাদার যে বিশাল অংশ জলা সেখানে কচুরিপানার বুকে বকের পাল যেন উদ্দেশ্যহীন ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, পানার ফাঁকফোঁকড় দিয়ে ছোট মাছ দেখতে পেলেই ছোঁ মেরে তুলে নিচ্ছে ।

কচুরিপানার শেষে তারই সমান্তরালে উত্তর থেকে দক্ষিণ চলে গেছে বহুকালের পুরনো রেললাইন । নিমাইসন্ন্যাসের সময়ে একবার ভয়াবহ ভূ-কম্পে দূরে সরে যাওয়া সমুদ্রের শুকনো ডাঙায় গিয়ে রেললাইন শেষ হয়েছে ।

রেললাইন পেরিয়ে লাইনের প্রায় সমান্তরালে ঘন বন ।

বন থেকে বেরিয়ে রেললাইন পার হয়ে জলার হাঁটুজল ভেঙে অন্যমনস্কভাবে শাকের খেত মাড়িয়ে অম্বরীশ উইন্ডচিটারের জিপ টেনে কোমর পর্যন্ত নামিয়ে দিল । শীতেও তার কপালে গলায় ঘাম । এবার বাদার উত্তরে দক্ষিণে মনে মনে কিছু একটা জরিপ করে সে বাড়ির পথ ধরল ।

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়ে দ্বিতীয় দিনের মিটিংয়েই অম্বরীশ বালিসোনায় খাটাপায়খানার যুগের অবসান ঘোষণা করেছে । দুজন কাউন্সিলর তার এই সিদ্ধান্তের ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাইলে অম্বরীশ তাদের নিরস্ত করে বলল, 'একজনের মল আরেকজন মাথায় বয়ে নিয়ে যাবে সেটা কি খুব মানবিক? একেক জনকে কতগুলো

বাড়ির গামলা খালি করে নিজের ড্রাম ভরতে হয় কোনও ধারণা আছে আপনাদের? আপনারা মহাত্মা গান্ধির মতবাদের বিরুদ্ধে যেতে চান নাকি?'

বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঘোষণা করে দেওয়া হল- যারা পারবেন তারা যেন তিন মাসের মধ্যে খাটাপায়খানার জায়গায় তিন চেম্বারওলা স্যানিটারি পায়খানা করে নেন। যাদের সামর্থ নেই তাদের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি মাত্র কুড়ি টাকায় সুলভ পায়খানা দেবে। যারা সুলভ পায়খানা নিতে চান, তারা এখন থেকে নিজের জমিতে অগভীর কুয়ো খুঁড়ে রাখুন।

বিদ্রোহী কাউন্সিলর দুজন এবার নতুন আপত্তি তুললেন- 'মাথায় মল বওয়া মেথররা সব বেকার হয়ে যাবে, তাদের কী হবে ভেবেছেন কি?'

'যখন কাজ বন্ধ হবে তখন থেকে তারা মাটি খুঁড়বে। একই মজুরিতে।'

'মাটি খুঁড়বে? কোথায়?'

'দেখতেই পাবেন।'

'আমাদেরও তো জানা দরকার।'

'তাহলে জেনে রাখুন- যারা বেকার হবে তাদের কাজ হবে আমাদের হারানো নদী উদ্ধার করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কিছুটা খুঁড়লেই নদীর চিহ্ন দেখা যাবে। তারপর খুঁড়তে থাকলে একসময় না একসময় নদীর খাতও পাওয়া যাবে। কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি নিজে তদারক করব।'

কাউন্সিলরের গলায় এবার ব্যঙ্গের সুর- 'আপনি কি বরফের কারখানা বসিয়ে হিমবাহও বানাবেন নাকি?'

অম্বরীশ অনেকটা বলে ফেলেছে, নিজেকে সংবরণ করে নিল, ভাগ্যিস সেই প্রাচীন পুথির কথাটা বলে ফেলেনি, যেটা হাটের দিনে সুর করে শুনিয়ে মাতৃহারা মন্তুরো রোজ একবেলা একমুঠো অন্ন জোগাড়ের চেষ্টা করে।

'বালিসোনা নদী তীরে বালিসোনা গাঁ।
নাও ভাসাইয়া যায় সতী বেহুলা।।
সোনাদানা সব লয়ে নাও ডুব্যা যায়।
বেহুলা তখন ভাসে কলার ভেলায়।
জলে সোনা থলে সোনা বালি সোনাগুঁড়া।
খুঁইজ্যা দেখো নদীটার ল্যাজা হইতে মুড়া।।

'এ পুথি তুই কোথায় পেলি?' হাটে মন্তুরোকে জিজ্ঞেস করেছিল অম্বরীশ।

'আম্মার আন্নাঘরের চালার বাতায় গোঁজা ছিলো।'

'আমাকে দিবি? দিলে টাকা দেব।'

'ক'টাকা, কত্তাবাবু?'

'তুই কত চাস?'

'তা দশ টাকা পেলি হয় ।'

'এই নে দশ, আর এই আরও এক । খুশি তো?'

আম্মার ইন্তেকাল হবার পর এই প্রথম মন্থরো আকর্ণ হাসে ।

ভোর ছটা থেকে সন্ধে ছটা পর্যন্ত বাদার নরম মাটিতে ঝপাঝপ তিন কুড়ি কোদাল পড়ে । কখনও গাছের অদৃশ্য শিকড়ে বা গুঁড়িতে কোদাল লাগলে কুড়ুলে শাবলে উপড়ে ফেলা হয় । শুধু মেথর নয়, চাষি, কুমোর, কাঠুরে সকলেই বাদায় কাজ পেয়েছে ।

সন্ধেবেলা সবাই ঘরে চলে গেলে অম্বরীশ পাঁচ সেলের টর্চ নিয়ে খোঁড়া জায়গাগুলো থেকে মাটির ডেলা নিয়ে গুঁড়িয়ে দ্যাখে সোনার গুঁড়ো মেশানো আছে কিনা । না পেয়ে একটুও হতাশ হয় না । নদীর চিহ্নই তো এখনও পাওয়া যায়নি । নদীর খাতে না পৌঁছনো পর্যন্ত পুথির কথার সত্য-মিথ্যার শেষ দেখা হবে না । এখনও তো বালিই ওঠেনি! বালি সোনাগুঁড়া ।

চৈত্র মাসে সকাল থেকে রোদ চচ্চড়িয়ে উঠে গায়ে জ্বালা ধরায় । মাঠঘাট ফুটিফাটা । এর মধ্যে একদিন বিকেলে কালবৈশাখীও বয়ে গেল । বড় বড় কয়েক ফোঁটা ছাড়া আর বৃষ্টি হয়নি, এই যা বাঁচোয়া । বর্ষা নামবে আর কয়েক মাসের মধ্যে । বাদা ডুবে যাবে । তার আগে নদীখাত খুঁজে পাওয়া যাবে কি?

কালবৈশাখীর পরে বিকেলে হাঁটুসমান গর্তে নিদ্দার কোদালে কালো মাটির বড় একটা চাঁই উঠে আসতে তার নীচে ভালো সাইজের মাট্টিমাখা একটা শাঁকালু চোখে পড়ল । খিদেয় পেটে মোচড় দিচ্ছে, নিদ্দা কোমর ভেঙে নিচু হয়ে শাঁকালু তোলবার জন্য আশপাশের মাটি কিছুটা সরিয়ে দেখল ওটা একটা মানুষের পাছার হাড় । এখানে নেচ্যই কখনও গোরস্থান ছিল ।

কাছাকাছি আরও দুজনকে ডেকে এনে সাবধানে মাটি খুঁড়ে দেখা গেল একটা আস্ত নরকংকাল ।

একজন কোদাল ফেলে 'বাপরে' বলে গর্ত থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ে দৌড় লাগাল । এদিকে চেঁচিয়ে যাচ্ছে- 'নিদ্দাকে কংকালে ধরেছে, নিদ্দাকে কংকালে ধরেছে!'

একটা দুটো নয়, সাতটা কংকাল গাদাগাদি করে শুয়ে আছে । কেউ চিৎ হয়ে, কেউ উপুড় হয়ে, কেউ পাশ ফিরে । এ নেচ্যই গোরস্তান । হয় মোছলমানদের নয় তো কেরেস্তানদের । বোষ্টমদের না । তেনাদের তো বসিয়ে মাটি দেওয়া হয় ।

যে পালিয়েছিল, ফজলুল, সে আর কাজে এল না ।

অম্বরীশের নির্দেশমতো সাত কংকাল যেমন ছিল তেমনই মাটিচাপা রইল । কেউ কেউ আবার তার ওপরে আরও কিছু মাটি চাপাল ।

বাদা-শ্রমিকদের প্রয়োজন মেটাতে গত মাসে ওখানেই একটা নলকূপ বসানো হয়েছে । তেষ্টা মেটানো, দুপুরে ঘর থেকে আনা ভাত খাওয়ার আগে হাত-মুখ ধোওয়া- সব

ভালোই চলছিল, চৈত্রের শেষাশেষি অনেকের আঙুলের গাঁট ফুলে উঠতে লাগল, হাতে-পায়ে ঘা হতে শুরু করল ।

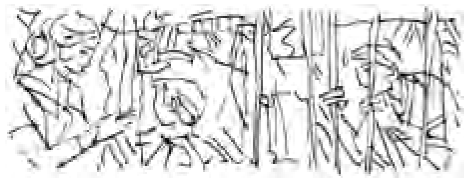
অজানা ব্যাধিতে ভীত শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে দিল ।

পুরসভার তহবিল থেকে সবাইকে বেগুনি রঙের লোশন কিনে বিলি করা হল কিন্তু তাতে কিছু কাজ হল না ।

যারা কাঁধের ঝুড়িতে কোদাল চাপিয়ে সকাল থেকে মাঠে মাঠে কাজ খুঁজে বেড়ায় সেরকম ষোলজন দিনমজুরকে কাজে লাগানো হল । দিনের শেষে নগদ টাকা হাতে পেয়ে তারা আনন্দ করতে করতে ঘরে গেল । পরদিন থেকে আর এল না ।

চেয়ারম্যানের মেয়াদ শেষ হবার ঠিক দুমাস আগে অম্বরীশ পুরসভার সাফাইকর্মীর পদে গয়ানাথের ছেলে দয়ানাথকে খুঁজে এনে বসাল । (তার নাম জিজ্ঞেস করায় দয়ানাথ বলেছিল, ‘আমার নাম, বাবু, গয়ানাথ মেথরের ছেলে দয়ানাথ মেথর ।’) পুরসভার তহবিলে টান পড়ায় সাত মাস তাদের মতো কর্মীদের বেতন মেলেনি, এরকম তেরজনকে এনে নদীর কাজ চালু রাখার চেষ্টা করা হল । তিনজন ছাড়া বাকিরা সপ্তাশেষে তাদের মজুরি নিয়ে সেই যে ঘরমুখো হল আর ফিরল না ।

শ্রাবণমাসের শুরুতে টানা চারদিনের অবিরাম বৃষ্টিতে বাদা জলে ভরে গেল । জেলেরা চাষিরা ডিঙি বেয়ে সেখানে মাছ ধরে বেড়ায় । দূরের আকাশে কালো ধোঁয়ার ফোয়ারা উড়িয়ে ট্রেন যায়, বাদার জলে তার ছায়া থেকেও ধোঁয়া ওড়ে ।



৭

নতুন হাসপাতাল ভবন উদ্বোধনের পর কয়েক মাস এড়িয়ে থাকার শেষে এক শনিবার একাদশীর ঘোলাটে আলোয় খুঁজে খুঁজে অম্বরীশ পারমিতার একতলা বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল ।

জানলার পর্দা ভেদ করে ঘরে হ্যারিকেন বা ডিমলাইটের আলোয় কাউকে দেখা গেল না । দ্বিধা ঝেড়ে অম্বরীশ জোরে দরজার কড়া নাড়ে । তৃতীয়বার কড়া নাড়বার মুখে জানলার পর্দা সরিয়ে একটা ছ-সাত বছরের ছেলে শান্ত চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, ‘মা বাড়ি নেই । তুমি কে?’

‘তোমার মার কাছে আসিনি, আমি এসেছি উদ্বাস্তু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকা প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে দেখা করতে ।’

‘মিতাই তো আমার মা । মিতা টিউশানি করতে গেছে, আটটায় ফিরে এসে আমাকে খেতে দেবে ।’

‘ওহ্, তোমার বাবা কখন আসবেন?’

‘আমার বাবা যুদ্ধ করতে করতে মরে গেছে ।’

অম্বরীশ স্তম্ভিত, পর্যুদস্ত, অসাড় । শুধু বলতে পারল, ‘ওহ!’

পারমিতা পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে । নিশ্বাস বন্ধ করে ছেলের মুখে পিতৃপরিচয়টুকু শোনার পরই অম্বরীশের পাশে দেখা দিয়ে বলল, ‘দরজাটা খোল, পরীক্ষিৎ!’

দরজা খুলে দিয়ে পরীক্ষিতের প্রশ্ন ‘আটটা কি বেজে গেছে, মিতা?’

‘নারে, শেষ টিউশানি এখন ক’দিন বন্ধ থাকবে । ভাইবোন দুজনেই আজ মা-বাবার সঙ্গে পুরী যাচ্ছে ।’

পরীক্ষিৎ পাশের ঘরে আবার ছবি আঁকায় মন দেয় ।

কলকাতার বাসার সেই পুরনো চারটে বেতের চেয়ার, বেতের টেবিল । দুজনে মুখোমুখি বসার পরই অম্বরীশের প্রশ্ন, ‘এ কি আমারই ছেলে?’

দুয়েক মুহূর্ত অম্বরীশের চোখে নিরুত্তর চোখ রেখে পারমিতা বলল, 'এতদিনে তবু প্রশ্নটুকু করলে!'

'তুমি তো বলেছিলে তোমার গাইনি-বান্ধবীর সঙ্গে কথা হয়েছে, ও-ই ব্যবস্থা করে দেবে?'

'প্রথমে তা-ই ভেবেছিলাম । পরে ও-ই আমাকে বোঝাল প্রথম সন্তান নষ্ট না করতে পারলেই ভালো হয় । আমার মনও ওর কথায় সায় দিল ।'

'তোমার মাকে কী বোঝালে?'

'তোমার ওপর মার অগাধ আস্থা । মার আশা ছিল তুমি ফিরে এসে আমাকে বিয়ে করবে ।'

'ও মাই গড!' মাথা নামিয়ে কিছুক্ষণ শুধু ভাবে, তারপর আবার মুখ তোলে, 'তোমাকে কি সব সময় মিতা বলে ডাকে?'

'জন্ম থেকে মার মুখে শুনে শুনে শিখেছে । আমারও ভালো লাগে, তোমার পর, মার পর অন্তত আরও কারও তো মিতা হয়ে আছি ।'

'পরীক্ষিৎ নামটা কি তোমার মার দেওয়া, না তোমার?'

'শুধু ভালো নাম না, ডাক নামও আমি পরীক্ষিৎ রেখেছি । হতভাগ্য বাবা অভিমন্যুর মতোই ও চক্রবূযহে প্রবেশ করতে পেরেছে, বেরবার পথ খুঁজে পাবে কিনা জানি না ।'

'এখানে কেউ কিছু জানে?'

'পরীক্ষিৎ তোমাকে যেটুকু বলেছে সবাই সেটুকুই জানে । তবে ওর মুখে কিন্তু তোমার আদল আছে । ওই বয়সে তুমি হয়তো এমনই দেখতে ছিলে ।'

'আমার জন্যই তুমি বালিসোনায় এসেছ?'

আবার কয়েক মুহূর্ত অম্বরীশের চোখে চোখ রেখে নীরবতার পর পারমিতার ধীর জবাব, 'আমি জানতামই না তুমি বালিসোনায় ফিরেছ । কলকাতায় ফিরে এসেছ খবর পেয়েও কোনও দিন তোমার খোঁজ নিতে চাইনি । রাস্তার পোস্টারে জোড়া বলদের ছবির সঙ্গে তোমার নাম দেখেছিলাম, তবু তোমার ঠিকানা পাবার চেষ্টা করিনি । অমৃতবাজার পত্রিকায় একদিন বালিসোনা উদ্বাস্তু বালিকা বিদ্যালয়ের হেড মিসস্ট্রেসের ভেকেন্সি দেখে অ্যাপ্লাই করে দিয়েছিলাম, এমনিই, কিংবা, কে জানে, হয়তো তোমার গ্রাম বলেই । টিচিং এক্সপিরিয়েন্স ছাড়া এ চাকরি আমার হবে ভাবিনি ।'

'কলকাতায় আমার মেজদার বাড়ি গিয়েছিলে কখনও?'

'আমি তো তাঁদের চিনিই না । ওরা কলকাতায় থাকেন তাও এই প্রথম শুনলাম । তুমিও তো কখনও তাঁদের কথা বলোনি । বসো, একটু চা করে আনি ।'

এই সময় পরীক্ষিৎ মাকে তার সদ্য সমাপ্ত একটা ছবি দেখাতে এসে তখনও অম্বরীশ বসে আছে দেখে বলল, 'ও কে, মিতা?'

'তুমিই জিজ্ঞেস করো। আমি চা নিয়ে আসছি।'

পরীক্ষিৎ মার পিছু পিছু ফিরে গেল।

বাদায় মেঘলা আকাশের ক্ষয়াটে চাঁদের আলোও অনেক পরিষ্কার। ভাদ্রের জল বেশ কিছুটা নেমে গেছে, তবু আশ্বিনের শুরুতেও বাদা প্রায় জলে ডোবা।

অম্বরীশ অনেকক্ষণ বাদার ধারে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ কী দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার সারা শরীরে বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে গেল। বাদার মাঝামাঝি অনেকগুলো নরকঙ্কাল, যেন জলে ভাসছে। কঙ্কাল জলে ভাসে কিনা সে মনে করতে পারল না। চার-পাঁচটা কিংবা হয়তো ছ-সাতটাও হতে পারে। তবে কি নিদ্দার কোদালে ওঠা সেইসব কঙ্কাল? সে তো আবার মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। তাহলে কি বর্ষার জল পেয়ে উঠে এল!

দুটো নরকঙ্কাল চিৎ সাঁতারে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। সাহসে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে অম্বরীশ অলৌকিক দৃশ্যটি পরিপার্শ্বের সমগ্রতায় দেখতে থাকে। একটু পরেই দেখা যায় দুটি ছেলে কঙ্কাল-দুটিকে টেনে আনছে। অম্বরীশ হঠাৎ অন্ধ রাগে ছেলে-দুটিকে চিৎকার করে ধমকাবার আগের মুহূর্তে বুঝল তারা বিশ্বকর্মা ঠাকুরের দুটো কাঠামো টেনে আনছে। চাষিপাড়ার ছেলে দুটোও তার মুখচেনা, হয়তো হাটে দেখেছে। এবছর ভাদ্রসংক্রান্তিতে অনেক ছোট ছোট কারখানায়ও বিশ্বকর্মা পুজো হতে দেখে সে এই নতুন প্রবণতাকে বালিসোনার সমৃদ্ধির সুলক্ষণ ধরে নিয়েছিল।

রাতের খাওয়া শেষ করে অম্বরীশ তার ঘরের সামনে ঝুলবারান্দার হাওয়ায় দাঁড়িয়ে এলাচ খায়। তার জীবনটাও কি এলাচের খোসার একটা টুকরো যেমন হাওয়ার মুখে উড়ে গেল, সেরকম উদ্দেশহীন উড়ে চলেছে?

ঘুম নেই, তবু সে চোখ বুজে থাকে। তার অদ্ভুত জীবনের কথা ভাবে। এক সময় বারান্দায় খড়মের খটখট শুনে অম্বরীশ দেখল জানলা টপকে একটা কঙ্কাল এসে ঘরে ঢুকছে। পিছনে আরেকটা, তার পিছনে আরও একটা। সংখ্যাটা প্রত্যাশা মতো সাত হবার পরই অম্বরীশ বিছানা ছেড়ে সকলকে ঠাকুরদার আমলের বার্মাটিকের লম্বা আসনে বসাল। সারা রাত ধরে চলল তাদের সঙ্গে কথোপকথন। হঠাৎ অবনীর গলা শোনা গেল, পাটের মতো তার লম্বা চুল দাড়ি, সে অম্বরীশকে বলল, 'কারও জীবন আসলে তার সারাজীবনের স্মৃতিপুঞ্জ ছাড়া আর কিছু নারে। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের নাড়ির যোগ। সব স্মৃতি হয়ে বিস্মৃতির সিন্দুকে রাখা থাকে।'

কঙ্কালগুলো সবাই একসঙ্গে 'হক কথা, হক কথা, কত্তাবাবু' বলে বিলীয়মান অবনীমোহনকে মার্বেলের মেঝের ওপর গড় হয়ে প্রণাম করল। ভোর হবার ঠিক আগে, এবার অম্বরীশকে, 'আবার আসব, কত্তা' বলে সবাই জানলা দিয়ে বারান্দায় পড়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

এর পর থেকে প্রায়ই তার ঘরে কঙ্কালদের আসর বসে । ঠাকুদার আমলের বার্মাটিকের ভারি লম্বা বেঞ্চে বসে বালিসোনার নানা ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলে সারা রাত । কঙ্কালরা একদিন ফুলকপির বর্তমান বাজার দরের কথা তুলে একশো বছর আগে এক পয়সায় এক কুড়ি কপির সাইজ ও স্বাদ এমনভাবে বলতে লাগল যেন সেই কপির ঝুড়ি তাদের কোলে বসানো, হাতে তুলে নেড়ে চেড়ে দেখে তারা গন্ধ নিচ্ছে ।

একদিন সকাল আটটায় ঘুম ভেঙেই মনে হল কঙ্কালগুলো চলে যাবার পর সে মাত্রই ভোর রাতে ঘুমিয়েছে । ন'টা নাগাদ পারমিতার বাড়িতে পৌঁছেও ক্লান্তিতে সে কড়া নাড়ল না । বাইরে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে দেখল পারমিতা ছেলেকে খাওয়াবার জন্য একথা সেকথা বলে ভোলাচ্ছে ।

'সারা দিন স্কুলে পড়িয়ে, সন্ধেবেলা টিউশানি করে কত কষ্ট করে টাকা পাই তুই তো জানিস । সেই টাকায় চাল ডাল আলু কিনি, সেই চাল থেকে ভাত হয় । সেই ভাত না খেলে আমার অত কষ্টের টাকাই নষ্ট হয় । এদিকে চালের দাম তো বেড়েই চলেছে । মোটা পাটনাই চাল এই সেদিন ছিল বাইশ টাকা মন, এমাসে চল্লিশ হয়ে গেল ।'

'চল্লিশ হয়ে গেল?'

'চল্লিশ হয়ে গেল ।'

শুনেই সামনে ঝুঁকে, খুব বড় হাঁ করল পরীক্ষিত ।

অম্বরীশ জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে মা-ছেলের অর্থনৈতিক আলোচনা মুগ্ধ হয়ে শোনে ।

পেঁপে সেদ্ধ কিছুতেই খাবে না ।

'পেঁপে চল্লিশ হয়ে গেল' শুনে তাও সে খেয়ে নিল ।

'এবার একচুমুকে দুধটুকু খেয়ে নাও তো বাবা ।'

'দুধ খাব না, দুধে গোরুর গায়ের গন্ধ ।'

'দুধ খাবি না? দুধও তো চল্লিশ হয়ে গেল ।'

'চল্লিশ হয়ে গেল?' বলে দুহাতে দুধের গ্লাস তুলে লম্বা চুমুক ।

জানান না দিয়ে যেমন এসেছিল তেমনই নিঃশব্দে অম্বরীশ ফিরে গেল ।



৮

আকাশে বিরাট একটা গোটানো সতরঞ্চি সামনের দিকে দ্রুত খুলতে থাকলে যেমন দেখাবে প্রায় সেইরকম পঙ্গপালের ঝাঁক আকাশ ঢেকে এগিয়ে আসছে । একটু পরেই আকাশ পরিষ্কার করে তারা কয়েকটা ঝাঁকে ভাগ হয়ে একেক ঝাঁক একেক ধানখেতে নামতে লাগল ।

জীবনে প্রথম এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে নিদ্দার বিস্ময়ের সীমা নেই । সে হতভম্ব হয়ে গেছে । আকাশমুখো পথ চলতে চলতে ওয়াল গরমেন্টের পেসিডেনের সঙ্গে তার প্রায় ধাক্কা লাগছিল ।

ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্টের প্রেসিডেন্ট শিবকৃষ্ণ সাধুখাঁ যথারীতি একবার ডান হাত একবার বাঁহাত মুদ্রার ভঙ্গিতে উত্তোলিত করে দৃশ্য ও অদৃশ্য জনতার উদ্দেশে বলতে বলতে চলেছে- ‘আমি ক্রুশ্চেভকে বলেছি, বুলগানিনকে বলেছি, কেনেডিকে বলেছি, কাস্ত্রোকে বলেছি, মার্শাল টিটোকে বলেছি- আপনারা সবাই ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্টের হেড কোয়ার্টারে এসে পৃথিবী থেকে খাদ্যাভাব দূরীকরণে আমার তত্ত্ব পরীক্ষা করে দেখুন ।’

আকাশের পঙ্গপালের ধাবমান বিস্তারে চোখ পড়তেই নজর তীক্ষ্ণ করে সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল, ‘এ তো চিনাদের কাজ, অন্য গ্রহ থেকে তারা জীবাণু পাঠাচ্ছে । নেহরুকে বলেছিলাম চৌ-এন-লাইকে অতটা বিশ্বাস করো না । সেকথা শোনেনি । এ তারই ফল ।’

নেহেরুর প্রসঙ্গটা নিদ্দার মুখের সামনে তর্জনী তুলে বলল, দুজনেই আকাশে মুখ তুলে হাঁটছিল, শেষ মুহূর্তে মুখোমুখি সংঘর্ষ সামলে নিয়েছে । নাকের ডগায় তর্জনী তুলে বিশাল-দেহী ‘পেসিডেন’ তাকেই মাথামুণ্ডুহীন কঠিন কিছু বলছে আচমকা দেখে নিদ্দার গা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত শিউরে উঠল । তার কাঁধে কাপড়ের ঝোলায় বাঁধা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে তার মার হাতের গরম ঘুগনি, ৩টে ১২র সৈকত লোকালে দিনের প্রথম ঘুগনি নিয়ে সে হকারি শুরু করে, তারপর আপ-ডাউন মিলিয়ে যতক্ষণ না হাঁড়ি শেষ হয় সে ঘরমুখো হয় না । আগে ট্রেনে কচি শশা, তালশাঁস, কালোজাম ফিরি করেছে । দিনের

শেষে যা পয়সা পাওয়া যায় তাতে সংসারের ছ'টা পেট কোনওমতেই চলে না । তার বাপ ফণাধরও আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি, এদিকে তার পরের ভাই বাদেও নিদ্দার ছোট ছোট আরও দুটি ভাই হয়েছে ।

ধাক্কা সামলে থমকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্দার মুখে-মাথায় লঙ্কাজবায় তুলে শান্তিজল ছিটিয়ে দিল প্রেসিডেন্টের সবসময়ের সঙ্গী উমাশশী । মাথায় প্রেসিডেন্টের অর্ধেক, হাতে মাথা খোলা কাঠের ছোট বাক্সে শিবঠাকুর, বুদ্ধ ও যিশুর তিনটি পুতুল, তিলে-চন্দনে মাখামাখি, জানা না থাকলে বা ভালো করে ঠাহর না করলে মূর্তিগুলো তেমন চেনা যায় না । মূর্তির সামনে একটা গাঢ় নীল রঙের বাটিতে খানিকটা জলে কয়েকটা লঙ্কাজবা । মরশুমে ধুতরো, গাঁদা ও অপরাজিতাও থাকে ।

এই ঢ্যাঙাপনা লোকটাকে আর তার সঙ্গের বেঁটে বোষ্টমীকে দেখলেই নিদ্দার ভয় লাগে ।

নিদ্দা যখন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ক্লাস ফোর পাশ করে কয়েক বছর তিনমাইল-কপিখেত ছাড়িয়ে দূরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেত তখন ইসকুলে যাতায়াতের পথে এদের বাড়িও সে দেখেছে । ইটের দেওয়াল, টালির চালার বড় বড় ছ'খানা ঘর, সিমেন্টের রোয়াক, সামনের উঠোনে বিরাট একটা তেঁতুলগাছের গুঁড়িতে টিনের সাইনবোর্ডে আলকাতরায় লেখা:

ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট

সদর দপ্তর

বালিসোনা

ইন্ডিয়া

সামনে স্বয়ং সেই দুজন, মাথার ওপরে ঝড়ে শ্মশানের উড়ন্ত ঘন ছাইয়ের মতো পঙ্গপালের ঝাঁক, নিদ্দার মন কুডাক দিল- ট্রেনে আজ তার ঘুগনি ভালো বিক্রি হবে না, বরং কোনও বিপদ হতে পারে ।

হলও তাই । সন্ধের আগে পর্যন্ত আপ ট্রেনগুলোয় যাও দু-চারজন ঘুগনি নিয়েছে, সন্ধের পর থেকে আর খদ্দের মেলে না । বড় শহর থেকে ফেরার ট্রেনগুলোয় বেশির ভাগ লোকই, বিশেষ করে কলেজের ছেলেরা উত্তেজিত । রাজ্যপাল বিধানসভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেছেন । প্রতিবাদে ক্ষমতাচ্যুত সরকারের শরিক দলগুলো কাল সারা রাজ্যে চব্বিশ ঘন্টা বনধ ডেকেছে ।

সন্ধে আরও ঘন হতেই বন্ধের সমর্থনে বাসরাস্তায় দীর্ঘ মিছিল থেকে স্লোগান উঠতে লাগল । পরদিন সকাল থেকে ট্রেন বাস লরি আটকানো হল । মাথার ওপর চক্রাকারে উড়ন্ত মৌমাছির ঝাঁক নিয়ে সাইকেলের রডে ঝোলানো ব্যাগে মধুর শিশি ভরে কয়েকটা

বাড়িতে মধু দিতে যাচ্ছিল মোহন মউলে । আদিতে সুন্দরবনের বাসিন্দা, বাপ-পিতেমো সুন্দরবনের জঙ্গলে যেত চাক ভেঙে মধু আনতে (সেই থেকে নামের সঙ্গে 'মউলে' জুড়ে গেছে), একবছরের ব্যবধানে বাপ-ঠাকুর্দা দুজনকেই বাঘে নিয়ে যাওয়ায় মোহন নিজের বিয়ের পণের টাকা ও যৌতুক হিসেবে পাওয়া সাইকেল নিয়ে নতুন বউ আর বিধবা মা-ঠাকুমাকে সঙ্গে করে বালিসোনায় এসে ঘর বেঁধেছে । কাঠের বাক্সে মৌপালন শুরু করে সে তার সংসারের নড়বড়ে অবস্থাটা সামলে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে । মোহনের গতি-কমানো সাইকেল ছাড়িয়ে ক্রুদ্ধ স্লোগান দিতে দিতে কলেজ-ছাত্রদের একটা মিছিল খানিকটা এগিয়ে যাবার পর পিছনের আরেকটি মিছিলের একজন হাতের লাঠি দিয়ে সাইকেলে বাড়ি মারা মাত্র মৌমাছির ঝাঁক মোহনের মাথা ছেড়ে ছেলেটিকে আক্রমণ করল । সে 'বাপরে, মারে' বলে মিছিলের সামনের দিকে দৌড় লাগাতেই, মৌমাছির ঝাঁকও মিছিলের দিকে ধেয়ে গেল । এরই মধ্যে মিছিলের একেবারে মাথার দুজন রাস্তার ধারে মাটির হাঁড়ি-কলসির দোকান খোলা দেখে লাঠি মেরে হাঁড়ি-কলসি ভাঙতে লাগল । চোখের সামনে এই সর্বনাশ দেখে দোকানের মালিক সাদা দাড়িওলা মুসলমান বৃদ্ধ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে ভাঙা হাঁড়ি-কলসির ওপরেই লুটিয়ে পড়ল ।

চালের দর চড়তেই থাকে ।

মরা নদী যেখানে অনেক দূর অবধি মোহনার জোয়ারের জলে ভরে যায় সেই সুদূর সমুদ্রোপকূলমুখী নদীপাড়ের গ্রাম থেকে সাইকেলের রডে ঝোলানো, ক্যারিয়ারে বাঁধা চালের বস্তা নিয়ে সারি সারি সাইকেল পুলিশ হোমগার্ডের চোখ এড়িয়ে, ধরা পড়লে ঘুষ দিয়ে, সকাল-সন্ধ্যা শহরের দিকে ছুটতে থাকে । দক্ষিণের গ্রামগুলো থেকে গরিব চাষি মেয়ে-বউরা শহরমুখী রেলের কামরায় সিটের নীচে, বাঙ্কে পুরনো লেপ-তোষক কোলবালিশের আকারে, কখনও-বা ছ-সাত মাসের পোয়াতির ছদ্মবেশে পেটের সঙ্গে বেঁধে লুকিয়ে যে যতটুকু পারে চাল নিয়ে শহরে যায় । স্টেশনে ট্রেন ঢোকবার অনেক আগে থেকে চালের বান্ডিলগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে রেললাইনের ধারে ফেলে । সেখানে ফড়েরা থাকে । স্টেশনে নেমে রেললাইন ধরে হেঁটে ফিরে এসে ফড়েদের কাছ থেকে চালের দাম নেয় ।

চাল পাচারের সুযোগ-সামর্থে্যর অভাবে গরিব চাষি তাঁতি কামার কুমোরদের ভাতে টান, হাতে নগদ পয়সার টানাটানি পড়ে । অনেক ঘরেই অলীক আশায় গ্রাম ছেড়ে শহরে যাবার হিড়িক পড়ে গেল । কেউ কেউ ভিটেমাটি বেচে বা বন্ধকী জমিজায়গা ছাড়াবার আশা জলাঞ্জলি দিয়ে অচেনা শহরের অনিশ্চিত পথে রওনা হল ।

জটেরামের মা চলন্ত রেলগাড়ি থেকে হোমগার্ডের তাড়া খেয়ে রেললাইনে পড়ে মারা যাবার পর প্রথমে জটেরাম ও পরদিন তার প্রতিবেশী রহিমচাচাও গ্রাম ছেড়ে শহরের পথ ধরল । বিল্ব দোলুইয়ের ছেলে, গ্রামের একমাত্র লাঙল-ঠেলা উচ্চমাধ্যমিক পাশ ভরতই

রহিমচাচাকে প্রথম দেখতে পেল। রহিমচাচা ছেলে মেয়ে বিবি নিয়ে ইস্টিশানের দিকে যাচ্ছে। তিনজনের হাতে পোঁটলাপুটলি, টিনের সুটকেস।

'ও রহিমচাচা, তুমিও কলকাতা চললে? সেখানে কি বাবুরা রাস্তার ধারে অন্নসত্র খুলে রেখেছে?'

ভরতের কথায় চাচি ঘোমটা সরিয়ে তাকাল। দৃষ্টি দিশেহারা। দুঃসহ যন্ত্রণায় ঠোঁট চেপে কান্না সামলে রেখেছে।

দুটো গোটানো মাদুর, পাড়-বসানো একটা শীতলপাটি মাথায় নিয়ে শকলু এগিয়ে গিয়েছিল, রহিমচাচা ডাক দেয়- 'এট্টু আস্তে আস্তে চ বাপ।' ভরতের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কলকেতায় একটা কাজের বেবস্থা হয়েছে। সোডা আইসক্রিমের কলে।'

'মিছে কথা! আমরা শহরে যাচ্ছি ভিক্ষে করতে। আম্মা, আব্বাজান, আমি, শকলু আস্তায় আস্তায় ভিখ মেগে বেড়াব। এতক্ষণে বুঝলে, ভরতদা!'

সাকিনাকে এমন ফটফট করে কথা বলতে আগে শোনেনি ভরত। টেনে চুল বেঁধে লম্বা বিনুনি ঝুলিয়েছে। শাড়িটা ছেঁড়াফাটা, কিন্তু জেল্লাদার। ওর মার শাদির নিশ্চয়ই। ক'মাস আগেও মেয়েটা ইজের পরে খালি গায়ে ঘুরত। একবার পদ্মপুকুরে পায়ে শাপলা জড়িয়ে ডুবে যাচ্ছিল, ভরতই ঝাঁপিয়ে পড়ে চুলের মুঠি ধরে টেনে তোলে।

'লাঙল বলদ তবে বেচে দিলে?'

'কী করি? বড় শহরের চাকরি, ওসব দিয়ে আর কী করব?'

'তোমার বিঘে-কতক নিজের ছিল না?'

'ছেল তো কতই!'

শকলু পিছন ফিরে হাঁক পাড়ে- 'তোমরা কি দেঁইড়েই থাকবে নাকি?'

একেকদিন স্টেশনের প্লাটফরমের একটা দিক গ্রাম-ছাড়াদের ভিড়ে প্রায় ঢাকা পড়ে যায়। ট্রেন আসা মাত্র নিমেষে সারা স্টেশনে ছড়িয়ে পড়ে হুড়োহুড়ি ধাক্কাধাক্কি করে ট্রেনে উঠে পড়ে। মাঝপথে মোবাইল চেকিং হলে পুলিশসুদ্ধু কালোকোটের চেকারবাবুকে দেখে কেউ কেউ চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে। বাকিদের পরের স্টেশনে জোর করে নামিয়ে পুলিশ ভ্যানে তুলে নেওয়া হয়। অল্প যে-দুয়েকজন টয়লেটে ঢুকে কিংবা ট্রেনের বাইরে দরজা বা জানলার রড ধরে ঝুলে পড়ে আত্মগোপনের মরিয়া চেষ্টা করে তারা ধরা না পড়লে কামরায় উঠে এসে স্বস্তির শ্বাস ফেলে।

শেষ বিকেলের আলোয় রাস্তা জুড়ে লম্বা লম্বা ছায়া ফেলে এক দল নানা বয়সি মেয়ে-পুরুষকে হাতে মাথায় গেরস্থালী জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনের দিকে যেতে দেখে ওয়াল গরমেন্টের পেসিডেন শিবকেষ্টবাবু এক হাতের তালু উঁচিয়ে আরেক হাতের তর্জনী তুলে গ্রামত্যাগীদের থামিয়ে চিৎকার করে বলে চলেছে, 'নেহেরুকে আমি দিব্যি দিয়ে বলেছি-

দেশভাগে রাজি হয়ো না, তবু তোমরা দেশের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাবে? দেশ হল মানুষের মা, মাকে কেউ ছাড়ে নাকি!'

তার কথায় কেউ কান দিচ্ছে না দেখে সে আরও এগিয়ে এসে বলল, 'ভাই সব, আজ আমার বাড়িতে সারা রাত কীর্তন হবে । ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্টের সভা হবে । নেহেরুকে জিন্নাকে মাউন্টব্যাটেনকেও আসতে বলেছি । ভারত ভাগ কীভাবে আটকানো যায় তা নিয়ে আজ আলোচনা হবে । চলো ভাই সব, সবাই আমার সঙ্গে এসো । ঢালাও খিচুড়ির ব্যবস্থা হয়েছে ।'

কয়লাখনি জাতীয়করণের বলি শিবকৃষ্ণ সাধুখাঁর ধানবাদের তিনটে খনির জন্য কোনও ক্ষতিপূরণ না পেয়ে দীর্ঘদিন সে তার বালিসোনার বাড়ির ছাদ ঢালাই করতে পারেনি । সরকারি দপ্তরে বৃথা দৌড়োদৌড়ি ও নিষ্ফল প্রতীক্ষার পর শেষ পর্যন্ত টালিতে ছ'টা ঘরই ছাইতে হয় । এই সময়ে তার স্ত্রীও তাকে ছেড়ে যায় । তারপর থেকেই ক্রমশ তার ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা ও সাধনসঙ্গী হিসেবে মাথায় তার অর্ধেক এই রমণীকে দীক্ষাদান । এই আর্থিক-পারিবারিক বিপর্যয় থেকেই রাস্তায় বেরিয়ে পথচলতি মানুষজনের উদ্দেশে শিবকৃষ্ণের বক্তৃতার সূচনা বলে মানতে চাননি তার রোগের প্রথম পর্যায়ের সাইকিয়াট্রিস্ট, শহরের ডাক্তার মনোরঞ্জন কর । মাস তিনেক চিকিৎসার পর ডাক্তার রায় দিয়েছিলেন- রাজনৈতিক বিশ্বের আগ্নেয়গিরি থেকে তার এই উদ্দাম অপ্রকৃতিস্থ উদগীরণ । তার একটা পুরনো ডায়েরিতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত বিশ্লেষণ ও তার নিজস্ব মন্তব্য খুঁটিয়ে পড়ে ডাক্তার তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছন । ডায়েরির একটা বাক্যে ডাক্তারের চোখ আটকে গিয়েছিল । কিছুদিন পর পর একই কথা বার বার লিখেছে- মানুষের ধ্যান-ধারণার যে-ইতিহাস, আমি কি তারই সৃষ্টি? আমি কি তার স্রষ্টা হতে পারব? সাইমালটেনিয়াসলি?

শিবকৃষ্ণর রোগলক্ষণের একটা বৈশিষ্ট্যও তিনি লক্ষ করেছিলেন, তা হল সারা দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে পথচারীদের কাছে তার রাজনৈতিক নিদান ঘোষণা করে বাড়ি ফিরে প্রাচীন আমড়াতলায় সঙ্গিনীর অবিরাম পাম্প করে তুলে দেওয়া নলকূপের শীতল জলে অনেকক্ষণ স্নানের পর তার কথাবার্তায় আচার-আচরণে পাগলামির আর কোনও লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যেত না । এমনকী কয়লাখনি জাতীয়করণের ক্ষতিপূরণের বিপুল অর্থ গত বছর এক মঙ্গলবার অপরাহ্ণে অপ্রত্যাশিতভাবে হাতে পাওয়ার পর তার পরের মঙ্গলবার থেকেই প্রতি সন্ধ্যায় বাড়িতে সকলের জন্য নামসংকীর্তন ও খিচুড়িভোগের উৎসব চালু করে দিয়েছে । একসময় যে নিদ্দা ওয়াল গরমেন্টের পেসিডেনকে সামনে দেখে ভয় পেয়েছিল, সেই নিদ্দাও এখন মঙ্গলবার রেলে ঘুগনি ফিরি বন্ধ রেখে ঘরের সবাই মিলে সারা দিন উপোস করে থাকে, সাঁঝ লাগলেই মা-ভাইদের নিয়ে পেসিডেনের বাড়িতে চলে যায় । পেট চেপে অপেক্ষা করে নামসংকীর্তন কতক্ষণে শেষ হবে । নিজেরা আকণ্ঠ খেয়ে ঘরের মানুষটার জন্য মাটির কলসিতে খিচুড়ি নিয়ে আসে । যে তিনজন বলশালী লোক

বড় বড় দুটো উনুনে বিরাট ডেকচিতে খিচুড়ি রাঁধে, তাদের একজন নিদ্দার মার কলসিতে গরম খিচুড়ি ঢেলে দেয় । তিনজনই শিবকৃষ্ণের তিন কয়লাখনির সবচেয়ে বিশ্বস্ত পাহারাদার ।

এক মঙ্গলবার, মাঘী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় নামসংকীর্তনের শেষে সবে খিচুড়ি ভোজন শুরু হয়েছে, অম্বরীশকে দেখে অর্ধেক মানুষের হাতের গ্রাস হাতে আটকে গেল । শিবকৃষ্ণ তাকে দেখতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে কাছে এসে বলল, 'এ কী কত্তাবাবু, আপনি?'

'শোনো, শিবকেষ্ট, যারা মাটি খুঁড়ছে তাদের জন্য আমি পাউরুটির কারখানা বসিয়েছি জানো তো? কাজের ফাঁকে ওদের আমি রোজ বিনা পয়সায় পাউরুটি খাওয়াই । সবাইকে দিয়েও, কারখানার অনেক পাউরুটি থাকে, সেগুলো বিক্রির জন্য দোকানের লোকেরা এসে ধারে নিয়ে যায়, পরদিন আবার যখন নিতে আসে তখন আগের দিনের দাম মিটিয়ে দেয় । তুমি সবাইকে মঙ্গলবার খিচুড়িভোজ দিচ্ছ, আমি বলি কী, রোজ সকালে বা বিকেলে বালিসোনার গরিব মানুষ যাতে তোমার বাড়ি থেকে মাথাপিছু একটা করে পাউরুটি পায় তুমি তারও ব্যবস্থা করতে পারো, পারো না? যদি ধারে নিতে চাও, ধারে পাবে । ডিসকাউন্টেড প্রাইসে চাও তাও করে দেব ।'

সেই থেকে ওয়াল গরমেন্টের উঠোন সারা সকাল বালিসোনার চাষি তাঁতি জেলে কামার-কুমোর, খাটালপাড়ার গয়লা, উত্তরের বেদেপাড়া- সকলের আনাগোনায় মুখর হয়ে উঠল । যেহেতু মাথাপিছু একটা পাউরুটি, তাই সদ্য হাঁটতে শেখা বাচ্চা-কাচ্চাদেরও তারা সঙ্গে আনে । তাদের আলাদা লাইন । শিবকৃষ্ণ নিজে শিশুদের কচি হাতে রুটি তুলে দেয় । তারা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলে- কখনও অকারণ লজ্জায়, কখনও অনির্নেয় উল্লাসে, কখনও আশপাশের সবাইকে ভুলে, কখনও ভাঙা-ভাঙা বাক্যে, কখনও ছোট ছোট বাক্যে, তাদের সেই কলকাকলি শুনতে শুনতে শিবকৃষ্ণ হঠাৎই একদিন নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে ওঠে- তোদের বাক্যের ভেতরে ভগবান বাস করেন ।

এক রবিবার সকালে অম্বরীশ পারমিতা-পরীক্ষিৎকে শিবকৃষ্ণর উঠোনে শিশুদের কাকলি শোনাতে নিয়ে গেল । তার কারখানার গরম পাউরুটির প্রতীক্ষায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লাইনে তখন পাখির কিচিরমিচির চলছে । উঠোন জুড়ে বালিসোনার দীন-দরিদ্র মানুষের ভিড় । কিছুদিন আগেও যারা ভিটে-মাটির মায়া ছেড়ে ভিক্ষের আশায় শহরমুখো হবার কথা ভাবত তারা আর তা ভাবে না ।

'কে না খেয়ে মরলেও নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে যাবে না, আর কে পেটের তাগিদে নিজের গ্রাম পিছনে ফেলে চলে যাবে- ভালো করে এদের মুখের দিকে তাকাও, মুখ দেখে তুমি বুঝতে পারবে ।'

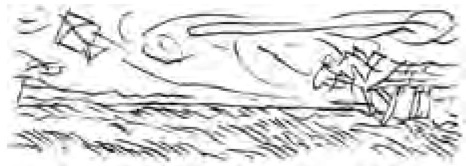
'অত ক্ষমতা আমার নেই ।' বলে পারমিতা ছোটদের দলে ভিড়ে গেল । পরে অম্বরীশকে তারও একটা পর্যবেক্ষণ শোনাল- 'শিশুদের মুখে কখনও কোনও অমানবিক

ভাব হয় না তুমি দেখেছ?'

অম্বরীশ চোখে সেই ঝিলিক নিয়েই বলল, 'রোববার করে এখানে এসে এদের অ আ ক খ শেখাও না কেন! স্কুলে যাবার পথেও এক-আধঘন্টা পড়িয়ে যেতে পারো ।'

এইভাবেই পারমিতার হাতে বালিসোনার নিরক্ষর বাপ-মার সন্তানদের বর্ণ পরিচয় শুরু হল । ক্রমশ মুখে মুখে রটে গেল রোববারের পাঠশালার কথা । বছর না ঘুরতেই মঙ্গলবারের নামসংকীর্তনের বদলে একই সময় চালু হল বয়স্কদের বর্ণপরিচয় । তারপর খিচুড়ি ভোগ । শিশুদের রোববারের পাঠশালার মতো বয়স্কদের 'মংলার' ইসকুলেও ভিড় বাড়তে লাগল । ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্টের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ক্রুশ্চেভ, বুলগানিন, চৌ এন লাই, ফিদেল কাস্ত্রো, মার্শাল টিটোর বাক্যালাপ কমতে কমতে কবে যে বন্ধ হয়ে গেল, কারও চোখে পড়েনি । তখন কেউ যদি শিবকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করত 'কেমন আছেন?' বা 'কেমন আছো হে?' উত্তরে সে শুধু বলত, 'ছোটদের সঙ্গে যতক্ষণ থাকি আনন্দে থাকি, অন্য সময় বড় ক্লান্ত লাগে ।'

এইসময় থেকে সে আবার ডায়েরি লেখা শুরু করে, এবার খুব অনিয়মিত ।



৯

মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে ঢুকতে গিয়ে অম্বরীশ থমকে গেল । দরজার মাথায়, দু'পাশের দেওয়ালে কোথাও লেখা- 'ছেলে কার?' কোথাও লেখা- 'মিতার ছেলের পিতা কে?' কোথাও তাকেই সরাসরি আক্রমণ- 'অম্বরীশ, চিংড়িফিশ, তুই না খাস তো আমায় দিস ।'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে, তখনও-হাতে-ধরা এলাচের ডিবে গায়ের জোরে টেবিলে ঠুকে মিটিংয়ের জন্য অপেক্ষারত কাউন্সিলারদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে অম্বরীশ বলল, 'এসবের মানে কী? কারা এসব লিখেছে?'

একজন কৃষকনেতা এবছরই প্রথম কাউন্সিলার হয়েছেন, টিপ্পনি কাটলেন, 'একদানা বীজ না হলি যেমন চারা গজায় না, এক কণাও সত্যি না থাকলি তেমনি গুজবও রটে না ।'

সকলের কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অম্বরীশ গম্ভীর স্বরে বলল, 'থানায় জানিয়েছেন?'

'এটা কি সেরকম একটা ইস্যু?'

'নিশ্চয়ই । সন্দেহজনক সকলের হাতের লেখাই আমি মেলাব ।'

তারপরই টেবিলের কলিং বেল বাজিয়ে একজন পিওনকে পেয়ে হুকুম দিল- দেয়ালের লেখাগুলো সব মুছে ফেল । চৌকিদারকে ডাকিয়ে এনে ধমকাল । উপস্থিত সবাই চুপ করে দেখছিল, একজন বলল, 'আজকের অ্যাজেন্ডায় মাটি খোঁড়া ছিল এক নম্বরে । সেটা কি এখন শুরু হতে পারে?'

অম্বরীশ মৌনসম্মতি জানিয়ে প্রথমেই বলল, 'মাটি খোঁড়ার কাজে বাড়তি লোক যা নেওয়া হচ্ছে তার সব খরচ ব্যক্তিগতভাবে আমিই জোগাচ্ছি । পৌরসভার ওপর আর বাড়তি বোঝা চাপাতে চাই না ।'

কৃষকনেতার ব্যাঙ্গোক্তি, 'ওখানে কি মানুষ আখ চাষ করবে, না মাছ চাষ করবে?'

পোলিওয় প্রতিবন্ধী কাউন্সিলার কৃষকনেতার কথার পিঠেই বলল, 'চৌধুরীসাহেব ওখানে স্টিমার চালাবেন ।'

অন্য একজনের মতও শোনা গেল- ‘মাটি খুঁড়ে শেষ পর্যন্ত যদি নদীর পাঁজরাটা পানও, তার প্রাণপ্রবাহ অর্থাৎ জল তো পাওয়া যাবে না ।’

‘জল পেতি হলি, সকলকে ওখানে বারোমাস তিরিশ দিন মুততি বলতি হয় ।’

একটা তুচ্ছ লোকের এমন তীব্র কটাক্ষেও অম্বরীশ রাগ ও বিরক্তি চেপে রাখে । সে তো আর বলতে পারে না- জল নয়, সে খুঁজছে বালি । যে বালি পাওয়া গেলে বালিসোনা হয়তো একদিন সারা ভারতের সবচেয়ে ধনী গ্রাম হয়ে উঠবে ।

দুপুরে রোজকার মতো খাওয়ার জন্য বাড়ি না গিয়ে অম্বরীশ পারমিতার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে আদিগন্ত সবুজ ধানখেতের মধ্যে লাল টালির ছোট্ট একমাত্র বাড়িটা নুতন চোখে দেখে । ধানখেতের ওপরের আকাশে অল্প উঁচু দিয়ে একটা পেটকাটা চাঁদিয়াল কেউ পিছন দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে । ঘুড়িতে বাঁধা তার হাতের টানটান সুতোর গতিবিধি দেখে অনুমান করা যায় খেতের আল ধরে ছুটে চলেছে ঘুড়ির আনাড়ি মালিক ।

পারমিতা দরজা খুলে দিয়ে বলল, ‘এক মিনিট বসো, আমি পরীক্ষিৎকে ডেকে আনি । ধানখেতে ঘুড়ি ওড়াতে গেছে অনেকক্ষণ ।’

বাইরে বেরিয়ে এসে গলা তুলে ডাকল, ‘পরীক্ষিৎ, তুই কোথায় রে? আর কত ঘুড়ি নিয়ে দৌড়বি? এবার ফিরে আয় । ধানখেতে সাপ থাকে বাবা, তাড়াতাড়ি চলে আয় ।’

পরীক্ষিতকে আল ধরে ফিরতে দেখে অম্বরীশ বলল, ‘ওকে নিয়ে কানাঘুঁষো তুমি শুনেছ? দেওয়ালে কী সব লিখেছে দেখেছ?’

‘বাড়ির পশ্চিমের দেওয়ালটা দেখে এসো- সামনের দেওয়ালে লেখার সাহস পায়নি বা সুযোগ পায়নি । এরা কারা?’

‘আমি তো তোমাকেই জিজ্ঞেস করতে এসেছি । স্টেশন মাস্টারের ঘরের দেওয়ালেও লিখেছে ।’ একটু থেমে, ‘আমাকে বিয়ে করবে?’

‘হঠাৎ? দেওয়াল লিখনের ভয়ে?’

‘আজকাল রাতে একা শুতে আমার ভয় করে ।’

‘সে তো দরজার বাইরে পাহারা বসালেই পারো ।’

‘সে ভয় না, ভূতের ভয় ।’

‘ভূতের ভয়, তোমার?’

‘ভালোবেসে বিয়ে করলে না, এবার করবে ভয়ে, তাও ভূতের ভয়ে?’ কথাটা মুখে বলার আর ইচ্ছে হল না ।

আগের দিন সন্ধে ঘন হবার পর সবচেয়ে গভীর গর্তের তলা থেকে বালি তুলেছিল অম্বরীশ, ব্রিফকেস থেকে বালির প্যাকেট বের করে পারমিতাকে দিয়ে বলল, ‘চ্যাটালো কড়াইয়ে জল দিয়ে বার বার ডাইনে-বাঁয়ে নাড়িয়ে নাড়িয়ে দেখো তো সোনাচুর পাওয়া যায় কিনা ।’

‘ভূতের ভয়ের মতো এই বালি ঘাঁটাও তোমার এক পাগলামি ।’

অম্বরীশ দৃশ্যতই আহত বোধ করেও পরীক্ষিতকে বলল, ‘ঘুড়ি ওড়াতে দৌড়োতে হয় বুঝি! এসো, তোমাকে ঘুড়ি ওড়ানো শিখিয়ে দিই ।’

ঘরের বাইরে ছোট উঠোনে পরীক্ষিতের কাছ থেকে ধরাই নিয়ে, অম্বরীশ আকাশের অনেক উঁচুতে ঘুড়ি তুলে পরীক্ষিতের হাতে লাটাই দিল । পারমিতাকে বলল, ‘একটু চোখ-কান খোলা রেখো, কে এসব লিখে বেড়াচ্ছে জানা দরকার । তারপই প্রসঙ্গ পালটিয়ে, ‘রোববারের পাঠশালা, মঙ্গলের ইসকুল কীরকম লাগছে?’

‘ভালো, খুব ভালো । এখন তো জায়গাই কম পড়ে যাচ্ছে । শিবকৃষ্ণবাবুর দেওঘরে একটা বাড়ি আছে, ওটা বিক্রি করতে গেছেন । বলে গেছেন ফিরে এসে স্কুলের জন্য বড় দোতলা বিল্ডিং করে দেবেন ।’

‘ছেলেকে কোন স্কুলে দেবে ভেবেছ কিছু?’

‘আরও দু-বছর যাক, একটু বড় হোক । জানো তো, রোববারের সকালের পাঠশালা আর মঙ্গলবারের সন্ধের স্কুল- দুটোতেই পরীক্ষিতের খুব আগ্রহ । ওখানে ওর অনেক বন্ধুও হয়ে গেছে ।’

অঘ্রাণ মাসে তার মিতার বিয়ে হবে শুনে পরীক্ষিতের ভারী উৎসাহ । দেরিতে হলেও, বিয়েতে চিরকালের অনিচ্ছুক প্রৌঢ় অম্বরীশের বিয়ের খবরে চৌধুরী পরিবারের সকলেই একই সঙ্গে কৌতূহলী ও খুশি । সংসারত্যাগী অবনীমোহন বাদে চৌধুরীদের আর সকলেই বিয়ের আগে থেকে সপরিবারে হাজির হয়ে বহুকাল পরে চৌধুরী বাড়িতে উৎসবের হাওয়া তুলেছে ।

বিয়ের ঠিক আগের দিন বিদেশ থেকে এসে পৌঁছল লক্ষ্মীপ্রতিমা, সঙ্গে এক লম্বা সুদর্শন সাহেব । গালে চিবুকে বাদামি রঙের পাতলা লতানো দাড়ি । দুচোখে যেন দুটি নীলকান্ত মণি বসানো । বাংলা বলে থেমে থেমে, তবে সম্পূর্ণ নির্ভুল । কাকার বিয়ের পরই দুজনে হিন্দুমতে, সব আচার-অনুষ্ঠান মেনে বিয়ে করবে । বালিসোনায় একটা খুব অন্য ধরনের স্কুল তৈরি করা এদের স্বপ্ন ।

অঘ্রাণে পঞ্চমী তিথিতে মহা আড়ম্বরে অম্বরীশের বিবাহ সুসম্পন্ন হবার পাঁচ দিন পর গোধূলি লগ্নে লক্ষ্মীপ্রতিমার বিয়েতে বালিসোনার আকাশ-বাতাস যেন একসঙ্গে মহাষ্টমী পুজো ও ঈদের খুশিতে ভরে উঠল । কিছুদিন পৈতৃক বাড়িতে কাটিয়ে লক্ষ্মীও স্বামী লিওনকে নিয়ে আদিগন্ত ধানখেতের মধ্যে পারমিতার ছেড়ে যাওয়া লাল টালির ছোট্ট বাড়িটা তার মালিক উদ্বাস্তু বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি দুখীরাম মান্নার কাছ থেকে কিনে পাশ্চাত্য রীতিতে কিছু অভ্যন্তরীণ অদল-বদল করে নিয়ে সেখানেই উঠে গেল । বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছবার আগে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে পড়ে লিওনের প্রথম কথা, ‘স্বপ্নের শিক্ষালয় নিয়ে সীমাহীন জল্পনা-কল্পনার এ হল উপযুক্ত স্থান ।’

দিদিদের নতুন বাড়িতে রওনা করিয়ে দিয়ে সরস্বতী-তাপস লখনউয়ে ফিরে গেল। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির মেয়াদ পরশুই শেষ। লিওন, পুরো নাম লিওনার্দো উনগারেত্তি, বাড়ির পিছনের বিরাট ফাঁকা জায়গায় বালিসোনার কৌতূহলী মানুষের জমায়েতের ঠিক মাঝখানে বসে সে তার দেশের আশ্চর্য সব পাথরে গড়া ইতিহাসের কথা বলে। সে-দেশের বিচিত্র রীতি-নীতি, গান-বাজনা, মাইলের পর মাইল জলপাইবাগানের গল্প বলে। প্রথম দুয়েকদিন সবাই অবাক হয়ে তার থেমে থেমে বলা প্রত্যেকটি শব্দ শুনল। চকোলেট বিলোন বন্ধ হতে পরীক্ষিৎ ছাড়া আর কোনও শ্রোতা পাওয়া গেল না।

লক্ষ্মীপ্রতিমা যতক্ষণ তার হাসপাতাল নিয়ে কাটায়, পারমিতা যতক্ষণ তার উদ্বাস্তু বালিকা বিদ্যালয় নিয়ে থাকে, অম্বরীশ যতক্ষণ তার নদীর সন্ধানে মেতে থাকে, পরীক্ষিতও ততক্ষণ লিওনের গা ঘেঁসে বসে আজব গল্পের রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়। এমনিতেই তার মিতার আগের বাড়ির সেই আকাশের মতো বড় ধানখেত থেকে সে রোজই তার ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত সব গল্প পেয়ে যায়।



১০

লিওন-লক্ষ্মীর কল্পনার স্কুলের জন্য জায়গা বাছা হল কামান-মাঠের পিছনে পরিত্যক্ত পোড়ো জমিতে, যেখানে ইংরেজ সেনাবাহিনী যুদ্ধের সময় ট্রেঞ্চ খুঁড়ে রেখে গেছে। ওই অংশটা ঠিকঠাক করে তার ওপর স্কুলের বিল্ডিং উঠবে, আর তার সামনে পুরো কামান-মাঠ জুড়ে হবে স্কুলের খেলাধূলার বিরাট এলাকা। কামান দুটো স্মারক হিসেবে রেখে, বাকি অংশে ফুটবল, ভলি, ব্যাডমিন্টন খেলার জায়গা, ধানখেত, সবজিখেত, ফুলবাগান, ফলবাগান, একপাশে নৌকো বাইবার বৃত্তাকার খাল, সাঁতারের পুকুর ইত্যাদি অনেক কিছুই করার পরিকল্পনা। লিওন দিনের পর দিন রাত জেগে পুঙ্খানুপুঙ্খ নকশাও তৈরি করে ফেলল।

একসময়ের এই জমিদারী সম্পত্তির বর্তমান মালিক বালিসোনা পৌরসভা। তাদের কাছ থেকে নিরানব্বই বছরের লিজ নিয়ে স্কুল তৈরির কাজ শুরু হতে হতে বালিসোনায় বহিরাগতের ভিড় দ্বিগুণ বেড়ে গেছে।

এক অমাবস্যার রাতে কলকাতার লটারির দোকানের গাড়ির ড্রাইভার, মন্থরোর মা'র নাতি সুজাকে জনশূন্যিমোড়ে গাড়িসুদ্ধ আটকাল হিন্দু পাড়ার ছেলেরা। গাড়ি থেকে সুজাকে টেনে নামিয়ে পিছনের দরজা খুলতেই পাঁচ-সাত দিন বয়সের অনেকগুলো বাছুর ভীত সন্ত্রস্ত পায়ে হুড়মুড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। কয়েকটা বাছুর চার পা মুড়ে শুয়ে আছে, তাদের ওঠারও ক্ষমতা নেই। পাঁচ সেলের টর্চের আলোয় কোমল ফুটফুটে দুধের বাছুরগুলো দেখে মন স্নেহে দ্রব হয়। সুজা এদের এভাবে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? অমাবস্যায় বা কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাতে এর আগেও কয়েকবার সুজাকে গাড়ি নিয়ে আসতে যেতে কেউ কেউ দেখেছে।

হিক্কা তোলার মতো চাপা হাম্বা শুনে ছেলেরা এক হ্যাচকায় গাড়ির ডিকি খুলে টর্চ ফেলতেই দেখা গেল সেখানেও ঠাসাঠাসি করে কচি কচি মুমূর্ষু বাছুর পড়ে আছে। ঢাকনা খোলা পেয়ে কয়েকটা বাইরে এল। কয়েকটা উঠল না, হয়তো মরে গেছে।

সুজা প্রথমে কিছু টাকা এগিয়ে দিয়ে ছাড়া পেতে চেষ্টা করল । হঠাৎই কিল চড় ঘুষি লাথি খেয়ে স্বীকার করল, গয়লাপাড়া থেকে মাঝে মাঝে সে এইসব কচি বাছুর কলকাতায় নিয়ে যায় । সেখানে প্যাকিং করার পর এগুলো খিদিরপুর ডকে পৌঁছে দিয়ে তার ডিউটি শেষ । তার এতে কোনও দোষ নেই ।

আক্রমণকারীরা সুজাকে ছেড়ে ভীত সন্ত্রস্ত বাছুরদের মধ্যে থেকে তুলনায় বেশি সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান বাছুর বেছে নেওয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, সেই সুযোগে সুজা গাড়ি নিয়ে পালাল ।

পরদিন প্রায় একই সময়ে লাস্ট শোয়ে সিনেমা দেখে বেসুরো গলায় ‘প্যার কিয়া তো ডরনা কেয়া’ গাইতে গাইতে চারজন তরুণ ঘরের পথ ধরেছে, অন্ধকার ফুঁড়ে ছ’জন লোক তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, দুজনের হাতে মাংস কাটা ছুরি, একজন তাক করে আছে ওয়ান শটার, আরেক জন, সে সুজা, লম্বা টর্চ পথচারী চারজনের মুখে ফেলে ‘এইটা, এইটা, এইটা, এইটা’ বলে গত রাতের আক্রমণকারীদের চিনিয়ে দিচ্ছে, সুজার সঙ্গের লোকেরা ‘বোকনো-চোদা কাফেরের বাচ্চা!’ ‘বাছুর কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস, বের কর । বাছুর না পেলে সব ক’টাকে খাসি করে দেব!’ বলতে বলতে পেটে বুকে মুখে যে যেখানে পারল ছুরি চালাল ।

‘আমি কাফের না, আমি হিন্দু না’ বলে একজন সুজাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ল । পিঠে ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় ‘আমি মোছলমান, আমাকে মেরো না, হায় আল্লা!’ বলতে বলতে পাজামা খুলে তার ছুন্নত-চিহ্ন দেখাতে যাচ্ছিল, উল্টো দিক থেকে যাত্রা-ভাঙা গৃহমুখী মানুষের ভিড় এসে পড়ায় সুজার দল অন্ধকারে কলকাতার দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে রাখা তাদের গাড়িতে লাফিয়ে উঠে পড়ে বিদ্যুৎগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল ।

আগের দিন প্রাণভয়ে সুজার ফেলে পালিয়ে যাওয়া জীবিত, সুস্থ বাছুরগুলো একেকটা একেকজন ঘরে নিয়ে গিয়েছিল, যাত্রা ফেরত ভিড়ের মধ্যে তাদেরও বেশ কয়েকজনকে দেখা গেল, এদেরই তিনজন তিনটে মুমুর্ষু বাছুর কোলে করে নিয়ে গিয়ে বাড়িতেই হালাল করে সালোনও খেয়েছে । কালকের ঘটনার কথা বালিসোনার সকলেই শুনেছে, আজ আহতদের দেখে পরিস্থিতি বুঝতে কোনও সম্প্রদায়েরই সময় লাগল না ।

ভোর থেকে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ায় রুটি কারখানার কর্মীদের যারা মুসলমান তারা হিন্দুদের ভয়ে ডিউটি শেষ করেও রাস্তায় বেরতে সাহস পেল না, যারা হিন্দু তারা মুসলমানদের হাতে আক্রান্ত হবার ভয়ে বেরতে পারল না । কারখানার মধ্যে বহুদিনের ঘনিষ্ঠ দুই সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে মেশা ভরসাটুকু মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরে সাতাত্তর ঘন্টা জেগে ঝিমিয়ে কাটিয়ে দিল । এমনিতেই রাস্তায় বিশেষ লোক দেখা যাচ্ছে না । সকলেই আক্রান্ত হবার ভয়ে বাড়ির ছাদে, ঘরের পিছনে ভাঙা থান ইট, আধলা ইট জড়ো করেছে ।

তৃতীয় দিনে দাঙ্গা স্তিমিত হয়ে এলে পাউরুটির কারখানায় অম্বরীশ হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের কর্মীদের পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি করাতে লেগে গেল । লিওনের চাষ করা চিনির-তিনশোগুণ-বেশি মিষ্টি ছোট-ছোট গাছের পাতার রস ময়দায় মিশিয়ে তৈরি গরম গরম একপাউন্ড মিষ্টি পাউরুটি কোলাকুলির পর প্রত্যেককে একটা করে বিলোন হল ।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, তেমনই আচমকাই থেমে গেল । শিবকৃষ্ণর রোববারের সকালের পাঠশালা ও মঙ্গলবারের সান্ধ্য স্কুল বড় দোতলা বাড়িতে উঠে যাওয়ায় ছাত্রসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে পাউরুটির চাহিদাও বহুগুণ বেড়ে গেছে । এবারও বাড়তি কাজের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক নেওয়া হল । হিন্দু-মুসলমান ছাড়াও এবার খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কয়েকজনকে নেওয়া হয়েছে । কিছুদিন আগে পূর্ব পাকিস্তানের কক্সবাজার থেকে সাত ছেলে নিয়ে এক বিধবা এসে বাসা বেঁধেছে, ধর্মে এরা বৌদ্ধ, তাদের দুই ছেলেকে রুটি কারখানায় কাজ দেওয়া হয়েছে । এদের কক্সবাজারে নিজেদেরই রুটি কারখানা ছিল । খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের তিনজনও একই পরিবারের, বালিসোনার বহু প্রাচীন দারুশিল্পী বংশের । এক সময়ে এদের সূক্ষ্ম কাঠের কাজের খুব খ্যাতি ছিল, বাংলার বাইরেও যেত এদের গড়া সিংহাসন, দেওয়াল-তাক, রত্নালংকার রাখার হাতবাক্স, মৌরিদান । পরে সারা বাংলাব্যাপী হস্তশিল্প অবলুপ্তির যুগে এদের দারুশিল্পেও অভাবের বাতাস লাগে । সেই সময়ে পরিবারের কর্তা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেয় ও ছোট-বড় সকলের অন্ত্যজ হিন্দু পদবির সঙ্গে নতুন খ্রিস্টীয় নাম জুড়ে যায় ।

ভাড়া-করা বড় বড় দুধের ক্যান ভরা বালি-কাঁকর কাদামাটি ময়রাদের অ্যালুমিনিয়ামের ট্রেতে ঘন্টার পর ঘন্টা ঝাঁকিয়ে সোনার কুচি পাওয়া গেল মাত্র তিনজনের পাত্রে, মোট তিন আনা । দুদিন দুরাত ওই অসম্ভব সোনা-নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় ডুবে থেকে অম্বরীশ এর মধ্যে আর কারখানায় যাবার সময় পায়নি, পরদিন তাদের বিবাহবার্ষিকীর দিনে খুব সকালে উঠে কারখানায় ঢুকে দেখল সাদা দেওয়ালে হলুদবাটা দিয়ে কাঁচা হাতের বড় বড় হরফে লেখা-

হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ
ভাইয়ে ভাইয়ে আর নয় যুদ্ধ

নীচে ছোট হরফে লেখা ‘বালিসোনা পাউরুটি কারখানার কর্মীবৃন্দ ।’

কর্মীদের মধ্যে সম্প্রীতির বোধ কারখানার উৎপাদনে সুফল দিল । ফলে শিবকৃষ্ণর সাপ্তাহিক পাঠশালা ক্রমশ যখন সরকার অনুমোদিত সুষমা গার্লস হাই স্কুল হয়ে গেল, তখনও বাড়তি চাহিদা মতো পাউরুটি সরবরাহে কোনও সমস্যা হল না । বাজারেও এক ও অদ্বিতীয় ভেষজ মিষ্টিযুক্ত রুটির চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকলে প্রয়োজন মতো উৎপাদন বাড়ানো হল ।

শিবকৃষ্ণ লক্ষ্মী ও লিওনের সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসে । পারমিতা ও তার ছেলের সঙ্গে কথা বলে শান্তি পায় । অম্বরীশের সঙ্গেও তার শুধু ব্যবসায়িক সম্পর্ক নয়, বালিসোনার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুজনে শলা-পরামর্শ করে । মানুষকে ভিক্ষুক বানানো অপরাধ- এই যুক্তিতে পয়লা বৈশাখ থেকে এক পাউন্ড রুটির জন্য এক নয়া পয়সা দাম ধার্য করা হয়েছে, সেও অম্বরীশেরই উপদেশে । শিবকৃষ্ণ প্রায়ই আফশোস করে বলে, ‘দশ বছর আগে যদি আপনাদের সঙ্গে দেখা হত!’

একদিন হঠাৎ অম্বরীশকে বলল, ‘আপনার এই ছেলে একদিন বালিসোনার মানুষের হৃদয় জয় করবে । ও যে আপনারই ঔরসজাত সন্তান সেকথা প্রথম যেদিন একসঙ্গে আপনারা তিনজন এসেছিলেন সেদিনই আমি বুঝেছি । ছেলেটি দুর্লভ মনের অধিকারী । আকাশমিব দুষ্পারম । আকাশের মতোই ওর মনেরও পার পাওয়া যায় না ।’

এর তিনদিন পর ‘আকাশই তো পাখিদের ওড়বার উপযুক্ত স্থান/সবারই হৃদয়ে আছে ঈশ্বরের প্রবেশ-প্রস্থান’ লিখে শিবকৃষ্ণ ঘুমের ওষুধের খালি শিশি দিয়ে কাগজটা চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল । খিচুড়ি ভোগ ও পাউরুটি বিতরণের ভার তার সাধনসঙ্গিনীকে ও স্কুলের দায়িত্ব লক্ষ্মী-লিওনকে দিয়ে আলাদা কাগজে তা পালনের জন্য ঐকান্তিক অনুরোধ জানিয়ে গেছে । সবার নীচে লেখা- যার নামে স্কুলের নাম তিনি যদি কখনও ফিরে আসেন, তাঁকে যেন এই হীরার নাকছাবি ও প্রতিমাসে ব্যাঙ্কের সুদের দুই শত টাকা দেওয়া হয় ।

দাঙ্গার কিছুদিনের মধ্যে লিওন-লক্ষ্মীর স্কুল তৈরির কাজে এই দ্বিতীয় বার বাধা পড়ল ।



১১

শরৎ-হেমন্তের ভোরে প্রায়ই যাকে শিউলি তুলতে দেখে চিনতে পারেনি, বৈশাখে তাকে বকুল কুড়োতে দেখে পরীক্ষিৎ তিকান বলে চিনতে পেরেছে । রোববারের পাঠাশালায় নিয়ম করে আসত । তখন দেখতে ছিল ঠিক একটা ডল পুতুলের মতো । পুতুলের মতোই, কথাও বলত না । নিজের ভালো নামটাও কখনও বলেনি । সকলের সব কথা শুনত খুব মন দিয়ে ।

বকুল কুড়োতে কুড়োতে মাঝেমাঝে মাথা তুললে কিংবা গাছের ডালে ফুল দেখতে থাকলে পরীক্ষিৎ দোতলার জানলা দিয়ে মেয়েটার মুখের গড়নে অনেক বদল লক্ষ করে । ফোলা ফোলা গোলাকার মুখের জায়গায় এখন সামান্য লম্বাটে গড়নের মধ্যে খুব অন্যরকম একটা মায়াময় শ্রী ফুটে আছে । অনেকদিনের অদর্শনে যাকে বহুদিন মনেই পড়েনি, বাবাকে ভারত-চিন যুদ্ধের সময় এক ভোররাতে পুলিশ এসে তুলে নিয়ে যাওয়ায় তিন রবিবার পর প্রথম পাঠশালায় এসে যার ফুঁপিয়ে ওঠা পরবর্তীকালে পরীক্ষিতের বেশ কয়েকটা কবিতায় নানা চিত্রকল্পে ফুটে উঠেছে, প্রতিবছর অঘ্রাণের গোধূলিতে রাসমাঠে পরীক্ষিতের বুকসমান ভেসে থাকা ধোঁয়াশায় দুঃখের গন্ধ পাওয়ার কথা তখনও যাকে বলা হয়নি, সেই তিকানকে বৈশাখের ভোরে জানলা দিয়ে সে নতুন চোখে দেখল । বকুলবেদি থেকে অনেকটা তফাতে ভুবনমোহনের কবরে শিউলি গাছের পাশে এই বকুল গাছ পরীক্ষিৎ নিজেই তার রাঙাজ্যাঠাইমার সঙ্গে লাগিয়েছিল ।

কবর পার হয়ে ডানদিকে অল্প এগোলে আগের আমলে রাসপূর্ণিমার সময় যে-দিঘিতে জোড়া নৌকোয় একমাসব্যাপী খেমটা নাচের আসর বসত, যে দিঘির জলে, এই সেদিনও, বর্ষাকালে কাগজের নৌকো ভাসানো হত, এখন সেখানে প্রদীপ ও পরীক্ষিতের যৌথ উদ্যোগে বসানো নিমচারার সারি বড় হয়ে জায়গাটাকে এতটা সুন্দর করে তুলেছে সেটাও তিকানকে দীঘির পাড় ধরে ধীরে ধীরে হেঁটে ফিরে যেতে দেখে পরীক্ষিৎ আজই ঠিকমতো আবিষ্কার করল ।

একদিন ফুল তুলে এপথেই তিকানের ফিরে যাবার সময় পরীক্ষিৎ নেমে এসে কয়েকটা পাকা নিমফল তুলে তিকানের হাতে দিয়ে বলল, 'তোমার ছোটবেলার পুতুলের মতো গোলগাল মুখ এখন এই নিমফলের মতো একটু লম্বাটে হয়ে তোমাকে আরও সুন্দর দেখায় ।'

তিকান মনে মনে অনেকদিন পরীক্ষিতের সঙ্গে অনেক কথা বলেছে, দীর্ঘ অদর্শনের পর আজ মুখে বলল, 'তোমার কাছে আমি তো নিমের মতোই তেতো ।'

'নিমফুলের মধু কিন্তু খুব মিষ্টি । মোহন মউলেকে জিজ্ঞেস করো-' এরপর অনেকক্ষণ তারা আর কথা খুঁজে পায়নি ।

কিছুদিন ধরেই তরুণ বিপ্লবীদের অদৃশ্য উপস্থিতি জানান দিচ্ছিল । বালিসোনার দেওয়াল অদ্ভুত সব পোস্টারে ছেয়ে গেছে । এর মধ্যেই একদিন বালিসোনা হাইস্কুল মাত্র চার মাস পর শতবর্ষে পা দেবার সব প্রস্তুতি বৃথা করে দিয়ে এই অঞ্চলে প্রথম বিপ্লবী তরুণদের হিংসার বলি হল । হাতে হাতে বালতিতে ড্রামে পুকুরের জল ঢেলে তীব্র ধোঁয়া ও দাউ দাউ আগুন আয়ত্তে আনার আগেই অর্ধেক স্কুল বাড়ি পুড়ে ছাই । দূর গাঁয়ের বেশ কয়েকটি মেটেবাড়ির অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক রাতেই আগুন লাগানো হল । সারা দিন নানা জায়গা থেকে নানা গুজব আসে । বালিসোনা থেকে আরও দক্ষিণের যাত্রীদের কাছে শোনা গেল বঙ্কিম-বিদ্যেসাগরের মূর্তির নাকি মাথা ভেঙে দেওয়া হয়েছে । ওই কামরার এক স্কুলশিক্ষক শুধরে দিয়ে বললেন, বিদ্যাসাগর নয়, মাইকেল মধুসূদন দত্তের মুণ্ডু উড়িয়ে দিয়েছে । উৎসাহে উত্তেজনায় উপস্থিত অধিকাংশ নিরক্ষর যাত্রীদের তিনি শোনাতে লাগলেন, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ওখানকার একই আদালতে একবার মুখোমুখি হয়েছিলেন । ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমের এজলাসে বাদী পক্ষের উকিল ছিলেন মধুসূদন । পরে তাদের দুজনের প্রস্তরমূর্তি রাস্তার ধারে অশথগাছের ছায়ায় পাশাপাশি বসানো হয় । বলতে বলতে আবেগে তরুণ শিক্ষকের গলা কাঁপে, ঠোঁট বেঁকে যায় ।

ভুল করে বলা বিদ্যাসাগরের মুণ্ডচ্ছেদ পরদিন যেন ভবিষ্যদ্বাণীর মতো ফলে গেল । কলকাতায় কলেজ স্কোয়্যারে বিদ্যাসাগরের মূর্তির মাথা তরুণ বিপ্লবীরা ভেঙে দিয়েছে ।

রাতের অন্ধকারে বঙ্কিম-মাইকেল-বিদ্যাসাগরের মুণ্ডছেদের ঘটনায় বালিসোনার বয়োবৃদ্ধ অনেকেই বাড়িতে উপোস করেছেন । অনেক শিক্ষকের ঘরেই ছিল অরন্ধন । সরোজিনী সারা দিন পরীক্ষিৎকে তিনজনের সৃষ্টি নিয়ে এলোমেলো নানা কথা বলে গেল ।

লক্ষ্মী-লিওনের স্বপ্নের শিক্ষালয় অনেক দূর এগিয়েও তৃতীয় বারের মতো থমকে গেল ।

তিনক্রোশ দূরের গাঁয়ে ফুটবল ম্যাচ খেলে ঘরে ফিরছিল এগারজন, সন্ধে নামার মুখে সাতজন যে যার ঘরে চলে গেছে, বাকি চারজন একই পাড়ার, তিন-দুই গোলে হারার

জন্য পরস্পরকে প্রথমে উত্তেজিত দোষারোপ ও পরে তারই পরিণামে হঠাৎই আক্রমণাত্মক হয়ে তাড়া করতে করতে অন্ধকারে দৌড়োচ্ছিল, বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা একটা পুলিশের জিপ তাদের সামনে জোরে ব্রেক কষল । চারজন আর্মড পুলিশ লাফিয়ে নেমে চার ছেলের বুকে রাইফেল ঠেকিয়ে প্রত্যেককে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে জিপে তুলল । নিদারুণ ভয়ে একজন বলে উঠল, 'আমরা নকশাল না ।' সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন একেবারে শুকনো গলায় কোনওক্রমে বলল, 'আমরা জয়ন্তীপুরে বাঘাযতীন মাঠে বল খেলতে গিসলাম ।' একজন গালে প্রচণ্ড এক চড় ও আরেকজন মুখে ঘুঁষি খেয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল । বাকি দুজন নিজেদের অজান্তে সেই আর্তকান্নায় গলা মেলায় ।

সেদিন ভোররাতে বাদা ও তার পার্শ্ববর্তী রেললাইনের ওপারে, জঙ্গল চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে অষ্টাদশ শতাব্দীর জরাজীর্ণ শিবমন্দিরের আধমাইল দূর থেকে গুলির লড়াই চালিয়ে পুলিশ জটাজুটধারী সাধক পুজারীকে তার তিনজন শিষ্যসহ গ্রেপ্তার করল । পুজারীর আরও চার সাগরেদ বুকে মাথায় গুলি খেয়ে কাছেই পড়ে আছে । দুজন পুলিশ ও একজন ইনফর্মারের শব খুঁজতে খুঁজতে পুলিশের হাতে আরও একটি পচাগলা মৃতদেহ উঠে এল । শবের মাথায়-মুখে লম্বা জটা ও পা পর্যন্ত লুটনো দাড়ি দেখে বোঝা গেল সে-ই আসল পুজারী । পুলিশ যে জটাজুটধারীকে বিপ্লবীদের আশ্রয়দাতা হিসেবে হাতে পেয়েছে সে আসলে বিপ্লবী দলের প্রথম সারির এক নেতা, শিবসাধক পুজারীর ছদ্মবেশে এখান থেকে গোপনে দলকে সংগঠিত করছে । রাইফেলের মুখে হাতে-পায়ে বেড়ি পরিয়ে হ্যাঁচকা টানে তার চুল-দাড়ি খুলে নেওয়া হল ।

ভালো করে সকাল হবার আগেই পুলিশের কনস্টেবল, এস-আই, ও-সি, সার্কেল ইনস্পেক্টরদের নামের সঙ্গে লাল কালিতে আরও কয়েকজনের নাম লেখা 'মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের তালিকা'য় বালিসোনার বিভিন্ন দেওয়াল ছেয়ে গেল ।

বালিসোনার মাথায় মধ্যাহ্ন সূর্য পৌঁছনোর আগে সারি সারি বাইরের পুলিশের গাড়িতে বাসরাস্তা ভীতিপ্রদ হয়ে উঠল । মূল রাস্তা ছাড়াও বিভিন্ন শাখাপথ জিপের ধুলোয় একটু পর পরই ঢাকা পড়ে যায় । পোস্টারের ছিন্নভিন্ন দু-চার টুকরো ছাড়া বালিসোনার দেওয়ালে তখনকার মতো আর কোনও বিপ্লবের চিহ্ন রইল না । ভোর পর্যন্ত নানা দিকে চিরুনি তল্লাসি চালিয়ে পানের বরজ থেকে তিনজন ও গ্রামের শেষ প্রান্তে বেশ্যাপল্লি থেকে দুজন বিপ্লবীকে জীবিত ধরা হল, পুলিশের একজন ধরে মোট সাতটি মৃত বা মুমূর্ষু দেহেরও দখল নিতে হল পুলিশকে ।

পরীক্ষিৎ সন্ধেবেলা লক্ষ্মী-লিওনদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে রাঙা-জ্যাঠাইমাকে সারি সারি পুলিশের গাড়ির খবর শোনাবার জন্য প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে আসছিল, তাকে ধরে সোজা থানার লক-আপে পুরে দেওয়া হল । নিদ্দার মুখে এই খবর পেয়ে সরোজিনী মিতা অম্বরীশ একসঙ্গে থানায় পৌঁছয় । একটু পরেই আসে লিওন ও লক্ষ্মী ।

পুলিশ-হেডকোয়ার্টার থেকে অতি উচ্চপদস্থ যে অফিসার থানার অ্যাডিশনাল ও-সি সহ সকলের ওপর কর্তৃত্ব করছেন, তিনিই অম্বরীশদের সঙ্গে প্রাক্তন ভারতসুন্দরী সহ তিন সম্ভ্রান্ত মহিলা থাকা সত্ত্বেও, পরীক্ষিতকে সম্পূর্ণ ভুল করে থানায় ধরে আনার অভিযোগ কানেই নিচ্ছেন না, শেষ পর্যন্ত তাকে নিরস্ত করতে সেই মুহূর্তে থানায় আসা বিস্মিত ও-সি জগদীন্দ্র গোস্বামী এগিয়ে এল । ক্রুদ্ধ লক্ষ্মী অফিসারের টেবিলে ঝুঁকে সেইসময় বলছে, ‘এখানকার গ্রামীণ হাসপাতাল যাঁর নামে, ইনি সেই সরোজিনী, আমার মা । পরীক্ষিৎ আমার ভাই । এরপর তো চৌধুরীবাড়ি থেকেই মিথ্যে সন্দেহে যাকে খুশি তুলে আনবেন!’

অম্বরীশের চোখে আগুন । জোর করে সে নিজেকে সংবরণ করে আছে ।

শেষ পর্যন্ত বহিরাগত অফিসার উঠে দাঁড়িয়ে বার বার অম্বরীশদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন । পরীক্ষিতের দু-হাত নিজের দু-হাতে ধরে পুলিশের এই ক্ষমার অযোগ্য অপরাধের জন্য তার কাছে আলাদা করে ক্ষমা চাইলেন ।

চোরাগোপ্তা হানায় পুলিশের বন্দুক ছিনতাইয়ের খবর প্রথম প্রথম বালিসোনার অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করতে চায়নি । একসময় ঋণজর্জর চাষিদের বা দাদনে বাঁধা তাঁতিদের মহাজন, উচ্চ হারে সুদের কারবারি, মোটা ফিয়ের ডাক্তার- এরকম নানা পেশার ধনীদের সঙ্গে নিরীহ গরিব মানুষের লাশও নির্জন মাঠে ঘাটে পড়ে থাকা বালিসোনার রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়াল । পুলিশি হানাও বাড়ল বহুগুণ । রাতে বুটের লাথি বা বন্দুকের গুঁতোয় ঘুম থেকে তুলে থানায় বা আর কোথাও নিয়ে যাওয়া কিংবা আকস্মিক কড়া নেড়ে বা দরজা ভেঙে যখন-তখন যে কারও ঘরে ঢুকে পড়া আর অস্বাভাবিক ঘটনা বলে ধরা হয় না । এর মধ্যেই গাঁজা আফিংয়ের দোকান, দিশি মদের দোকান, বিলাতী মদের দোকান রোজই দুটো একটা আগুন লেগে জ্বলতে দেখা গেল ।

বিপ্লবীদের বার্তা-বিনিময়ের প্রধানকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল সব সন্দেহের ঊর্ধে থাকা সুষমা বালিকা বিদ্যালয় । পাউরুটি বিতরণের সময় আগে থেকেই রুটির প্যাকেট ব্লেড দিয়ে সামান্য কেটে তার মধ্যে জরুরি নির্দেশ ঢুকিয়ে নিজেদের দলের ছেলেদের আসার দিকে নজর রাখে রুটি বিতরণের দায়িত্বে নতুন নিযুক্ত দুই যুবক । এরা বিপ্লবী দলের । বিতরণের কাজে বিপ্লবী দলের দুজনের নিয়োগ ও রুটির প্যাকেটে চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা- দুটোতেই সরোজিনীর হাত আছে বলে অম্বরীশের সন্দেহ । বিপ্লবী দলের কয়েকজনকে সরোজিনী চেনে, বালিসোনা থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে কলেজে পড়ে, লেখাপড়ায় খুবই ভালো, কলেজ ম্যাগাজিনে তাদের কারও কারও গল্প কবিতা তারাই তাকে এর আগে পড়িয়েছে, পুলিশের ভয়ে এখন পালা করে তারা মাঝে মাঝে চৌধুরীবাড়ির অন্য সকলের চোখ এড়িয়ে সরোজিনীর নিরাপদ আশ্রয়ে লুকোয় । তাদের উদ্দেশ্য বা গতিবিধি বিষয়ে তারা একটি শব্দও বলে না । শুধু পরীক্ষিৎকে সাবধান করে দেয়- সে যেন তাদের কথা কাউকেই কখনও না বলে ।

দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে বড় শহরের কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে কয়েকজন সাংবাদিককেও গ্রেপ্তার করা হল । বালিসোনার রাস্তায় পুলিশি টহলও বাড়ল । দোকানে বাজারে অফিসে নিয়মশৃঙ্খলা এখন চোখে পড়ার মতো । ট্রেন লেট বা যখন-তখন ট্রেন বাতিলের ঘটনা বন্ধ হল । ব্যাঙ্কে, পোস্ট অফিসে ঘড়ির কাঁটা ধরে কর্মচারীদের হাজিরায় অনভ্যস্ত বালিসোনাবাসী অবাক । মুদির দোকান, মনোহারী দোকান, ওষুধের দোকানে রোজকার স্টক লিখে টাঙিয়ে রাখা বাধ্যতামূলক করা হল । মিষ্টির দোকান ও রেস্টোর্যান্টে সেদিনকার খাবারের নাম ও দামের তালিকায় অক্রেতা পথচারীও দাঁড়িয়ে পড়ে বেশ খানিকক্ষণ চোখ বোলায় । যাদের ছেলেরা পুলিশের গাড়িতে গ্রামছাড়া, তাদের অধিকাংশেরই আর খোঁজ পাওয়া গেল না ।

দুবছর পর ভোটে ক্ষমতাসীন দলকে নির্মূল করে বিরোধী দলগুলোর ফ্রন্ট রাজ্যের শাসনক্ষমতা দখল করে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিচ্ছে শুনে বালিসোনার অদৃশ্য ছেলেদের বৃদ্ধ মা-বাবা, কারও দাদা বা দিদি, কারও বউ বা বৌদি রোজই স্টেশনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে । কেউ কেউ ফিরলেও অনেকেরই আর দেখা মিলল না । শুধু মাঝে মাঝে অজ্ঞাত-পরিচয় কংকালস্তূপ আবিষ্কারের খবর শোনা যায় ।

নতুন সরকারের নানা আন্তরিক উদ্যোগ দেখে গ্রামের মানুষ নতুন আশায় বুক বাঁধে ।

বিদ্যুৎ, রেললাইনের বৈদ্যুতিকরণ, টেলিফোন-সংযোগ ও সড়ক সম্প্রসারণের আকর্ষণে বেশ কিছুকাল ধরে বাইরে থেকে লোক এসে বালিসোনায় জায়গা জমি কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে, সরকারের বিভিন্ন কল্যাণকর কর্মসূচির প্রয়োজনে কলকাতার ট্রেনের একেকটা কামরা বালিসোনা স্টেশনে এসে খালি হয়ে যায় । শনি-রবি কি জাতীয় ছুটির দিনে এত লোক জমি দেখতে আসে যে জমির দালালদের নাওয়া-খাওয়ার ফুরসৎ থাকে না । চায়ের দোকান, সেলুন, চাঁদসীর ডাক্তারখানার সামনে গাছের গুঁড়িতে, টিনে, দরমার বেড়ায় আলকাতরায় ''সস্তায় জমি বাড়ি ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান''-এর বিজ্ঞপ্তি লাগিয়ে তারা খদ্দের ধরে । বালিসোনার আমবাগান, পেয়ারা বাগান, লিচুবাগান, গোলাপজাম বাগান কেটে ছোট ছোট প্লটে বাড়ি উঠতে লাগল । অনেক চাষের খেত ঘর-বাড়িতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল । কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল নতুন প্রজন্মের যুবসম্প্রদায়ের ভিড়ে বালিসোনার দোকান, বার, রেস্টোর্যান্ট, দিশি ও বিলাতি মদের দোকান, চায়ের দোকান, টিউটোরিয়াল হোম অনেক রাত অব্দি ভরে থাকে । বাড়ি তৈরির সরঞ্জাম ও হার্ডওয়্যারের দোকানে বৃদ্ধ ও মাঝবয়েসিদের ভিড়ও দিন দিন বেড়েই চলেছে । এই সময় থেকে বালিসোনায় বাংলা বাক্যের গড়ন, শব্দের অর্থ ও ব্যঞ্জনা ক্রমশ বদলাতে লাগল, বহিরাগত হিন্দি-ইংরিজি শব্দের অনুপ্রবেশে একরকমের মিশ্রভাষাও তৈরি হল ।

পরীক্ষিৎ পরে খবরের কাগজে তার নিয়মিত কলাম 'বিষাদগাথা'য় বিষয়টি উল্লেখ করে লিখেছিল, 'কথার প্রাণ, প্রবাদ, নতুন শব্দ জন্মায় গ্রামীণ জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে,

ভাষার ভ্রষ্টাচার ঘটে শহুরে প্রভাবে । ক্ষয়িষ্ণু মানবিকতা আর সেই ছিদ্রপথে ভোগসর্বস্ব জীবনের নিত্য হাতছানি তার আঁতুরঘর ।’



১২

অ. রীশ মাটির নীচে পাঁচ-ইঞ্চি সোনার দুর্গামূর্তি পাবার পর থেকে দ্বিগুণ উৎসাহে মাটি খোঁড়ার কাজ চালিয়ে যায় । এক জায়গায় একটা ঘাটের ভগ্নাবশেষের মধ্যে এবড়োখেবড়ো চৌকো অমসৃণ একটা পাতলা স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কার করে তার মন নতুন স্বপ্নে মেতে উঠল । শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে সে কিছুটা ব্যবধানে আরও দুটো নলকূপ বসিয়েছে । তিনটি নলকূপেই সপ্তাহে একদিন কর্পূর ফেলার ব্যবস্থা করে জল অনেকটাই নির্দোষ করা গেছে ।

পুরো পাঁচ ইঞ্চি স্বর্ণদুর্গা পাওয়ার দু'মাসের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা মেলার দুদিন পরেই প্রত্যেককে বাড়তি আধ পাউন্ডের দুখানা করে মিষ্টি পাউরুটি সে নিজের হাতে বিলি করছিল, এমন সময় পর-পর ছত্রিশটা মোটরসাইকেল বাসরাস্তা থেকে প্রায় উড়ে এসে বাদায় অম্বরীশের সামনে পড়তে লাগল । যারা ইতিমধ্যে রুটি পেয়ে খেতে শুরু করেছে, এবং যারা লাইন দিয়ে অম্বরীশের হাত থেকে রুটি নিচ্ছে, বাইকবাহিনী দেখে সকলেরই মুখ শুকিয়ে গেছে । বাইকবাহিনীর প্রত্যেকের গলায় স্কার্ফের মতো লাল রুমাল গিঁট দিয়ে বুক অব্দি ঝোলানো । এদের একজন বাইকটা ঠেলে চুইংগাম চিবোতে চিবোতে অম্বরীশের কাছে এসে বলল, 'এসব বন্ধ করতে হবে ।'

অম্বরীশ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, 'কে হে, তোমরা?'

'দুশশালা! আমার তো বীচিসুদ্দু জ্বলে উঠছে রে!' ঘাড় সামান্য ঘুরিয়ে নিজেদের বাহিনীর উদ্দেশে কথাটা বলতেই তার ঠিক পিছনের ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওলা যুবকটি বলল, 'এসব জলা-জমি বিক্রি হয়ে গেছে, এখানে টাউনশিপ হবে । দু-সপ্তাহের মধ্যে আপনার বাঁদরনাচ বন্ধ না হলে আমরাই আপনাকে নিয়ে বাঁদরনাচ নাচাব! কথাটা মনে রাখবেন ।'

গতকালই সন্ধের ট্রেনে অম্বরীশ জয়নগর-মজিলপুর স্টেশনে নেমে রিকশায় চড়ে খুঁজে খুঁজে প্রত্নতাত্ত্বিক কালিদাস দত্ত মশাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিল । পুরনো দোতলা বাড়ি । সিঁড়ি থেকেই নানা মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সাজানো । বালিসোনা অঞ্চলে তাঁর নিজের উদ্যোগে খননকার্য চালিয়ে যেসব দুর্লভ সামগ্রী পাওয়া গেছে, তা দিয়ে তিনি নিজেই

বাড়িতে এ-অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছেন। মুদ্রার আন্তর্জাতিক সচিত্র তালিকায় অম্বরীশের স্বর্ণমুদ্রা নেই দেখে দত্তমশাই রায় দিয়েছেন মুদ্রার ইতিহাসে এই মুদ্রা এখনও অনাবিষ্কৃত। মূল্যও তাই অপরিসীম। কথাটা জানার পর থেকে অম্বরীশ ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় ফুটছিল, যুবকের কথার এক অক্ষরও তার মাথায় ঢোকেনি। মোটরসাইকেলের ভিড়ে বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে বলল, 'এখানে এত মোটরসাইকেল কেন?'

'কাল সকাল আটটায় রুদ্র ঝম্পটির সঙ্গে দেখা করবেন।'

ছত্রিশ মোটরবাইকের মিছিল বাদাময় চক্কর দিয়ে বাদার আকাশ-বাতাস বাইকের গর্জনে কাঁপিয়ে ফিরে গেল।

অনেকদিন পর সেই রাতে আবার লাগোয়া বারান্দায় খটাখট আওয়াজ শুনল অম্বরীশ। একজন একজন করে সাত কংকাল ঘরে ঢোকা মাত্র সে ব্যস্ত হয়ে আগের আমলের বর্মাটিকের বেঞ্চে তাদের বসাল। সাত কংকাল বসে বসে শুধু পা নাচাতে লাগল, কেউ কোনও কথা বলল না। এই প্রথম এদের উপস্থিতিতে অম্বরীশ ভয় পেয়ে গেল। তাকে ভয় পেতে দেখে সাত কংকাল দুলে-দুলে সুর করে একসঙ্গে বলে উঠল-

কংকালে কংকাল আনে, নদী ভরে বাণে
সকলেই লোভে ভাসে, ভবিতব্য না জানে

তিনবার গাইবার পরই হঠাৎ একটা কংকাল অম্বরীশের বুকের ওপর এসে বসল। অন্যরা একে একে বেরিয়ে গেলেও কংকালটা একভাবে বসেই থাকে। সাহায্যের জন্য, একটু দম নেবার আশায় সে চিৎকার করতে লাগল কিন্তু সে বোঝে তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরচ্ছে না।

'এই! এই! কী হল তোমার? ফের বুকের ওপর হাত রেখে শুয়েছ?' অম্বরীশের গোঁগোঁ শুনে জেগে উঠে মিতা তার ঘুম ভাঙাল। 'বোবায় ধরা রোগ তো ছিল না তোমার। সারা দিন কী যে করে বেড়াচ্ছ জানি না।' বলে দুজনেই দুজনকে ছুঁয়ে থেকে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করে।

পরদিন গোধূলিতে রাসমাঠে হালকা ধোঁয়াশার চাদরের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে পরীক্ষিৎ তিকানকে থামায়।

'সেই গন্ধ! তুমি পাচ্ছ? অবিকল সেই দুঃখের গন্ধ।'

তিকান দুবার বড় শ্বাস নিয়ে হেসে ফেলে, 'এ তো ছাতিমফুলের গন্ধ। আগে এখানে একটা মাত্র গাছ ছিল, এখন তো দিঘির এ মাথায় রাঙা-জ্যাঠাইমার লাগানো চারা বড় হয়ে ছাতিমের বন হয়ে গেছে।'

পরীক্ষিৎ বিশ্বাস করতে পারে না যে সে ছোটবেলা থেকে ছাতিমফুলের গন্ধকেই দুঃখের গন্ধ ভেবে এসেছে। পৃথিবীতে এত মানুষের এত দুঃখ, দুঃখের কোনও গন্ধ নেই?

দুঃখের রংও নিশ্চয়ই আছে। ছোটবেলায় এখানে কোনও ছাতিমগাছ ছিল বলেও তো মনে পড়ে না।

হঠাৎ তিনটে মোটরবাইক বড়রাস্তা ছেড়ে রাসমাঠের প্রবেশপথে ভুবনমোহনের কবরের ওপর আস্তে ব্রেক কষে মাটিতে এক পায়ের ভর দিয়ে বাইক সামান্য কাৎ করে রেখে লম্বা চুলে দু'কান ঢাকা আরোহী বলল, 'প্রেম করছেন করুন, কিন্তু কাল বাবাকে বলবেন নিশ্চয়ই যেন ঝম্পটিদা'র সঙ্গে দেখা করে।'

'ঝম্পটিদা কে?'

'জোনাল কমিটির সেক্রেটারিকে এ চাঁদু চেনে না রে!' সঙ্গীকে কথাটা বলে পরীক্ষিতের দিকে ফিরে আবার বলল, 'না গেলে কিন্তু থানায় যেতে হবে। সেখানেই কথা হবে!'

তিনটে বাইকই মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবার পর তিকান সন্ত্রস্ত স্বরে বলল, 'এই গুণ্ডাগুলোকে তুমি চেনো না পরীক্ষিৎ, এরাই এখন বালিসোনার হত্তাকত্তা। পরপর চারবার শাসনক্ষমতা পেয়ে এরা এখন চাইলে হাতে মাথা কাটতে পারে। এদের আদেশই এখানে শেষ কথা। থানা-পুলিশ এদের কথায় ওঠে-বসে।'

পরীক্ষিত রাঙা-জ্যাঠাইমার সঙ্গে বালিসোনার পরিস্থিতি আলোচনা করে ঠিক করল খুব শিগগিরই তারা বালিসোনার সমভাবাপন্ন মানুষদের নিয়ে এইসব লাগাম ছাড়া অনাচার-অন্যায়ের প্রতিবাদে মিছিল বের করবে। সরোজিনী ছাড়াও লিওন-লক্ষ্মী, অম্বরীশ, মিতা, পরীক্ষিৎ, সেজো-জ্যাঠাইমা তো থাকবেনই, প্রদীপ, সরস্বতী-তাপসকেও ডাকা হবে। এমনকী হাইকোর্টের জাঁদরেল অ্যাডভোকেট মেজোজ্যাঠাকে লক্ষ্মী নিজে গিয়ে বোঝাবে, যদি আসতে পারেন। তার বাবাকেও যদি এইসময় পাওয়া যেত! তার তো কোনও উপায় নেই। আর সেজোজ্যাঠার তো এতে সমর্থনই নেই। সে নিজেই শাসক দলের বড় শরিকের ঘনিষ্ঠ, সামনের ইলেকশনে টিকিট পাবার আশায় নেতাদের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চলে।

অম্বরীশ সকালে বাদায় পৌঁছে দেখে বাদার বিরাট অংশ ঘিরে লাল পতাকার বেড়া। বাসরাস্তামুখী বড় সাইনবোর্ডে বড় বড় ছাপার হরফে লেখা- সাইট ফর সাউথ উইন্ড টাউনশিপ।

পরপর পাঁচবারের পৌরসভা-চেয়ারম্যান অম্বরীশ তখনই থানায় গিয়ে রুদ্র ঝম্পটি ও তার দলবলের নামে জোর করে পৌরসভার জমি দখলের চেষ্টার বিরুদ্ধে এফ-আই-আর করতে গেলে থানার ডিউটি অফিসারের নির্লিপ্ত উত্তর- বড়বাবু নেই, এখন এফ-আই-আর নেওয়া যাবে না।

'ডাকুন আপনার বড়বাবুকে, বলুন অম্বরীশ চৌধুরী ডাকছে। ভেরি আর্জেন্ট।'

থানার পিছনে কোয়ার্টার থেকে বড়বাবুকে আসতে দেখে অম্বরীশ গলা উঁচিয়ে বলল, 'আমি জানতে চাই এফ-আই-আর নেবার নির্দিষ্ট সময় কবে চালু হয়েছে? কে চালু

করেছে?'

চেয়ারে বসতে বসতে পুরো বৃত্তান্ত শোনার আগেই বড়বাবু বললেন, 'আপনি কোর্ট থেকে অর্ডার নিয়ে আসুন। কোর্টের অর্ডার ছাড়া আমরা কিছু করতে পারব না।'

'এফ-আই-আর নেবেন না কেন? তাহলে সেটা ইন রাইটিং দিন।'

বড়বাবুর চোখের ইঙ্গিত বুঝে ডিউটি অফিসার খাতা খুলে অম্বরীশের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করল। আগের দিন সদলবলে এসে তাকে শাসিয়ে যাওয়ার কথা লিখতে বলায় ডিউটি অফিসার লেখা থামিয়ে বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে থাকে। সবটা লিখিয়ে এফ-আই-আর নম্বর নিয়ে অম্বরীশ চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াতেই বড়বাবু সামনে ঝুঁকে এসে শান্ত স্বরে বললেন, 'একটা কথা বলব স্যার? ওদের সঙ্গে কি পারবেন? তার চেয়ে মোটা একটা টাকা নিয়ে মিটিয়ে নিন।'

'এ কি কোনও ভুল বোঝাবুঝি যে মিটিয়ে নেব? পুলিশের চেয়ারে বসে বেআইনি গুণ্ডাবাজির সমর্থন করছেন, আবার ঘুষ নিতে বলছেন?'

থানা থেকে বেরবার মুখে অম্বরীশ দেখল থানার গায়েই বটগাছের নীচে লাল মারুতি থেকে নামছে রুদ্র ঝম্পটি, সঙ্গে তার প্রধান দুই সাগরেদ, দুজনের একজনের ডান গালে ওপর থেকে নীচ অব্দি ফালা ফালা করে পুরনো কাটার দাগ ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে একটুও ঢাকা পড়েনি। সে চিনতে পেরেছে, কাল এ-ই তাকে বাঁদরনাচ নাচাবার শাসানি দিয়েছিল।

বাদায় যখন ফিরে এল তখন যুদ্ধক্ষেত্রে একপেশে আক্রমণ সবে বন্ধ হয়েছে, গাঁইতি-কোদাল-শাবল নিয়ে বা ফেলে রেখে তার লোকেরা যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। হাতে একটা মেশিনগানের অভাব বিদ্যুতের মতো অম্বরীশের মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে গেল। কনুই থেকে হাত উড়ে-যাওয়া একজন ও মাথা-কপাল ফাটা আরেকজনকে ধরাধরি করে কাছেই ডিসপেন্সারিতে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক ব্যান্ডেজ করিয়ে অন্যান্য কয়েকজন আহতকে সঙ্গে আসতে বলে অম্বরীশ সোজা এস-ডি-ও-র ঘরে ঢুকে পড়ল।

এস-ডি-ও ব্যস্তভাবে টেলিফোনে থানার ও-সিকে ফোর্স নিয়ে বাদায় গিয়ে কালপ্রিটদের গ্রেপ্তারের আদেশ দিল ও ওখানকার লাল পতাকাগুলো তুলে থানায় জমা করতে বলল। একটু পরেই আবার ফোন করল- 'মোট ন'জন সিরিয়াসলি ইনজিওর্ড। বালিসোনা গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠাচ্ছি, আজই প্রত্যেকের জবানবন্দি নেবেন।'

সন্ধেবেলা বালিসোনার চারবারের এম-এল-এ মনোরঞ্জন ভঞ্জ একদল ছেলে সঙ্গে নিয়ে এস-ডি-ও-র বাংলোয় এল। সামনের সোফায় বসে বলল, 'পুলিশ বেছে বেছে আমাদের দলের ছেলেদের তুলে এনেছে কেন আমি জানতে চাই।'

মাত্র দুবছর আগের ব্যাচের তরুণ আই এ এস অফিসার কঠিন স্বরে বলল, 'আমি তো দল চিনি না, স্যার।'

এফ-আই-আর-এ নাম আছে, হাইকোর্টে মেজদা যতীন্দ্রমোহনের উদ্যোগে অ্যান্টিসিপেটরি বেল না-মঞ্জুর হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও রুদ্র ঝম্পটি ও আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হল না । আদালত বার বার পুলিশকে আসামীদের গ্রেপ্তার করে এজলাসে হাজির করার আদেশ দিলে পুলিশ প্রত্যেক বার একই রিপোর্ট পেশ করে- 'দে আর অ্যাবস্কন্ডিং ।'

লক্ষ্মীদের বাড়িতে সামনে পিছনে পাশে সেই আদিগন্ত ধানখেতের জায়গায় এলোমেলোভাবে বাড়ি উঠে গেছে । সামনের দীর্ঘ খোলা অংশটা এখন রাস্তা, বড় রাস্তা থেকে সোজা লক্ষ্মীদের বাড়ির পাশ দিয়ে আরও উত্তরে চলে গেছে । সে-রাস্তার ধারেও শীত-গ্রীষ্ম-বসন্তে নতুন নতুন চায়ের দোকান, মুদির দোকান, তেলেভাজার দোকান, মাংসের ঘুগনি ও মোগলাই পরোটার দোকান দেখা যায় ।

সকাল আটটায় চারটে মোটরবাইক এসে লক্ষ্মীদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল । দরজার ঘন্টি শুনে লিওন দরজা খুলে দুজনকে চিনতে পারল, কিছুদিন আগে যে বাইকবাহিনী তাদের শিক্ষালয়ে গিয়ে দশ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছিল, এই দুজন সেই দলের ।

'নমস্কার । আমরা একটু দিদির সঙ্গে কথা বলতে এসেছি ।'

'ভেতরে এসে বসুন । হয়তো একটু অপেক্ষা করতে হবে ।'

'নো প্রবলেম । আপনি দিদিকে খবর দিন ।'

লক্ষ্মী ঘরে এলে চারজনই উঠে দাঁড়িয়ে তাকে নমস্কার করল । এদের মধ্যে বোধহয় নেতাস্থানীয় একজন বলল, 'আমরা সরস্বতীর পুজোর পরদিন সন্ধেবেলা 'বালিসোনা ফেসটিভ্যাল' করার পরিকল্পনা করেছি । আপনি এক্স মিস ইন্ডিয়া, আপনাকে না পেলে উৎসব হবেই না । কলকাতা থেকে মৌপিয়া সেন, কুমার সুনিশ্চিত, চিররঞ্জন আসবে । সারা বালিসোনা অঞ্চলের যেখানে যত ট্যালেন্ট আছে, সবাই এসে নাচ গান আবৃত্তি করবে । যাদুর খেলাও হবে । রাসমাঠে বিরাট প্যান্ডেল হবে । ডি এম, এস-ডি-ও, এস পি, ডি এস পি সব আসবে । আপনাদের হাসপাতালের সব ডাক্তারদের নেমন্তন্ন করা হবে । সব ইস্কুলের শিক্ষক, প্রধান শিক্ষকদেরও ডাকা হবে, তাঁদের বাছা বাছা ছাত্র-ছাত্রীরা তো নাচ গান আবৃত্তি করবে ।'

সরস্বতী পুজো যত এগিয়ে আসে, রাস্তায় তত বাস লরি গাড়ির অনড় সারি দীর্ঘ হয় । গাড়ি থামিয়ে সদলবলে স্বরস্বতী পুজোর চাঁদা আদায় চলে । কেউ কেউ প্রথমে দাবি মতো টাকা দিতে না চাইলে কিল চড় ঘুষি লাথি খেয়ে পুরো টাকাই দিয়ে দেয় । শুধু রাস্তায়ই নয়, পাড়ায়ও চাঁদার জুলুমের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাবার সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পুলিশকে অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশের নিস্পৃহ পরামর্শ, 'দাবি মতো চাঁদা দিয়ে মিটিয়ে নিলেই তো পারেন ।' চেয়ারে হেলান দিয়ে আড়াআড়ি পা নাচাতে নাচাতে একবার এক ডিউটি অফিসার আরও যোগ করে- 'ক'টাকে ধরে লক-আপে পুরব বলুন

তো? আর পুরলেও এযাত্রা আপনি বেঁচে যাবেন কিন্তু আপনার বউ-মেয়েকে সারা বছর তো আর রাস্তায় ঘাটে পুলিশ এসকর্ট দেওয়া সম্ভব না ।'

সরস্বতী পুজোর দিন সকালে সরোজিনী, লক্ষ্মী, লিওন, পরীক্ষিতের উদ্যোগে বালিসোনার চাষি-তাঁতি কামার-কুমোর, মিস্ত্রি-মজুর, গয়লা, ঘরামিদের বাড়ি থেকে ছেলে মেয়ে ধরে এনে পুজো মণ্ডপে বাগদেবীর সামনে হাতেখড়ি দেওয়া হল । সংখ্যায় ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বেশি ।

অনেকের বাবারই প্রশ্ন, লেখাপড়া শিখে কী লাভটা হবে?

'লেখাপড়া না শিখলে কাকে কীভাবে ভোট দিতে হয় জানবে কী করে? গণতন্ত্রে তোমরাই তো ভোট দিয়ে সরকার গঠন করবে!'

তাদের কথায় জানা গেল কী করে ভোট দিতে হয় তারা জানে না । ভোট দেবার বয়েসে পৌঁছে গত চার-পাঁচ বারের নির্বাচনে একবারও তারা বুথে গিয়ে ভোট দেয়নি ।

পরীক্ষিৎ অবাক, 'সে কী! কেন?'

'ভোটের ছেলেরা বাইক চড়ে সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে বলে যায়, তোমাদের যেতি হবেনি, তোমাদের ভোট দেওয়া হয়ে গেছে ।'

সন্ধের আগেই গোটা রাসমাঠ ভরে গেল । ভুবনমোহনের শেষ ইচ্ছা পূরণ করে শিউলি-চাঁপা কবরস্থান মাড়িয়ে শয়ে শয়ে মানুষ সারা মাঠ জুড়ে চট কাপড় কাগজ বিছিয়ে বসে পড়তে লাগল ।

মাঝে মাঝেই 'মাইক টেস্টিং ওয়ান টু থ্রি' আর বিশ্ববিখ্যাত নায়িকা মৌপিয়া সেন, বিশ্ববিখ্যাত গায়ক কুমার সুনিশ্চিত, বিশ্ববিখ্যাত নায়ক চিররঞ্জনের আগমন বার্তার কানফাটানো ঘোষণা শোনা যাচ্ছে ।

বালিসোনা সার্কিট হাউসে হঠাৎ মন্ত্রী আসায় ডি-এম, এস-ডি-ও কেউই উৎসবে আসেননি । লক্ষ্মী মঞ্চে প্রদীপ জ্বালিয়ে বালিসোনা উৎসবের উদ্বোধন করার পরই ভিড় ঠেলে এম-এল-এ মনোরঞ্জন ভঞ্জ মঞ্চে উঠে এই অঞ্চলের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সাংস্কৃতিক বিনোদনের দিকেও তাদের সরকারের নজর আছে জানিয়ে দীর্ঘ ভাষণ দিলেন । তারপরই রুদ্র ঝম্পটিকে মঞ্চে উঠে আসতে দেখে লক্ষ্মী তার আসন ছেড়ে নীচে নেমে তিন সারি চেয়ারের প্রথম সারিতে মায়ের পাশে এসে বসল ।

রাতে অম্বরীশের দূরের দৃষ্টি ক্রমশ কমে আসতে থাকায় ভাষণরত ঝম্পটির চেহারা স্পষ্ট না চিনলেও গলার আওয়াজ শুনে লিওনকে জিজ্ঞেস করল, 'সেই অ্যাবস্কন্ডিং ঝম্পটি না?'

'তোমার অনুমান সত্য । পুলিশ ইনস্পেক্টরও এখানেই আছে, তবু গ্রেপ্তার করছে না ।'

মৌপিয়া সেন, কুমার সুনিশ্চিত, চিররঞ্জনের আসতে দেরি হবে শুনেও তাদেরই আকর্ষণে লোক আসছে । একসময়ে রাসমাঠ ছাড়িয়ে দিঘির ওপার, অনেক দূর পর্যন্ত

বাসরাস্তার দুধার লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠল, লোক আসার তবু বিরাম নেই ।

সরোজিনী লক্ষ্মী মিতা পরীক্ষিৎ অম্বরীশ লিওন চলে যাবার পর রাত ন'টা নাগাদ ভিড়ের মধ্যে চিৎকার চেঁচামেচি মারামারি শুরু হয়ে গেল । একদল মাতাল ভিড়ের মধ্যে ঢুকে মেয়েদের সঙ্গে নাচতে চেয়ে তাদের হাত ধরে টানাটানি করায় গোলমালের সূত্রপাত । অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা ছুরি, পাঞ্চ, পাইপগান, ওয়ান শটার, রিভলবারে ভয়াবহ আকার নিল । মাতালদের হাত থেকে নিজের শালীকে বাঁচাতে গিয়ে কপালে গুলি খেয়ে নিরঞ্জন বসাক রাসমাঠেই মারা গেল । আহত হল অনেকেই । মাঠ জনশূন্য হবার পর চারদিকে চটি, গায়ের চাদর, চশমা, ঘড়ি, ভাঙা কাচের চুড়ি, ধুলো-কাদামাখা চুরনি, ছাপা শাড়ি, ছেড়া ব্লাউজ, কামিজের টুকরো পড়ে থাকতে দেখা গেল । নিরঞ্জনের বুকে মাথা ঠুকতে ঠুকতে তার শালী তখনও আর্তস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে- 'তাঁতে নতুন নকশা চড়িয়ে গ্রামের বাইরে যেতে নেই জানতেন না? তবে কেন এলেন? কেন এলেন? আমায় নিয়ে কেন এলেন?' শেষ কথাগুলো মাথা ঠোকার তালে তালে বলেই চলেছে ।



১৩

আশ্বিনেও আকাশ মেঘলা । মাঝে মাঝেই ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টিপাত । টানা ন'দিন এরকম চলার পর হঠাৎই এক শনিবার সকালে বালিসোনার সারা আকাশ টকটকে নীল হয়ে উঠল । দুর্যোগের দিনগুলোয় বাড়ির ছাদে বাইরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে মহড়া বন্ধ রাখতে হয়েছে লক্ষ্মী-সরোজিনীকে । সেই ক'টা দিন ভেতরের দালানে নিজেদের পরিবারের সদস্যদের মহড়া যথাসাধ্য চালু রাখা হয়েছে ।

লখনউ থেকে সরস্বতী এসেছে, একাই । সঙ্গে বড় বড় দুটো সুটকেস । দিল্লি থেকে প্রদীপ এসেছে লম্বা ছুটি নিয়ে । মেজো জ্যাঠাইমা মেয়েকে নিয়ে এলেও যতীন্দ্রমোহন বাদার মালিকানা নিয়ে হাইকোর্টে মামলায় ব্যস্ত থাকায় আসতে পারেনি ।

পরপর তিনদিন নীল আকাশে আসন্ন শীতের লেপ বানাবার পেঁজা-তুলোর পাহাড় দেখে বালিসোনার মানুষ আশ্বস্ত হয়ে অভিনব প্রতিবাদ-মিছিলের মহড়ায় বাড়ির ছেলেমেয়েদের আবার চৌধুরীবাড়ি পাঠাতে লাগল ।

দুর্গাপূজার তিনদিন আগে নাচ গান পথনাটিকার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা দেখে কারও চোখে আর পলক পড়ে না । এমন প্রতিবাদমিছিল বালিসোনার মানুষ কখনও দেখেনি । এ যেন একটা সুদীর্ঘ স্বপ্নদৃশ্য । প্রদীপের ভাষায় 'নান্দনিক প্রতিবাদ' । দুপুর দুটোর মধ্যে রাস্তার দুপাশে মানুষের গাদাগাদি ভিড় উপচে পড়ার জোগাড় । ঘর বাড়ি দোকানের ছাদে-বারান্দায়, জানলার ফাঁকে, গাছের মগডালে শুধুই মানুষের মাথা ।

সরোজিনী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অনিন্দিতা, পারমিতা, পরীক্ষিত, তিকান, সুকন্যা, সুনয়নী, অম্বরীশ, লিওন, প্রদীপদের হাতে হাতে দৃষ্টিনন্দন প্ল্যাকার্ডে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা এমন মর্মস্পর্শী কথাও বালিসোনার মানুষ আগে কখনও শোনেনি ।

কারও প্ল্যাকার্ডে লেখা, 'হিংসা নয়, ঘৃণা নয়, চাই ভালোবাসা/পরদুঃখে কাঁদা চাই, পরসুখে হাসা ।'

কারও প্ল্যাকার্ডে- 'কেদার-বদ্রী যাও কিংবা করো হজ/ভালোবাসা তার চেয়ে অনেক সহজ ।'

কিংবা, ‘ধর্ম যদি ধুয়ে দেয় অন্তরের কালো/সব ধর্ম ঠিক পথ সব ধর্ম ভালো।’

কোথাও লেখা, ‘মানুষ থাকুক যত্নে/এছাড়া আর পথ নেই।’

অনেকে ভক্তিভরে অবাক চোখে দেখছে, অনেকে ঠোঁট নেড়ে কথাগুলো বানান করে পড়ছে। বালিসোনা যেন মন্ত্রমুগ্ধ।

স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে দলে দলে মানুষ এসে মিছিলের শেষ প্রান্তে যোগ দেবার ফলে মিছিল ক্রমশ আরও দীর্ঘ আকার নিল। স্টেশন রোড দিয়ে মিছিল যখন ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সেই সময়টুকুÅর মধ্যে তিনটে আপ-ডাউন ট্রেনের অনেক প্যাসেঞ্জারও গন্তব্য ভুলে প্রথমে কৌতূহলে ও পরে আবেগবশে মিছিলে এসে যোগ দিল।

মিছিলের পিছনে পুলিশের গাড়ি মেনে নিলেও সামনের আর্মড ফোর্সের গাড়ি সরিয়ে নেবার জন্য অম্বরীশদের বহু অনুরোধ-জোরাজুরিও বৃথা হল। অফিসারের একটাই উত্তর- অর্ডার নেই।

প্রকৃতিবন্দনা, মানববন্দনা, বালিসোনাবন্দনার নৃত্যগীতে, বৃক্ষনিধনের নিষ্ঠুরতা ও প্রতিবাদের পথনাটিকার ছন্দে তালে অঙ্গভঙ্গে বালিসোনার বাতাস যখন উচ্ছ্বসিত, আকাশ যখন উচ্চকিত, মানুষ যখন উদ্দীপিত, ঠিক তখন মিছিলের পিছনে আরও দুটি পুলিশের কালো গাড়ি এসে জুড়ে গেল। দুটি গাড়িতেই প্রচুর পুলিশ ছাড়াও বাইকবাহিনীর কয়েকজনকে দেখা গেল, এদের মধ্যে তিনজনের নামে তখনও হুলিয়া জারি আছে।

প্রথমে মিছিলে দুটো বোমা পড়ল, একটা অম্বরীশকে লক্ষ করে। তারপরই মিছিলের পিছন দিক থেকে পুলিশের এলোপাথাড়ি লাঠি চার্জ। মিছিল ছারখার না হওয়া পর্যন্ত তাণ্ডব চলল।

বাম উরুতে বোমার জালকাঠি বিদ্ধ হয়ে অম্বরীশ পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল। হাসপাতালে সব ক’টি জালকাঠি বের করে দেখা গেল তার হাঁটুও জখম হয়েছে। হাঁটু থেকে উরুর অর্ধেক পুরু ব্যান্ডেজ বেঁধে নিউরো সার্জন অম্বরীশকে একমাস বেড রেস্টের আদেশ দিলেন।

প্রহরে প্রহরে তাকে ওষুধ খাওয়াবার দায়িত্ব জোর করে সরস্বতী নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। তার এই কাকার কাছে তার কৃতজ্ঞতা সে আজও ভোলেনি। একদিন ওষুধ দেবার জন্য বাড়ানো সরস্বতীর হাত ধরে ফেলে অম্বরীশ বলল, ‘ডাক্তার শুধু শরীর সারাবার ওষুধ দিয়েছে, তোর সুটকেস থেকে আমাকে মন সারাবার ওষুধ এনে দে দেখি। তুই কি লখনউয়ের সব বই-ই নিয়ে এসেছিস? যা বড় বড় দুখানা সুটকেস দেখলাম!’

‘ওষুধটা খেয়ে নাও।’ বলে খানিক চুপ করে থেকে এবার থমথমে গলায় সরস্বতী বলল, ‘শুধু বই না, সব কিছু নিয়ে চলে এলাম। এখানেই থাকব।’

‘তাপসও কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে আসবে?’

‘তাপসের কাছ থেকে আমি চলে এসেছি। আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে, কাকা।’

অম্বরীশের ঘরে এখন কংকালের আবির্ভাব রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে । তার ধারণা কংকালের ভয়ে সে রাতেও ঘুমোয় না । এমনিতেই বার কতক ওষুধ ইনজেকশনের জন্য তাকে দিনের বেশির ভাগ সময় জেগে থাকতেই হয়, তারওপর শয্যাশায়ী অবস্থায়ও একদিন মিতার সঙ্গে দৈহিক মিলনের পর ঘুমে তার চোখ জুড়িয়ে আসছিল, তবু সে জোর করে জেগে থেকে মিতার অতি মৃদু নাকডাকা মন দিয়ে শুনতে লাগল । চির চেনা এই ধ্বনিটুকুও যেন এখন তার দরকার ।

কখন যে বারান্দায় খটখট শব্দ তুলে একে একে সাত কংকাল এসে হাজির হল অম্বরীশ খেয়াল করেনি । আজকাল এরা আর কোনও আলোচনা পাড়ে না, নিঃশব্দে বসে বসে শুধু পা নাচায় । কিছুক্ষণ পর একজন একজন করে সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর মতো তার বুকের ওপর চেপে বসে থাকল । অলক্ষ্যে থেকে কেউ যেন তাদের বসে থাকার মেয়াদ নির্ধারণ করে দিচ্ছে । সেইমতো তার সময় শেষ হলে, সে উঠে সোজা বাইরে চলে যায় । তখন পরের জন এসে বসে । এইভাবে সাতজন প্রায় সারা রাত ধরে তার বুকে চেপে বসে তাকে এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমোতে দিল না । সে ভীত সন্ত্রস্ত স্বরে চোখ বুজে ‘বাঁচাও, কে আছো বাঁচাও, কেউ কি আছো, আমাকে বাঁচাও’ বলে শুধু চেঁচাতে লাগল । মিতার ধাক্কায় চোখ খুলে তার ঝুঁকে থাকা উদ্বিগ্ন মুখ দেখে ভাবল- ওরা কি চলে গেছে! এবার কি একটু ঘুমোতে পারব?

যতীন্দ্রমোহন অম্বরীশকে দেখতে আসার সুযোগে হাসপাতালে ও থানায় গিয়ে তার ইনজুরির বিবরণ পরীক্ষা করল । ফিরে যাবার আগে সরোজিনী অম্বরীশ ও পারমিতাকে একজায়গায় বসিয়ে বাদার মালিকানার মামলার আংশিক সুখবর দিল- সেটেলমেন্ট রেকর্ডে, পরবর্তী কালের ল্যান্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টে সাত বছরের ব্যবধানে দুটি মিউটেশনে প্রথমে আইন মাফিক ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউজিং বোর্ডকে ও পরে আইন ভেঙে কোন এক বিদেশি ল্যান্ড ডেভেলপার্স অ্যান্ড টাউনশিপ বিল্ডার্সকে জলের দরে নিরানব্বই বছরের লিজ দেওয়া হয়েছে । আইনের কারচুপি প্রমাণ করাও কঠিন হবে না ।

রুদ্র ঝম্পটি ও আরও সাতজনের নামে অম্বরীশকে খুনের চেষ্টার অপরাধে ৩০৭ ধারায় মামলা করতে পুলিশকে বাধ্য করল যতীন্দ্রমোহন । এবারেও দোষীরা পলাতক, তাদের কাউকে ধরা গেল না ।

সন্ধের পর অম্বরীশের চোখের দৃষ্টি ক্রমশ আরও কমে যাচ্ছে । কে একজন তার বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, ‘তোর ব্যথা কোথায় বল, মানুষের নিরানব্বই ভাগ আদিব্যাধি সারিয়ে দেওয়া যায় । বল কোথায় তোর কষ্ট? যুধিষ্ঠির নাপিতকে একবার খবর পাঠা তো, আমার জটা-দাড়ি কেটে দিক এসে ।’

শেষ কথায় অম্বরীশের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল- ‘অবনী? অবনী দাদা? ছোড়দা, তুই? আঃ, বাঁচালি ।’

অম্বরীশের ভয় করে, হয়তো স্বপ্ন দেখছে ।



১৪

প্রহ্লাদ কর্মকারের বড় ছেলে যেদিন বাবার সঙ্গে মাটির নীচে ঘাটের ভগ্নাবশেষ দেখতে এসেছিল, সে শহরের পলিটেকনিকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে শুনে অম্বরীশ বলেছিল তার নতুন বৌদির কাছে সেযুগের বিদেশি 'টি' ও জার্মান কাঁটা-কম্পাস আছে, একদিন এসে যেন নিয়ে যায় ।

বৌদি প্রায় কিশোরী বয়সে কলকাতায় মহিলাদের প্রথম পলিটেকনিকে ভর্তি হয়েছিলেন, ওই পলিটেকনিকেরই প্রিন্সিপাল তাঁর নিজের পিসিমার উপদেশে কলেজে যাতায়াত শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত মন বসাতে না পেরে বেথুন কলেজে পড়াশোনা শেষ করেন ।

'টি' ও কাঁটা-কম্পাস নিতে আসার দিন ছেলের সঙ্গে প্রহ্লাদও মনিববাড়িতে কত্তাবাবুকে দেখতে এল । গভীর সংকোচে বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকার পর সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'আপনি না এলে খননকায্য তেমন এগোচ্ছে না, কত্তাবাবু! যেসব জায়গার জল নেমে গেছে সেখানেও পুরো দমে সবাই হাত লাগায় না । বৃষ্টির আগে যারা মাটি খুঁড়ত তারা রোজই আসে কিন্তু শুকনো জায়গায় তারা কোদাল মারে না । পাউরুটির লোভে আসে, রুটি নিয়ে চলে যায় । ওয়াল পেসিডেনের ইসকুল থেকেও রুটি আনতে যায় ।'

প্রহ্লাদের ছেলের মতো আরও কারও কারও ছেলে ট্রেনে বড় শহরের কলেজে, পলিটেকনিকে, আই টি আইতে পড়তে যায় । মেয়েরাও কেউ কেউ যায় । রুটি কারখানার ম্যানেজারের মেয়ে ও ময়দা-মাখিয়েদের একজনের ছেলে মেডিক্যাল কলেজে পড়ে । অনেকে আবার স্কুলের পড়া শেষ না করে বা পাশ করতে না পেরে মনিহারি দোকানে, জামা-কাপড়ের দোকানে, জুতোর দোকানে, চায়ের দোকানে, চশমার দোকানে কাজ করে । বাপ-ঠাকুর্দার পেশায় কারও আর আগ্রহ নেই । অনেকে কাজের সন্ধানে গুজরাট মহারাষ্ট্র কেরালায় চলে যায় ।

বালিসোনায় মানুষের ভিড় যত বাড়ে, জমির দামও তত বাড়ে । বাড়ে দোকান-বাজার । কল-কারখানা । ষাট-সত্তর বছর আগের মানুষের মুখের ভাবের তুলনায় এখনকার ভিড়ের মানুষের মুখভাবের পার্থক্যও বাড়তে থাকে । বাড়তে থাকে চালচলন, মুখের ভাষার তফাৎ । বালিসোনায় এ-ও এক মৌলিক বদল ।

তবে সরোজিনীর পর্যবেক্ষণে এখনও বদলের আঁচ না লাগা কৈশোরের সজীব মুখ, স্বপ্নমাখা চোখ বালিসোনায় দেখা যায় । চিরকাল দেখা যাবে ।

'এটা তোমার উইশফুল থিংকিং নয় তো?' পরীক্ষিৎ বলল ।

'না রে, এই যে লক্ষ্মীর মেয়েকে নিয়ে এতটা সময় কাটাই, সেও এই মুখের মায়ায় । তোকে যখন প্রথম দেখি তোর চোখে-মুখেও আমি এমন ধারাই দেখেছি । ভুল তো দেখিনি ।' খানিক চুপ করে থেকে আবার বলল, 'তোর ঠাকুর্দার মতো যদি রাস্তার ধারে শিরীষতলায় গিয়ে বসতে পারতাম, তাহলে ঠিক এরকম গভীর মনের ছেলেমেয়ে আলাদা করতে পারতাম । খুব ইচ্ছে হয় কাছে ডেকে এদের মনের কথা শুনি । আমার কী মনে হয় জানিস- এই যে যুগে-যুগে নিরন্তর সব কিছু বদলে চলেছে, তা সত্ত্বেও সব যুগেই দেখা যায় কিছু কিছু মানুষের মুখে তাদের গভীর মনের ছায়া পড়ে । হয়তো প্রাগৈতিহাসিক যুগেও এমন ছিল, তা নাহলে পাহাড়ের গুহায় ছবি আঁকার কথা ভাবল কী করে?'

'তাহলে বাড়িতে একটা ছোট লাইব্রেরি করো না কেন? তোমার তো অনেক বই । লাইব্রেরিতে শুধু কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েরা পড়তে পারবে, ওই যাদের সজীব মুখ, স্বপ্নমাখা চোখ । চাঁদা লাগবে না । যদি করো, আমি হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে স্টেশনে, পোস্টাপিসে, বাসস্ট্যান্ডে সেঁটে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি । ওরকম ছেলেমেয়ে জড়ো করা তো সহজ কথা নয় ।'

সরোজিনী ততক্ষণ মনে মনে লক্ষ্মী-লিওনের মেয়ের মুখের মায়াতেই ফিরে গিয়েছিল । পরীক্ষিতের কথাটা হয়তো শোনেইনি, মৃদু স্বরে বলল, 'মা-বাবার রূপ সৌন্দর্য লুটে নিয়ে মেয়েটা জন্মেছে । দেখিস ও একদিন হয়তো বহু মানুষের কল্যাণসাধন করবে ।'

পারমিতা ছেলের নামে একটা মুখ আঁটা খামের চিঠি দিতে এসে এ ঘরে ঢুকে শেষ কথাগুলো শুনে বলল, 'আবার কিছু একটা প্ল্যান করা হচ্ছে নিশ্চয়ই?'

চিঠি পড়ে পরীক্ষিৎ খুশি । খবরের কাগজের ট্রেনি জার্নালিস্টের লিখিত পরীক্ষার পর কিছুদিন আগে ইন্টারভিউ দিয়ে এসে রোজ সকালে সেই কাগজটাই পড়ার সময়েও কোনওদিন তার মনে কাজটা হবার আশা বা ভাবনা জাগেনি ।

সব শুনে সরোজিনীর প্রতিক্রিয়া- 'তোর পক্ষে ভালো হল । হ্যাঁরে, অত বড় কাগজের অফিসে তুই পারবি তো?'

'যে কাজের জন্য পরীক্ষা, সেটা যখন পেরেছি, কাজটাও পারব নিশ্চয়ই । ওঁরাও তো শেখাবেন ।'

ট্রেনিং শেষ হবার আগে থেকেই রবিবাসরীয় পাতায় একটা-দুটো করে পরীক্ষিতের কবিতা ছাপা হতে লাগল । কিছুদিনের মধ্যে প্রতি বুধবার সে লিখতে শুরু করল 'বিষাদগাথা' নামে এক নতুন কলাম ।

বছর না ঘুরতেই 'বিষাদগাথা' কলামে পরীক্ষিৎ জলের দরে বিদেশিদের হাতে বালিসোনার বাদা তুলে দেওয়ার নেপথ্য কাহিনী গভীর দুঃখ ও বিষাদের সঙ্গে সাত সপ্তাহ ধরে ধারাবাহিক লিখে গেল ।

রাতে অফিস থেকে ফিরে কিছুক্ষণ অন্তত রাঙা-জ্যাঠাইমার সঙ্গে কথা না হলে তার ভালো লাগে না । ইতিমধ্যে কিশোর মনের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ে সরোজিনীর আগ্রহের কথা শুনে লক্ষ্মী তাকে তাদের শিক্ষালয়ে উপদেষ্টা-শিক্ষিকার পদ নিতে রাজি করিয়ে ফেলল । সেখানেও কোনও কোনও দিন ক্লাসের শেষে লক্ষ্মীর মেয়ে চিরন্তনীকে সঙ্গে নিয়ে আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের দুটি আলাদা হোস্টেলে পালা করে পশু পাখি কীট পতঙ্গের অদ্ভুত সব গল্প শুনিয়ে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যায় । পরীক্ষিত তখনও বসে থাকে ।

অল্পদিনেই তার বিষাদগাথার লেখাগুলোতে এক নিঃস্বার্থ, নির্ভীক ও বিষণ্ণ প্রতিবাদীর পরিচয় পেয়ে পাঠক বাংলা ভাষায় এক নতুন মন আবিষ্কার করল । তার কবিতার চাপা হাহাকার বিষাদগাথায় আরও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল । মানুষের মনে তার কথার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল চৈত্রের গুমোটের পর কালবৈশাখীর মতো । 'এই কবি-কলমচীর চোখ দিয়ে শুধু অশ্রু নয়, আগুনও নির্গত হয়' তাঁর প্রথম গদ্যসংকলনের সমালোচনায় অন্য একটি সংবাদপত্রে মন্তব্য করা হয়েছিল ।

পরীক্ষিতের কবিতা, বিশেষ করে তার বিষাদগাথা এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠল যে কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে-কোনও ইস্যুতে শাসক দল পরীক্ষিতের সমর্থন পেতে মরিয়া । আবার সরকার-বিরোধীরা তাকে চায় শাসনক্ষমতা-দখলে তাদের নিজস্ব পন্থার সমর্থক হিসাবে ।

অঘ্রাণে ধান কাটার পর বালিসোনার প্রত্যন্ত সব অঞ্চলে ঘরে ঘরে নবান্নের দিন পরীক্ষিৎ তার রাঙাজ্যাঠাইমাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ভণ্ডুলের দুহাতে দুই ব্যাগ ভরতি বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' পরিবারপিছু একটা করে বিলোতে লাগল । সরস্বতী পুজোর দিন যাদের হাতেখড়ি হয়েছিল তারা সেদিনকার তালপাতা, খাগের কলম বাদেও এবার স্লেট-খড়ি পেয়ে মহা খুশি । ড্রাইভার বিনোদের কাঁধের ঝোলা থেকে স্লেট-খড়ি বের করে যতীন বরের ছেলে ব্রতীন বর হাতেখড়ি হওয়া ছেলেমেয়েদের নামের তালিকা আগে মিলিয়ে দেখে তারপর দানসামগ্রী হাতে তুলে দিচ্ছিল ।

কাঁসারিপাড়া থেকে বেরিয়ে তাঁতিপাড়ায় ঢোকবার মুখে পরীক্ষিতের চোখে পড়ল তাদের গাড়ির হুডে হেলান দিয়ে চারজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে, পাশে চারটে মোটরবাইক দাঁড় করানো ।

সরোজিনী তখনও তাদের পিছু পিছু আসা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলায় মগ্ন । গাড়ির কাছাকাছি হতেই চারজনের তিনজন আগের মতোই হেলান দিয়ে রইল, একজন হাতের গোটানো টাইপ করা কোর্ট পেপার সরোজিনীদের সামনে হুডের ওপর রেখে বলল, 'রাসমাঠের দানপত্রে দুজনে সই করুন । দান করছেন বালিসোনা স্পোর্টিং ক্লাবকে ।'

'মানুষ, না শয়তান এরা?'

সরোজিনীর কথা কানে না নিয়ে পরীক্ষিৎ দৃঢ় স্বরে বলল, 'দান আর লুণ্ঠন দুটো আলাদা প্রক্রিয়া । রাসমাঠ আপনারা লুট করার চেষ্টা করতে পারেন, আমরা এখনও কাউকে দান করার কথা ভাবিনি ।'

পরীক্ষিৎ গালে একটা প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে ঘুরে মাটিতে পড়ে গেল । আঙুলের বাঘনখে তার গাল কেটে গেছে, ধুলোয় রক্ত পড়ে খানিকটা জায়গা কালচে দেখাচ্ছে ।

গ্রামবাসীদের মারের হাত থেকে প্রাণে বেঁচে তিনজনই বাইকে লাফিয়ে উঠে পালাল, একজন, পরীক্ষিৎ উঠে দাঁড়ালেও তার রক্তের পাশেই শুয়ে রইল ।

দুটো ইনজেকশন ও গালে তিনটে সেলাই নিয়ে পরীক্ষিৎ সরোজিনীকে আশ্বস্ত করতে করতে বাড়ি এসে দেখে বসবার দালানে শাসকদলের নেতা বসে আছেন । উঠে দাঁড়িয়ে দুজনকে নমস্কার জানিয়ে পরীক্ষিতের গালের স্টিকিং প্লাস্টারে চোখ রেখে নেতা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি অসুস্থ? না কি রোড অ্যাকসিডেন্ট?'

'আপনি হঠাৎ?'

'আপনার সঙ্গে খুব জরুরি আলোচনা ছিল । রাজ্যে শান্তির ব্যাপারে আমাদের দল একটা উদ্যোগ নিচ্ছে । আপনার মত মানে সম্মতির আশা নিয়ে আমি নিজে চলে এসেছি ।'

'শান্তির জন্যও সম্মতি দরকার? শান্তি তো সকলেই চায় ।'

'বিরোধী দল তারই সুযোগ নিয়ে আমাদের চেষ্টা বানচাল করতে চাইছে । শুনছি তারা নাকি জেলায় জেলায় দুর্গার মহিষাসুর বধের পালা নামাচ্ছে ।'

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর দু-ঘন্টা ধরে শাসকদলের নেতা পরীক্ষিৎকে তাঁদের দলীয় কর্মসূচি বিশদে বোঝাতে লাগলেন ।

পুরো সময়টা নীরব শ্রোতা থেকে পরীক্ষিৎ বলল, 'সশস্ত্র শান্তি-আলোচনা কি সম্ভব? আমার তো মনে হয় শকুনিকে কোকিলের ডাক শেখানোর মতোই অবাস্তব । আমাকে মাফ করুন, আর এখানে বসে থাকতে পারছি না । আপনি কি জানেন আজ আপনাদের

বাইকবাহিনীর চারজন ছুরি উঁচিয়ে রাসমাঠের দানপত্রে আমাদের সই করতে বাধ্য করতে এসেছিল! আমার গালে তার ক্ষত এখনই সেলাই করে এসেছি । আর বসতে পারব না ।'

'সে কী! আমি এখুনি খবর নিচ্ছি । এফ আই আরে সব কটার নাম দিয়েছেন তো? আপনার সামনেই বলে যাচ্ছি, আইন আইনের পথে চলবে । আমার প্রস্তাবটা একটু ভেবে দেখবেন । দেশের স্বার্থে আপনি যে আমাদের দলকে সমর্থন করবেন সে-বিশ্বাস আমাদের আছে ।'

নেতাকে বাইরের দরজায় তার গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে পরীক্ষিত বলল, 'দেশের স্বার্থ আমি কিছুটা বুঝি, দলের স্বার্থের সঙ্গে তার মিল কোথায়, শ্যামানন্দবাবু?'



১৫

এক পয়সা থেকে পাঁচ পয়সা, পাঁচ পয়সা থেকে দশ পয়সা পর্যন্ত বিনিময়মূল্য বাড়িয়েও ক্রমবর্ধমান পাউরুটি প্রার্থীদের দৈনিক পাউরুটি বিলোনো স্বর্গীয় ওয়াল পেসিডেনের প্রতিষ্ঠিত সুষমা বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল । ময়দার দামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজারে পাউরুটির দাম বাড়াতে বাধ্য হলেও অম্বরীশ তার কারখানার ম্যানেজারের জবরদস্তি সত্ত্বেও স্কুলের বরাদ্দ রুটি বরাবরের মতো বাজার দরের অর্ধেক দামে দেবার ব্যবস্থা চালু রেখেছে ।

শনিবারের সন্ধেবেলার কীর্তন ও খিচুড়ি ভোগ আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শিবকৃষ্ণর আত্মহত্যার এক দশক পর তারই প্রতিষ্ঠিত স্কুলের ছাত্রী স্কুল ফাইনালে নবম হওয়ায় সরোজিনীর উদ্যোগে ওই দিনটিকে তার আবির্ভাব ও প্রয়াণদিবস ধরে নিয়ে বছরে ওই একদিন সকালে ছাত্রীদের গান আবৃত্তি ও সকাল-সন্ধে দুবেলাই কীর্তন-খিচুড়ি ভোগের আয়োজন হয় । বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের সামনে রাস্তার ধারে টিন টালি অ্যাসবেসটস চালাঘরের সেলুন, স্টুডিও, জেরক্স, লোকাল ও এসটিডি টেলিফোন বুথের খুপরির লোকজনকেও ওই দিন খিচুড়ি ভোগে ডেকে নেওয়া হয় । মৃত্যুর ন'মাস ঊনিশ দিন পরে শিবকৃষ্ণর সাধনসঙ্গিনীর গর্ভে জন্মানো তাদের একমাত্র সন্তান নীলাম্বর তার যেখানে যত সমবয়সি বা আরও কমবয়সি বন্ধু আছে প্রত্যেককে নিমন্ত্রণ করে । সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিজে উপোস করে থেকে সবার কলাপাতায় খিচুড়ি পরিবেশনের তদারকি করে । সে নিজেও খিচুড়ির বালতি হাতে আনন্দে দৌড়োদৌড়ি করে । বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিজের হাতে খিচুড়ি দিতে তার খুব উৎসাহ । তার মা বলে, ‘তোর এই স্বভাব তুই তোর বাবার কাছ থেকে পেয়েছিস । সারা জীবন তোর জন্য অপেক্ষা করে করে হতাশ হয়ে, হয়তো সেই দুঃখেই, চলে গেলেন । তুই আসছিস, সেটুকুও জেনে গেলেন না ।’

পাউরুটির কারখানা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্কুলে রুটি বিতরণ কয়েকদিনের জন্য বন্ধ রইল । লিওনের চেষ্টায় তার আম-লিচু প্রসেসিংয়ের ব্যবসার লাভের অংশ থেকে

কলকাতার রুটি কারখানায় অর্ডার দিয়ে নিয়মিত রুটি আনার মোটামুটি একটা ব্যবস্থা হল । তবে পাইকারি দরের ওপর অম্বরীশের কারখানার মতো বাড়তি ডিসকাউন্টের অভাবে রুটির সাইজ হাফ পাউন্ডের বদলে কোয়ার্টার পাউন্ড করা হল । মিষ্টি রুটির বদলে হল সাধারণ পাউরুটি ।

দূরে কোথাও মৌলবাদী হিন্দুদের হাতে মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে মুসলমান পাড়ায় কয়েকজন নেতার প্ররোচনায় বালিসোনায় বহুকাল পর আবার দাঙ্গা শুরু হল । অম্বরীশের রুটি কারখানার অধিকাংশ কর্মীদের চেষ্টায় প্রথম কয়েকদিন পরিবেশ শান্তই ছিল, এরই মধ্যে চারজন কর্মী তাদের পাড়ার নেতাদের পরামর্শে মুসলমান কর্মীদের মধ্যে রটিয়ে দিল হিন্দুরা বেছে বেছে দেশের সব বড় বড় মসজিদ ধ্বংসের চক্রান্ত করেছে ।

ক্রাচে ভর করে অম্বরীশ বহু কষ্টে কারখানায় এসে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের মূল্য ও গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করল । জনে জনে ব্যাখ্যা করে, কারখানার সকলের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি থাকার জন্যই সংশ্লিষ্ট সকলে আর্থিক সুফল পাচ্ছে । দেশের মুষ্টিমেয় লোকের ধর্ম নিয়ে গুণ্ডাবাজিতে অকারণ মেতে গিয়ে সেই বহুকষ্টের সুফল কি নষ্ট হতে দেওয়া উচিত?

কারখানার ভেতরে দাঙ্গা ঠেকানো গেলেও, দাঙ্গায় উৎসাহদাতা দুই সম্প্রদায়ের মোট সাতজন কর্মীকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে কারখানায় ঢোকবার মুখে ডজন ডজন ঝাণ্ডা পুঁতে দু-সম্প্রদায়েরই কর্মী ও অকর্মী বহু লোক স্লোগান দিতে লাগল । পিছনের দরজার সামনেও একই ব্যবস্থা । দুদিক থেকেই ভেতরে যাতায়াতের পথ বন্ধ । বেশির ভাগ কর্মী কাজে যোগ দিতে এসেও কারখানায় ঢুকতে পারল না ।

বালিসোনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তখনও দাঙ্গার রেশ থাকায় পুলিশ গেট আটকে রাখা জনতাকে লাঠি চালিয়ে হটিয়ে দেবার সাহস করল না । কারখানার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল । বহুকষ্টে অনেক ক্ষতি স্বীকার করে গড়ে তোলা তার কারখানা অন্যের মতামত মেনে চালাতে অম্বরীশও আর রাজি নয় ।



১৬

চৌধুরীবাড়ির পিছন দিককার ঘন বাঁশবনের আলো-আঁধারি থেকে বেরিয়ে দিবাকর তার মুখ ও মাথার মাকড়শার জাল ছাড়াতে ছাড়াতে চৌধুরীদের ন'ছেলের তেতলার ঘরের জানলার নীচে এসে দাঁড়াল। জানলার গরাদে কপাল চেপে নন্দিনী ইঙ্গিতে দিবাকরকে অপেক্ষা করতে বলল। তারপর কাছে এসে দিবাকরের শার্টে হ্যাঁচকা টান দিয়ে দ্রুত পায়ে আনারসের বন ছাড়িয়ে, ধূতরার জঙ্গল পার হয়ে, খেজুরগাছের সারির পাশ দিয়ে রেললাইনের দিকে এগিয়ে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'যা বলবে তাড়াতাড়ি বলো, পরীক্ষিৎ আজকাল এইসব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়।'

'সাগরখাঁড়ি যাবে? সেখানে আমি সাগরের কুচো চিংড়ির ঝাঁক শুকনো করার যন্ত্র বসিয়েছি। কাঠের যন্ত্র, আমারই তৈরি। ওই যন্ত্রে সারা দিন আমি চিংড়ির জলীয় পদার্থ বের করি। তুমি গেলে ওখানেই থাকব, বালিসোনায় আর ফিরব না। যাবে?'

'বাবা-জ্যাঠারা আমাকে কেটে বাদায় পুঁতে দেবে।'

ট্রেন আসতে দেখে দুজনেই রেললাইন ছেড়ে নেমে দাঁড়াল। রেলগাড়ির মাথায়ও শুয়ে-বসে-দাঁড়িয়ে মানুষ চলেছে।

'তোমাদের বাড়িটা আসলে পাগলদের আলাদা একটা পৃথিবী। একেক জনের একেক রকম কাণ্ডকারখানা।'

কথাটা শুনতে শুনতে দিবাকরের কোঁকড়া চুল থেকে মাকড়শার জাল-জড়ানো শুকনো বাঁশপাতা ফেলে দিয়ে নন্দিনী বাপমা-হারা কুচকুচে কালো ছেলেটির আশ্চর্য নিখুঁত নাক-ঠোঁট-চিবুক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। সেই ঘোর থেকেই বলল, 'সাগরখাঁড়িতে তোমার নিজের ঘর আছে?'

'সৈকতের কাছেই আমার দুখানা ঘর, একটায় আমার যন্ত্র আর একটা নৌকো থাকে, আরেকটায় ওখানকারই দুটো ছেলেকে রেখেছি, আমার সঙ্গে কাজ করে।'

'তুমি থাকো যন্ত্রটার সঙ্গে?'

‘আমি ঠিক সাগরখাঁড়িতে থাকি না, আমি থাকি সাগরের বুকে ছোট্ট একটা দ্বীপে। দিনের শেষে নৌকোয় চলে যাই।’

‘সেই দ্বীপে তোমার বাড়ি?’

‘গাছের ওপর কাঠের বাড়ি। আমিই বানিয়েছি। আমার কী মনে হয় জানো? ওটাই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর বাড়ি। প্যাঁচা-পাখি, জোনাকি-কাঠবিড়ালি, কয়েকটা ইঁদুর-খরগোস ছাড়া ওই দ্বীপে আর কেউ থাকে না। জোয়ারে দ্বীপে জল উঠে যায় বলে ঘরে যাবার বাঁশের সিঁড়ি গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখি। জোছনায় দ্বীপটা কী যে অদ্ভুত সুন্দর দেখায় তুমি ভাবতে পারবে না।’

নন্দিনী তন্ময় হয়ে শুনছিল। একসময় বলল, ‘এত সুন্দর বাড়ি ছেড়ে বাঁশবনের এই বাদুড়-চামচিকের বাসায় তুমি আসো কেন?’

‘তোমার জন্যে। না হলে কবেই আমি বালিসোনা ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যেতাম। বাবার কাছে শুনেছি বালিসোনার যারা আসল মানুষ তারা অনেকেই আর নেই।’

শৈশবে মাতৃহীন দিবাকর শহরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় বাবার অকাল মৃত্যুতে পড়া শেষ করতে পারেনি। কয়েকটা ছোটখাটো ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় কাজ করে সুখ হল না। তারপর তাদের বাঁশবনের বাড়িতে থেকে কচুরিপানা থেকে খুব হালকা কৌটো বাক্স টেবিল চেয়ারের ব্লক তৈরির মেশিন বানিয়ে ভালোই জীবিকা নির্বাহ করছিল। কাছে দূরে অনেক গ্রামেই চাষি-তাঁতি পরিবারের ভবিষ্যতহীন যুবকেরা তার মেশিন কিনে কচুরিপানার ব্লক তৈরির দোকান করে দাঁড়িয়ে গেছে। এই সময় সে রাসমাঠের রথের মেলায় হঠাৎই একদিন নন্দিনীকে দেখল। তারপর থেকে ঘুমে-জাগরণে বারবার তাদের দেখা হয়। যতদিন না দেওয়ালে, গাছের গুঁড়িতে ‘বাঁশবনের শেয়াল রাজা/কচুরিপানা খায় ভাজা’, ‘দিবাকর নন্দিনীর সনে/ভালুক যেমন কাশের বনে’ দেখা গেল এবং তাকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করা হল, ততদিন দুজনের দেখা হওয়াই ছিল দুজনের দিনরাত্রির তাড়না।

ছ’মাসের মধ্যেই বালিসোনার বিভিন্ন দোকান মারফৎ ‘দিবাকর ডিহাইড্রেটেড চিংড়ি’র নানা মাপের প্যাকেট অনেকের বাড়িতেই তারিফ পাওয়ার খবর শুনে সে আবার বালিসোনায় আনাগোনা শুরু করেছে।

রেললাইনের পাশের নিচু পথ বেয়ে মাথার ওপর মৌমাছির ঝাঁক নিয়ে সাইকেলে মোহন মউলেকে আসতে দেখে তাদের তন্ময়তা ভেঙে গেল। কতক্ষণ দুজনের কেউই মুখে কিছু না বলে মনে মনে কথা বলে যাচ্ছিল কারওই খেয়াল নেই। মোহন মউলের দৃষ্টির সামনে থেকে সরে যাবার আর উপায় নেই, দিবাকরই উঠে দাঁড়িয়ে তাকে থামাল।

হ্যান্ডেল এপাশ-ওপাশ ঘুরিয়ে পালাবার চেষ্টা করেও মোহন মাটিতে তার লম্বা পায়ের ভরে পতন সামলে অপ্রস্তুত হেসে ফেলে বড় এক শিশি মধু দিবাকরের দিকে বাড়িয়ে

দিয়ে বলল, 'দু-চামোচ মধুতে আস্ত পাতিলেবুর রস মিশিয়ে তার মধ্যে তোমার চিংড়ি ভাজা ঘন্টাখানেক রেখে খেয়ে দেখো ।'

'তোমাকে আমি টাকার তাগাদা দিতে থামাইনি । ও-মধু তুমিই রেখে দাও । মেশিনটা শুধু ফেরত পেলেই হবে । লিওনদাদা দেখতে চেয়েছেন । কচুরিপানার কাজে তুমি যখন জুৎ করতে পারোনি, তখন ও-মেশিন রেখে তোমার লাভ কী? খামোখা দেনা মাথায় দিন কাটাবে কেন! এই, তোমার মাছি সামলাও!'

নন্দিনী দুহাতে মুখ ঢাকল- 'আমার দিকে আসবে না তো?'

'ভয় নেই । কালই লিওনকত্তাবাবুর বাড়িতে মেশিনটা আমি দিয়ে আসব ।'

'তার আগে আমার কাছে আনবে, ওটা আরও একটু ইমপ্রুভ করব । আরও এফেকটিভ ।'

'কী করবে?'

'আরও ভালো । আরও কাজের করতে পারব । পরে হয়তো এই মেশিনকে আরও শক্তিশালী করে পাটকাঠির বড় বড় ব্লক তৈরির উপযুক্তও করা যাবে ।'

পরের বার বালিসোনায় এসে দিবাকর তার উন্নত যন্ত্র লিওনার্দোকে দেখাল । নতুন যোগ করা অংশ-দুটোর কাজও বুঝিয়ে দেল ।

লিওন অনেকক্ষণ ধরে দেখে বলল, 'তোমার যন্ত্রের কল্পনা ও কারিগরি বিস্ময়কর । আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে তুমি আরও অনেক নতুন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করবে । আমি তোমাকে কোনওভাবে সাহায্য করতে পারি কি?'

'নন্দিনীকে আমার জীবনে জুড়তে পারলে বড় ভালো হয় । একই যন্ত্রের দুটো পার্টস যেন আলাদা হয়ে আছে । জোড়া লাগলে জোর বাড়ে ।'

লিওন হেসে ফেলল, 'তার মানে তোমার মনোযন্ত্রটি আরও ক্রিয়াশীল হবে, তাই তো? আমার উপদেশ, তোমরা দুজনে একসঙ্গে সরোজিনীর কাছে যাও । তাঁকে সব বলো ।'

বিকেলে দিল্লি থেকে প্রদীপের পাঠানো নতুন বইয়ের পার্সেল খুলে সরোজিনী প্রথমেই পিঁপড়ের বোধবুদ্ধি ও অনুমানশক্তির বিষয়ে মোটা বইটা নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছে, ঠিক সেইসময় নন্দিনী ঘরে ঢুকে বলল, 'রাঙাজেঠি, তুমি কি খুব ব্যস্ত এখন?'

'খুব একটা না । কী বলবি, বল না ।'

'দিবাকরকে বাইরে দাঁড় করিয়ে এসেছি । তোমার সঙ্গে একবার কথা বলতে চায় ।'

'এখানেই নিয়ে আয় ।'

দিবাকর ঘরে এসে মাথা ঝুঁকিয়ে করজোড়ে সরোজিনীকে নমস্কার করে বলল, 'আমার মনের একটা কথা আপনাকে বলব, কত্তামা?' সরোজিনীর হাতের বইটার মলাটে পিঁপড়ের ছবিতে চোখ পড়ায় আবার বলল, 'ছোট্ট একটা পিঁপড়ের ভেতর কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্র, ভেবে অবাক হয়ে যাই ।'

‘তোমার কি আবার নতুন কোনও যন্ত্র মাথায় এল নাকি? বলো, শুনি ।’

‘আমার কোনও যন্ত্রের কল্পনাই আসছে না আর ।’

‘আবার বালিসোনায় আসছো বলে কেউ কিছু বলেছে নাকি? লোকে তো এখন তোমার শুখা চিংড়ির প্রশংসাই করে ।’

‘আমার কথা লিওনদাদাকে সব বলেছি । আপনি যদি, কত্তামা, ওনার কাছে শুনে একটা বিধান দেন তাহলে হয়তো আবার আমার মনোযন্ত্র সচল হয়ে নতুন নতুন যন্ত্রের কল্পনায় মাততে পারে ।’

‘এবার বুঝলাম । কিন্তু দিবা আর নিশি দুটো আলাদা সময়, তাদের মেলাবার শক্তি কি আমার আছে?’

শুখা চিংড়ির পর থেকে সরোজিনী নন্দিনীকে মাঝে মাঝে দিবাকরের সঙ্গে মিলিয়ে ‘নিশি’ বলে ।

সরোজিনী, লিওন, লক্ষ্মী, অম্বরীশ, মিতা, পরীক্ষিৎ সকলেই দিবা-নিশির বিয়েতে একমত হয়ে, প্রদীপ ও সরস্বতীকে চিঠি লেখে । মেজো সেজো ন-ভাইদের মতামত চায় । একজনের কোনও মতামতই নেই, আরেকজনের ঘোর অমত, কন্যার বাবা অধিকাংশের মতে অগত্যা মত দিল । সরোজিনীকে মনে হয় সে-ই বিয়ের পুরোহিত, আর লিওন যেন একইসঙ্গে বর ও কন্যা কর্তা ।

বালিসোনার বাঁশবনে বসেই দিবাকর উভচর সাইকেল উদ্ভাবনায় মন লাগাল । তার কল্পনার সাইকেল মাটিতেও চলবে, দরকারে আকাশেও উড়বে ।

এগারো দিনের চেষ্টায় দিবাকরের সাইকেল যখন মাত্র দু’ফুট দূরত্ব উড়তে পেরেছে, মসৃণভাবে নামিয়ে আনার মেকানিজম তখনও অধরা, নিজের সাইকেল চালিয়ে সুখবর দিতে এসে লিওন দিবাকরের এই অদ্ভুত যানটি খুঁটিয়ে দেখে বলল, ‘একি পক্ষিরাজ-সাইকেল নাকি? আগে কোথাও তুমি দেখেছ?’

‘স্বপ্নে দেখেছি ।’

‘উড়বে কবে মনে করছ?’

‘ফড়িংয়ের ফিনফিনে পাখনা আর লেজের আনুপাতিক দৈর্ঘ্যের রহস্য পুরোপুরি ভেদ করতে পারলেই অনেকটা এগিয়ে যাব ।’

‘তোমার মনোযন্ত্রের উপযুক্ত পার্টসও এবার পেয়ে যাচ্ছ! জানো কি- তোমাদের আকাÉায় সকলের সম্মতি মিলেছে?’

‘এবার তবে পক্ষিরাজই বানাব!’

দিবাকর সাইকেলের সব পার্টস খুলে ফেলে আবার নতুন করে শুরু করার কথা ভাবতে বসল ।



১৭

‘বালিসোনায় অচেনা মানুষের ভিড় যত বাড়ছে, চেনা পাখিও তত কমছে । ঘর-বাড়ি যত বাড়ছে, গাছপালাও তত কমছে । রাতের আকাশে হয়তো তারাও আর তত দেখা যায় না ।’ পূর্ণিমার আগের দিন জ্যোৎস্নার সূচনায় নির্জন রেললাইন ধরে দুজনে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে পরীক্ষিৎ বলে যাচ্ছে, তিকান চুপ করে শুনছে ।

অনেক পরে ফেরার পথে, চাঁদ যখন পূর্ণিমার মতো জ্বলছে, তিকানের গলা শোনা গেল- ‘ঠিক কী তুমি করতে চাও? বিয়ে করে আর পাঁচজনের মতো সংসার করার কথা কখনও ভাবো কি?’ একটু থেমে আবার, ‘দিবাকরদের মতো, চলো না, আমরাও রাঙাজ্যাঠাইমার কাছে যাই ।’

‘তুমি গেলে জ্যাঠাইমা খুশিই হবেন । তোমার কীর্তন শুনতে উনি খুব ভালোবাসেন । হয়তো একটা গাইয়েই ছাড়বেন । তবে কী জানো, ওদের বিয়েতে পারিবারিক বাধা ছিল । আমাদের তো কোনওরকম বাধা নেই ।’

‘বাধা এলে তুমিই সে বাধা ভাঙবে । বাধা নেই বলেই আমার ভয় । বললে না- আকাশে আর তত তারা ফোটে না? এরপর হয়তো বলবে জ্যোৎস্নাও আর তত আলো দেয় না । একদিন বলবে তিকান আর তত তিকান নেই ।’

তার চোখের জলে জ্যোৎস্না চিক চিক করছে ।

নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে একসময় তিকানের কানের কাছে মুখ নামিয়ে পরীক্ষিৎ মৃদুস্বরে বলল, ‘জ্যোৎস্নালাগা চোখের জলে, দুঃখ খুঁজব সেই অতলে!’

‘জগতের সবার দুঃখের তল তুমি পাবে, আমার দুঃখ তুমি কোনওদিনই বুঝবে না ।’ একটু থেমে, আবার, ‘আমার সামনে অন্য বিপদও আছে ।’

‘আমাকে বলোনি কেন? বলো কী বিপদ? বলো আমাকে ।’

পরীক্ষিতের একটা হাত টেনে নিয়ে তিকান মৃদু হেসে বলল, ‘তোমাকে বলা আর নদীর জলে একটা বটের ছায়াকে বলা একই । তুমি বুঝবে না ।’

'বুঝব না? দূর আকাশে চিল দেখলে, চিবুক-ঘেঁষা তিল দেখলে, গাড়িভরতি মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ব হঠাৎ-'

পরীক্ষিতের উচ্ছ্বসিত স্বর শুনেও অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিকান আবার বলল, 'বাবার মুখের দিকে আর তাকাতে পারি না। জেল থেকে ফেরার পরও তাঁর স্বাস্থ্য দেখে অবাক হয়েছি। আগের মতোই সেই তেজি গলা, দ্রুত হাঁটা, মেরুদণ্ড সব সময় সোজা। অথচ এই কয়েকটা বছরে বাবা বুড়ো হয়ে গেলেন। পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক আগেই ত্যাগ করেছিলেন, এখন সঙ্গী শুধু হতাশা, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা। আর একটা লক্ষণ নতুন দেখছি, সব কিছুই ভীষণরকম ভুলে যাচ্ছেন। চেনা-জানাদেরও সেভাবে চিনতে পারেন না।'

কথার মধ্যেই ব্রতীন দূর থেকে ছুটতে ছুটতে এসে পরীক্ষিৎকে ধরে ফেলল, 'কোথায় না কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছি, এক্ষুনি চলো, সবাই তোমার অপেক্ষায় বসে আছে। ছোট কত্তাবাবুর দেহের লোমকূপ দিয়ে বিজবিজে ঘামের মতো রক্ত বেরচ্ছে! কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না।'

কাল রাত থেকেই নাকি এরকম হচ্ছে। অম্বরীশ কাউকে জানায়নি। তোয়ালে দিয়ে মুছে নেবার পরও সারা শরীর আবার শিশিরের মতো রক্তে ভিজে যাচ্ছে।

সকলেই অম্বরীশের ঘরে জমায়েত হয়ে পরীক্ষিতের অপেক্ষা করছিল। শুধু লিওন গেছে ডাক্তার ধরে আনতে। ওদিকে কলকাতার বড় হাসপাতালে নিয়ে যাবার তোড়জোড়ও চলছে।

লিওনের সঙ্গে বালিসোনার বিখ্যাত ডাঃ ভদ্র ঘরে ঢুকেই অম্বরীশের চোখের পাতা টেনে নামিয়ে একপলক দেখে রোগীর বুকের ওপর থেকে তোয়ালে সরিয়ে ঝুঁকে পড়ল।

'ব্লাড সিপেজ কতক্ষণ চলছে? প্রথম কখন জানা গেল?'

অম্বরীশ নির্বাক চোখ মেলে শূন্য দৃষ্টিতে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছে। মনে হয় তন্ময় হয়ে কিছু ভাবছে।

'জ্বালা বা চুলকুনি বা কোনওরকম ব্যথা আছে?'

অম্বরীশকে এবারও নিরুত্তর দেখে মিতা বলল, 'উনি নিজে কিছু বলেননি, আমাকেও জানাননি। কিন্তু তোয়ালের দু-পিঠেই প্রচুর শুকনো ও ভিজে রক্ত দেখে মনে হচ্ছে কাল রাত থেকে শুরু হয়েছে। রাতে সেই যে শুলেন, তারপর আর একবারও ওঠেননি। উঠলে আমি জানতে পারতাম। বাথরুমে যাবার দরজাই উনি নিজের হাতে খুলতে পারেন না।'

ডাক্তার আরও কয়েকটি জিনিস পর্যবেক্ষণ করে সরাসরি মিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনও কারণে খুব কি ভয় পেয়েছেন?'

'ভয় কিনা জানি না, তবে ইদানিং প্রায় রোজই দেখছি রাতে ঘুমের মধ্যে ওঁকে বোবায় ধরছে। একটানা গোঁ গোঁ শুনে জেগে গিয়ে বুকের ওপর জড়ো করে রাখা হাত দুটো

ছাড়িয়ে দু-পাশে নামিয়ে দেবার পর বোবায় ধরা ছেড়ে যায় । আশ্চর্যের ব্যাপার, কাল রাতে বেশ কয়েকবার ওঁকে বোবায় ধরেছিল । তখনও রক্ত আমার চোখে পড়েনি, হয়তো আমাকে দেখাতে চাননি ।'

প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে ডাক্তার বললেন, 'ওষুধে রক্ত বেরনো বন্ধ না হলে, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কয়েকটা ক্লিনিক্যাল টেস্ট করতে হবে । কালকের দিনটা দেখে পরশু আমাকে খবর দেবেন ।'

ওষুধের সঙ্গে টোটকাও চলল । সারা গায়ে গাঁদাপাতার রস, ঢোলকলমির রস পাল্টাপাল্টি করে লাগিয়েও ঘামের মতো রক্তোচ্ছ্বাস একটুও বন্ধ হল না ।

পরীক্ষিৎ সারা রাত বাবার বিছানার পাশে বসে ফটকিরি দেওয়া জলে তোয়ালে ভিজিয়ে বার বার তার গা-হাত-পা মুছিয়ে দিল ।

প্রথমদিনই সে হাসপাতালের গাড়ি ফিরিয়ে দিয়েছিল, এবার একদিনের জায়গায় তিনদিনেও রোগের সামান্য উপশম হল না দেখে যখন কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া স্থির, তখনও পরীক্ষিৎ সবাইকে নিরস্ত করল । তার যুক্তি, বাদা ছেড়ে দূরে গেলে বাবা বাঁচবেন না ।

উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় দিনে দিনে মিতার কথা কমে আসছে । গলার স্বরও ক্রমশ আরও মৃদু । পরীক্ষিৎ শুনতে পায়, মিতা বলছে, 'বাদা থেকেই একটা কুবাতাস বইছে ।'

কলকাতা থেকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা এসেও রোমকূপ থেকে বিন্দুবিন্দু ঘামের মতো রক্ত ফুটে বেরনো বন্ধ করতে পারলেন না । নামকরা এক ডার্মাটোলজিস্টের পরামর্শে লোশনে ভিজিয়ে গজ দিয়ে অম্বরীশের আপাদমস্তক জড়িয়ে দেওয়া হল । মিতা আর একজন নার্স মিলে দিনে বেশ কয়েকবার ব্যান্ডেজ বদলে দিলেও গজ আবার নতুন করে রক্তে ভিজে যায় ।

ভোরের বাতাসে জানলা দিয়ে ভেসে আসা স্বর্ণচাঁপার গন্ধ চিনতে পেরে অম্বরীশ দুর্বল গলায় বলল, 'বাদায় স্বর্ণচাঁপার গাছও হতে পারে ।'

রাতের নার্সের সঙ্গে দিনের নার্সের ডিউটি-বদলের সময় হঠাৎ কথাটা শুনে দুজনে চোখাচোখি করল । শেষ রাতে বদলানো গজও রক্তে ভেজা । মিতার সাহায্য নিয়ে দুই নার্স অম্বরীশকে বার বার এপাশ-ওপাশ করিয়ে তার সারা শরীর তিন-চার ফেরতা গজ দিয়ে মুড়ে দিল ।

সরোজিনীর সঙ্গে পরীক্ষিৎ ঘরে ঢোকা মাত্র তার মন বিষাদে ভরে যায় । ঠিক একটা মমির মতো দেখাচ্ছে তার বাবাকে!

রাত গভীর হলে অম্বরীশকে ঘুমোতে দেখে নার্সও ঘুমোয় । অম্বরীশ তখনই আবার জেগে ওঠে । অপেক্ষা করে, ঝুল বারান্দায় কখন কংকালদের লাফিয়ে নামার শব্দ হবে ।

বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে হল না, নিয়মমতো সাত কংকাল ঘরে ঢুকে এলে সেও অভ্যাসমতো বার্মা টিকের বেঞ্চি এগিয়ে দিল।

অনেকদিন পর আবার তারা একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে কথাবার্তা শুরু করল। 'মাটির বিষয়ে আপনি কতটুকু কী জানেন কত্তা?' বলে তারা অম্বরীশের উত্তরের অপেক্ষায় বসে বসে পা নাচাতে লাগল।

অম্বরীশ অনেক ভেবে উত্তর দিল, 'মাটির নীচে ধনসম্পদ, ওপরে চাষবাস।'

'ভুল কথা। মাটির নীচে মানুষের হাড়গোড়, ওপরে মাটির জন্যি মারামারি। রোজই খাতি-নাতি বেলা যায় বলে জীবনকালে কথাটা কেউ বুঝতি চায় না। মাটির সার কথাটা কী জানেন কত্তা? তার এক মুঠোও কেউ ওপারে নে যাতি পারে না। এক মুঠো কী কই কত্তা, এক কণা মাটিও নিজের বলি সঙ্গে নিতি পারে না।' আবার চুপচাপ খানিকক্ষণ পা নাচিয়ে, 'প্রমাণ দেখতি চান কত্তা? তালি এট্টু কষ্ট করে আপনাকে আমাদের সঙ্গে আসতি হবে।'

সকলে মিলে অম্বরীশকে দাঁড় করিয়ে দিল- 'এট্টু পা চাল্যে চলুন কত্তা, নিজ-চোখেই প্রমাণ দেখতি পাবেন।'

সাত কংকাল তার বুকে চেপে বসছে না দেখে অম্বরীশের ভয় কেটে যায়, গলায়ও অনেকটা জোর পাচ্ছে, নির্দ্বিধায় বলল, 'যাব যে, আমি তো ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে পারি না!'

'আমাদের দুজনের ঘাড়ে আপনার দুই বগল চেপে আমাদের ওপর ভর দিয়ে চলুন, এট্টু খরখর যেতি হবে।'

এভাবে হাঁটতে তার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। মেদ-মাংস ঝরে গিয়ে শরীরও এখন অনেক হালকা।

অম্বরীশের আরোগ্যের সব আশা মিথ্যে হয়ে যেতে দেখে মিতাকে এখন আর এ ঘরে রাত জাগতে দেওয়া হয় না, খুব ভোরে এসে অম্বরীশের খবর নিতে এসে শূন্য বিছানা দেখে সে চিৎকার করে উঠল। দূরে ঘরের কোণে চেয়ারে ধরফড় করে জেগে উঠে নার্স এদিক ওদিক দৌড়োদৌড়ি করে। অনেক দিন থেকেই উঠে বাথরুমে যাবার ক্ষমতা নেই, সবসময় তাকে বেডপ্যান দেওয়া হয় জেনেও সে বাথরুমের ভেতরটা দেখে এল। সবাই মিলে বাড়ির সব ঘর-বারান্দা খোঁজা হল, অম্বরীশ কোথাও নেই। নার্স ভেবে পায় না, ঘর, বারান্দা আর বাইরের গেটের দরজা উনি খুললেন কী করে?

নানা দলে ভাগ হয়ে চারদিকে খোঁজাখুঁজি করতে করতে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষিৎই প্রথম তার বাবাকে দেখতে পেল। বাদায় যেখানে নতুন খোঁড়া মাটির ছোট একটা ঢিবি আছে, সেই ঢিবিতে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় জ্ঞানহীন অম্বরীশ যেন শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। শরীরের ব্যান্ডেজ গোলাপের পাঁপড়ির মতো হালকা রঙে ছোপানো।

গ্রামীণ হাসপাতালের নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্সে তাকে প্রথমে সেখানেই নেওয়া হল। ধুলোকাদা পরিষ্কার করে নতুন করে ব্যান্ডেজে আপাদমস্তক মুড়ে তাকে নিজের ঘরে ফিরিয়ে আনতে বিকেল হয়ে গেল। সকলেরই প্রশ্ন, বাদায় অম্বরীশ এল কী করে? এ কি ঝম্পটির ছেলেদের কাজ?

জ্ঞান ফিরলেও অম্বরীশ আগের মতো দুয়েকটা কথাও আর বলে না। তার চোখ কোটরে, গালে মাংস নেই, ব্যান্ডেজ বদলাবার সময় চামড়ার নীচে হাড় গোনা যায়।

একদিন বিকেলে অবনীর গলা শুনে, অম্বরীশের ঘুম ভেঙে গেল। অবনী তার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'তোর এ কী চেহারা হয়েছে! কোথায় তোর কষ্ট আমাকে বল।'

চোখ খুলে দেখে সত্যিই অবনী। মুখ রোদে পুড়ে তামাটে, মাথার চুল ছাইরঙা।

অনেক কাল পর অম্বরীশ মনের মধ্যে আরাম বোধ করল। অদ্ভুত একটা আশায় সে তার ব্যান্ডেজ বাঁধা ডান হাত অবনীর দিকে বাড়িয়ে দিল। গজ খুলে হাতের রক্তখচিত রোমকূপ খুঁটিয়ে দেখে সেদিনই রাতে বিছানার পাশে বসে অবনী তাকে এক ডোজ হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাইয়ে দেয়। অম্বরীশ অতি কষ্টে তার হাত ধরে থেকে বলল, 'আগে যেদিন এসেছিলি, তোর লম্বা চুলদাড়ি দেখেছিলাম, আমাকে ওষুধ দিবি বলেও না দিয়ে চলে গেলি। অনেক খুঁজেছিলাম তোকে। কেউ নাকি তোকে দেখেনি। কে জানে হয়তো স্বপ্ন দেখেছি।'

প্রায় চিঁচি করে কথা বলছে। অবনী বলল, 'তোর স্বপ্নেই এসেছিলাম।'

অনেকদিন পর অম্বরীশ অনেক কথা বলতে চায়। গলার স্বর প্রায় শোনা যায় না, মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে বুঝতে হয়। 'ছোড়দা, তোর সেই লম্বা চুলদাড়ি কেটে ফেলেছিস? তুই কি সন্ন্যাস ত্যাগ করে এসেছিস?'

'সন্ন্যাসী আর হলাম কই! হব বলেই বাড়ি ছেড়েছিলাম। তারপর অনেক ঘুরেও মনের মতো গুরু পেলাম না, ফলে সন্ন্যাসী হওয়া আমার হল না। হলাম ভবঘুরে। ভারতের পথে পথে মানুষের কত যে দুঃখ-দুর্দশা দেখলাম, একজীবনে বলে শেষ করা যায় না।'

অবনী সত্যিই ফিরে এসেছে খবর পেয়ে স্কুলের স্পেশ্যাল ক্লাস শেষ করে হোস্টেলের দিকে না গিয়ে সরোজিনী বাড়ি ফিরে এল। অবনীমোহনকে নিজের ঘরে ডেকে এনে তার একটা হাত হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। মাঝে মাঝে চোখ তুলে অবনীর বদলে যাওয়া মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

পরীক্ষিৎ ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাঙাজ্যাঠাইমাকে এভাবে আগে কখনও দেখেনি। অবাক হয়ে কিছু বলবার আগেই সরোজিনী বলল, 'আয়, কাছে আয়। জ্যাঠার সামনে এসে বোস।'

'এ তো যৌবনের অম্বরীশ! হুবহু সেই মুখ। তোমার মাকে একবার ডাকো তো বাবা।'

'আপনিই আমার সেই সন্ন্যাসী জ্যাঠা? বাবার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি।'

‘সন্ন্যাসী না রে, পর্যটক । পদযাত্রী । কখনও দুপায়ে, কখনও দুচাকায়, কখনও রেলে-বাসে, বিশাল এই ভারত ঘুরে বেড়িয়েছি ।’

‘আপনার কাছে আমি আপনার ভারত দর্শনের কথা শুনতে চাই ।’

মিতা স্কুলে খবর পেয়ে ঝড়ের মধ্যে কুটোর মতো উড়ে এসে বলে উঠল, ‘দাদা, আপনি আমাদের বাঁচান । আমাদের মাথার ওপর কেউ নেই । দিদিই শুধু তার সর্বশক্তি দিয়ে যেটুকু পারছেন সবাইকে আগলে রেখেছেন ।’

‘অম্বরীশকে আমি ওষুধ দিয়েছি । ধৈর্য ধরো ।’

অবনীমোহনের আশ্চর্যজনক প্রত্যাবর্তনের খবর সকলের কাছে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল । লক্ষ্মী লিওন মেয়েকে নিয়ে সে রাতে আর নিজেদের বাড়ি ফিরল না । সরস্বতীপ্রতিমা ও প্রদীপও শিগগিরই এসে পড়বে, তাদের টেলিগ্রাম করা হয়েছে ।



১৮

বাবুইপাখি যেভাবে জোনাকি ধরে, দিবাকর চেষ্টা করে দেখেছে মানুষের পক্ষে সেভাবে জোনাকি ধরা সম্ভব নয় । বিয়ের তৃতীয় সপ্তাহে দিবাকর একদিন তাদের গাছবাড়িতে সন্ধে থেকে বহু কসরৎ করে তিনটি জোনাকি পোকা ধরে শুতে যাবার আগে মাথার কাছেই মাটির মালসায় একদলা কাদার মধ্যে গুঁজে দিয়ে কেরোসিনের লম্ভ এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিল । দপ করে জ্বলে ওঠা জোনাকির নরম আলোয় দুজনে দুজনের মুখ দেখে ছেলেমানুষের মতো খুশি । পরের মুহূর্তেই অন্ধকার, সেও ভারি খুশির ব্যাপার । দুয়েক মুহূর্ত দেখে নিয়ে নন্দিনী বলল, ‘পুজো প্যান্ডেলে টুনি বাল্বের মতো কীরম জ্বলছে-নিভছে, রোজ এমন করা যায় না?’

‘রোজ এর’ম গঙ্গাযমুনা হলে রোজই তোমায় আমি ঘরের মধ্যে একসঙ্গে অমাবস্যা-পুন্নিমে দেখাব ।’

আরেকদিন মালসার মধ্যে কাদায় জোনাকির মাথা গুঁজে রেখেও কেরোসিনের আলো না নিভিয়ে বিছানায় গিয়ে দিবাকর নন্দিনীকে বলল, ‘তোমার সৃষ্টিযন্ত্র ভালো করে দেখবার আমার বড় সাধ ।’

‘ছিঃ!’

‘ছি কেন? ভগবান কত বড় কারিগর ভাবো তো! তার হাতের কাজ দেখতে ইচ্ছে হয় না?’

উভচর সাইকেলের কাজ যত এগোয় নন্দিনীর প্রতি দিবাকরের আবেগ তত উথলে ওঠে । একদিন রাতে শুতে এসে বলল, ‘শিবলিঙ্গ আসলে কী তুমি জানো? যোনিপটে লিঙ্গ স্থাপন । সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রতীকী যন্ত্র ।’

‘ভারি অসভ্য তুমি!’

কথাটা হয় শুনতে পায়নি, নয় তো গায়ে মাখেনি, খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকার পর দিবাকর আবার বলল, ‘তোমার পট আমি দেখেছি । অনেকটা অপরাজিতা ফুলের মতো ।’

দুম দুম করে দিবাকরের বুকে পিঠে কিল মারতে মারতে নন্দিনী বলল, 'অসভ্য, অসভ্য, অসভ্য! ভীষণ অসভ্য তুমি!'

গাছবাড়িতে যতক্ষণ দুজনে একসঙ্গে থাকে ততক্ষণ তাদের আনন্দের সীমা থাকে না। একা থাকতে নন্দিনীর খুব ভয়। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-নামতেও সাহস পায় না। জোয়ারে যখন দ্বীপ ডুবে যায় তখন দিবাকরকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করে না।

শুখা চিংড়ির ব্যাপারে বা বাঁশবনের বাড়িতে উভচর সাইকেল তৈরির কাজে যখনই দিবাকরকে বালিসোনা যেতে হয়, নন্দিনীকে সঙ্গে নিতে হয়। দ্বীপ থেকে নৌকোয় ডাঙায় আসা, সেখান থেকে কাজের তদারকি সেরে বাসে নদীতীর, তারপর নদী পেরনো, তারপর আবার বাস, তারপর ট্রেন- ভোরে রওনা হয়ে বালিসোনায় পৌঁছতে দিনের আলো মুছে যায়। প্রত্যেক যানবদলের জায়গায় অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে দিবাকর নন্দিনীকে বলে, 'আমার সাইকেল ঠিকমতো হয়ে গেলে সাইকেলেই নদীর ওপর দিয়ে উড়ে যাব।'

অবনীমোহনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের পর নন্দিনীকে চৌধুরীবাড়িতে রেখে দিবাকর কিছুদিন একাই তার গাছবাড়ি থেকে বালিসোনা থেকে যাতায়াত করে।

যেদিনই বালিসোনায় আসে চৌধুরীবাড়ি একবার ঘুরে যাবেই। নন্দিনীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটানো ছাড়াও অবনীমোহনের কাছেও তার একটা প্রশ্ন আছে।

নন্দিনীই তাকে বাড়ির আর সকলের সঙ্গে বসিয়ে দেয়। সেখানে লিওনের সঙ্গেও প্রায়ই দেখা হয়। একদিন লিওন অবনীমোহনকে তার উভচর সাইকেলের কথা বলল- 'আমাদের এই ব্রাদার-ইন-ল আকাশে-মাটিতে চলবার মতো একটা সাইকেল বানাচ্ছে।'

দিবাকরের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে লিওনের দিকে তাকিয়ে অবনী বলল, 'আমাদের দরকার আসলে নতুন চিন্তা, নতুন কল্পনা। যে বালিসোনা আমি ছেড়ে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে সেই বালিসোনাকে আর খুঁজে পেলাম না। অম্বরীশের পায়ের ক্ষত দেখলেই বোঝা যায় বালিসোনায় পচন কতদূর ছড়িয়েছে। আগে এখানে কত দেয়ালপত্রিকা দেখতাম। তরুণরা কবিতা লিখত, রাগের কথা লিখত, প্রেমের কথা লিখত, সুখ-দুঃখের কথা লিখত।'

'শিবকৃষ্ণবাবুও একজন কবি ছিলেন, যৌবনে তাঁর বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছিল। দেওঘরের বাড়ি বিক্রির সময় উইয়ে কাটা কয়েকটা কবিতা সঙ্গে এনেছিলেন।'

মিতার কাছে এ তথ্য শুনে সরোজিনী যোগ করে, 'বালিসোনায় তখন আরও কেউ কেউ কবিতা লিখতেন, তাঁদেরই কেউ কবিতায় লম্বা লম্বা চিঠি লিখতেন আমাকে। কবির নাম থাকত না।'

ফিরে আসার পর এই প্রথম অবনীর মুখে হাসি দেখা গেল- 'আমাদের সংসারে তখন তোমার ওপর এমন অবিচার অত্যাচার চলত, ভয়ে নামটা আর লিখতাম না।'

'তুমি! তুমি লিখতে ওসব!'

দিবাকর হঠাৎ বলে উঠল, 'রাস্তায় চলে, আকাশেও ওড়ে এমন কোনও বাহন কোথাও আপনি দেখেছেন?'

কোনও উত্তর না দিয়ে অস্বস্তিকর দীর্ঘ নীরবতার পর অবনী দুচোখ বুজে দূরাগত স্বরে বলল, 'যন্ত্র না, মন্ত্র খুঁজি আমি। বালিসোনায় ফিরে দেখছি হাত থেকে পড়ে যাওয়া মহার্ঘ গ্লাস-পেইনটিঙের মতো মানুষের সব মূল্যবোধ ভেঙে চুরমার, হালভাঙা মাঝির মতো তারা দিশাহারা।'

'বিজ্ঞানের এত উন্নতি, এমন নিত্যনতুন আবিষ্কারের সুফল সকলের জীবনে সহজলভ্য হলেই কি সমাজেরও উন্নতি হবে না?'

চোখ বোজাই রইল। লিওনের প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া গেল না।

সবাই চলে গেছে, ঘরে শুধু লিওন একা। অবনীর মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে।

ক্রাচের শব্দে চোখ খুলে অম্বরীশকে দেখে, কিন্তু লিওনের চোখে চোখ রেখে অবনী বলল, 'বিজ্ঞান শুধুই প্রযুক্তি নয়, বাবা। জাপানে জার্মানিতে আমেরিকায় টেকনোলজির ঝোড়ো বিকাশ দেখছ তো? মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, মন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। ধর্ম ও দর্শনের মতোই বিজ্ঞানও জগৎ ও জীবনের সত্য খোঁজে, অর্থ বুঝতে চায়। এ যেন দুটো নদী অনেক দূর অবধি আলাদা বয়ে মহাসাগরে গিয়ে মিশে যায়।'

অবনীর ওষুধে রোমকূপ থেকে রক্ত বেরনো সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়াকে অম্বরীশ অলৌকিক ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না। সেই থেকে সে অবনীকে দৈব ক্ষমতার অধিকারী আধ্যাত্মিক পুরুষ রূপে দেখে। বরাবরের মতো এখন আর তার ছোড়দাকে তুই-তোকারি করে কথা বলতে পারে না। তার আশা, গ্যাংগ্রিন হয়ে যাওয়া তার পায়ের ক্ষতও একদিন অবনী সারিয়ে দেবে। ক্ষতের জন্য অবনী তাকে নিয়মিত ওষুধ খাওয়ায়, কিন্তু আরোগ্যের আশ্বাস দেয় না। হাঁটু ও উরুর ক্ষত সামলিয়ে চেয়ারে বসে অম্বরীশ বলল, 'আমার মাথায় কী ঘুরছে জানো? বালিসোনার সবাইকে রাসমাঠে ডেকে এখানকার বিপদ-আপদ তুমি তাদের বোঝাও। এ থেকে উদ্ধারের উপায় বলে দাও।'

লিওন উৎসাহিত হয়ে বলল, 'খুব ভালো কথা। খুব ভালো আইডিয়া। আইডিয়ার বাংলা কী হবে? তবে, বেশির ভাগ বাঙালিকে 'আইডিয়া'ই বলতে শুনেছি। বালিসোনার মানুষকে আপনার ভারতযাত্রার বিপুল অভিজ্ঞতার কথাও বলবেন।'

সমর্থন পেয়ে অম্বরীশ আরও বলল, 'বালিসোনার অবস্থা ভাবতে পারবে না। বোমা এখন কটেজ ইন্ডাস্ট্রির মতো, ঘরে ঘরে তৈরি হচ্ছে। যৌবনে আমিও কিছু কিছু পাপ করেছি। পরে অনুতাপও করেছি। এখন তো গোঁফ গজানোর বয়েস থেকেই ছেলেরা দাদাদের কাছে শয়তানির অ্যাপ্রেন্টিসশিপ শুরু করে। তোমার কথায় হয়তো বালিসোনার

মানুষ আবার আগের মতো সরল আর দয়ালু হয়ে উঠবে। তোমারও কি তাই মনে হয় না, লিওন?'

'মানুষের হৃদয় অত সহজে বদলাবার নয়। তাছাড়া বালিসোনায় এখন বহিরাগতই বেশি। তবে কিছু করতে হলে বাবাকেই করতে হবে। পারলে তিনিই পারবেন।'

বাড়ির পুবদিকের গোলাপজাম বাগানে অম্বরীশকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে পারমিতাই প্রথম দেখতে পেল কোণের ঝোপঝাড়ের মাথায় প্লাস্টিকের ছাউনি টাঙিয়ে কয়েকজন বাসা বেঁধেছে। একটা প্লাস্টিকের চাদরের ওপর মাছধরার বড় জাল ছড়ানো। পাশেই খোলা আকাশের নীচে কাঠকুটো জ্বালিয়ে রান্নাও চলছে। তাদের কাছে যাবার আগে দুটি মেয়ে দৌড়ে এসে অম্বরীশের পায়ের সামনে দণ্ডীকাটার মতো উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। দুজনের বয়সই তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, দেখে মনে হয় এরা যমজ বোন, তাদের একজন উবু হয়ে বসে যা বলল তার মর্মার্থ এইরকম- বাদার পশ্চিমে মুসলমানপাড়ার সীমানায় তাদের বাড়ি থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। মিতা জানতে চাইল- কে উচ্ছেদ করল, উচ্ছেদের কারণ কী?

দু'দেশের সীমান্ত পার হয়ে রোজই দলে দলে লোক ওপাড়ায় তাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের বাসায় ওঠে। কোত্থেকে কী করে তারা রেশনকার্ড করিয়ে এদেশের ছিটিজেন হয়ে যায় সেকথা তারাই জানে। মাথা গোঁজবার জায়গা হলেও পাড়ার মাত্র কয়েকটা পায়খানায় অত বাড়তি মানুষের চলে না, তারা অন্ধকার থাকতে উঠে দু'পাড়ার মাঝের অংশে মাঠ সারতে আসে। সে মাঠ ভরে গেলে তারা গাড়ুহাতে হিন্দুপাড়ার আরও ভেতরে ঢুকে পড়ে। এইভাবে তারা এগিয়ে আসতে থাকে। দুর্গন্ধের জন্য কেউ প্রতিবাদ করতে গেলে পরদিন ভোররাতে তার উঠোনেই তারা বসে যাবে। দুই বোন আর তাদের জন্মান্ধ ভাই আরও কয়েকজনের সঙ্গে প্রতিবাদ করেছিল। পরদিন সকালে তাদের সকলের ঘরদোর উঠোন নরক হয়ে গিয়েছিল। রোজ এই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দুই বোন স্থানীয় এম-এল-এ-র বাড়ি গিয়ে তাঁর চামচার কাছে নালিশ জানিয়ে ফিরছিল। পথে একদল ছেলে তাদের মারধর করে বাড়িতেই আর ফিরতে দেয়নি। এক বোন বলল, 'আরও যারা তাড়া খেয়ে আপনাদের বাগানে ছাউনি করেছে, তাদের ঘরের ব্যাটাছেলেরা আজ লাঠি-সড়কি নিয়ে ঘর-দরজার দখলদার হটাতে গেছে।' আরেক বোন বলল, 'আপনারা আমাদের মা-বাপ, আপনাদের দয়াতেই বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে আমরা সুখে-দুঃখে এখানে বাস করছি। এখন এরা শুধু হেগেই আমাদের ভিটেছাড়া করেছে, এবার গ্রামছাড়া করবে।'

মিতার শিক্ষকসত্ত্বা জেগে ওঠে- 'সব কিছুতে হিন্দু-মুসলমান দ্যাখো কেন? মানুষ-অমানুষ ভাবতে পারো না? অমানুষের কি ধর্ম থাকে?'

অম্বরীশের হাঁটুর জ্বালা বেড়ে গেছে, উরুর অসহ্য ঝিঁঝিঁ হুল ফোটাচ্ছে, দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণার কাঁপুনি সামলে জিজ্ঞেস করল, ‘থানায় জানিয়েছ?’

‘আমাদের বাপ নেই, সোয়ামী নেই, ঘরে ব্যাটাছেলে বলতে ওই এক ‘জন্মান্ধ’ ভাই, থানায় কে যাবে? আমাদের থানায় যাবার সাহস নেই ।’

মিতা সহানুভূতি থেকে জানতে চাইল, ‘তোমাদের সোয়ামীরা কোথায়?’

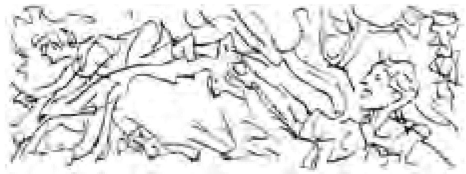
‘আমাদের দুই বোনের একজনই সোয়ামী । এদিককার নদীতে মাছ না পেয়ে আসামের বেম্মপুত্তুরে সেই যে গেছে, তিন বছর হয়ে গেল আর খবর নেই ।’ কথা বলল একজন, কথার শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলল একসঙ্গে দুজনই ।

এক বোন ভাইকে নিয়ে রয়ে গেল, আরেক বোনকে সঙ্গে নিয়ে মিতা একাই থানায় ডায়রি করতে গিয়ে দেখে দুজন মাত্র কনস্টেবল বসে আছে ।

মিতার মুখে সঙ্গের মেয়েটির লাঞ্ছনার বিবরণ শুনে, পুলিশের উত্তর- ‘যান, এবার নিজের বাড়ি ফিরে যান । ওই মুসলমানপাড়াতেই পুলিশ রেইড করতে গেছে । এখন আর তারা কিছু করতে সাহস পাবে না ।’

মিতা জানতে চাইল, ‘যারা মার খেয়ে ঘর ছাড়া, তাদের অভিযোগ পেয়েই কি পুলিশ গেছে?’

‘অভিযোগ তো এই প্রথম আপনিই করলেন ।’ নির্জন থানায় পুরুষসঙ্গীহীন দুই মহিলার উপস্থিতিতে উৎসাহিত হয়ে সে জানাল, ‘পুলিশ রেইড করছে স্মাগলারদের গ্যাং ধরতে । স্পেশ্যাল ফোর্সও সঙ্গে আছে ।’



১৯

ঋতু আসে, ঋতু যায় । আকাশ-বাতাসের ভাষা বদলায় । স্বভাব বদলায় । প্রকৃতির স্পর্শ গায়ে এসে লেপটে যায় । বালিসোনার ভাগ্যাকাশের মেঘ পাথরের মতো, তার আর নড়চড় নেই ।

পাউরুটি কারখানা বন্ধ, মাটি খোঁড়ার কাজ বন্ধ, শ্রমিকদের মধ্যে যারা আগে পুরসভার মেথর ছিল তারা কেউ কেউ হাসপাতালের মেথর বা স্কুলে বাজারে নার্সিং হোমে ঝাড়ুদার হয়ে গেল । তারা বেশির ভাগ রোজ বাদায় এসে অর্ধেক খোঁড়া মরা নদীর দুধারে সারি দিয়ে বসে থাকে । আবার কাজ শুরু হবার আশায় শুধু নলকূপের জল খেয়ে সারা দিন কাটিয়ে সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে যায় । যাবার আগে কোনওদিন গুজব শোনে, সবাইকে বাদার উঁচু অংশের জমিতে কলাচাষ করতে দেওয়া হবে । কোনও দিন রটে, বাস রাস্তার ধারে সারি সারি মুড়কি-বাতাসার দোকান করে দেওয়া হবে । আজকাল প্রচুর বাইরের গাড়ি আসে, সেসব গাড়ির যাত্রীরা যাতায়াতের পথে বালিসোনার বিখ্যাত বাতাসা কিনে নিয়ে যাবে । এ অঞ্চলের চিনির বাতাসা ও নলেনগুড়ের মুড়কির খুব খ্যাতি ।

একদিন বাদা থেকে ঘরে ফেরার মুখে হঠাৎ জনা কুড়ি যুবক এসে শ্রমিকদের ঘিরে ধরল । তাদের চমকে দিয়ে জানতে চায়, ‘তোমরা কাজ চাও?’

কী কাজ? কোথায় কাজ? টাকা পাওয়া যাবে তো? মনে সন্দেহ, তবু কৌতূহলী দিনমজুররা প্রশ্ন না করে পারল না ।

অচেনা যুবকদল জানাল- সকলেই কাজ পাবে । প্রথমে কিছুদিন ট্রেনিং, তখন বিনাপয়সায় তিনবেলা পেটপুরে খাওয়া, ট্রেনিং হয়ে গেলে থাকা-খাওয়া ছাড়াও মাস-মাস বেতন । অনেকটা আর্মির কাজের মতো ।

শুনে তরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ।খালিহাতে ঘরে ফিরে রোজই সেই একই হতাশা ও গালমন্দ । তার চেয়ে অজানা কাজের আশায় ভিন গাঁয়ে চলে যাওয়া ভালো!

সবাই বাদা পেরিয়ে, রেললাইন পেরিয়ে, বন পেরিয়ে যুবকদলের আদেশে এই প্রথম এক জায়গায় এসে থামল । যুবকদের চারজনের হাতে রিভলবার ।

'তোমাদের ভয় নেই। আমাদের কথা মতো চললে তোমাদের লাভই হবে।'

একজনের এই আশ্বাসবাণী শেষ হবার আগেই চারটি বাগানো রিভলবারের সামনে দশ-বারোজন যুবক এগিয়ে এসে শ্রমিকদের প্রত্যেকের চোখ বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'কেউ চেঁচাবে না। একটু পরে আমরাই বাঁধন খুলে দেব। এসো, আমাদের হাত ধরে চলো।'

মাঝ রাতে গভীর জঙ্গলে পৌঁছে তাদের চোখের শক্ত বাঁধন খুলে দেওয়া হল। সে রাতে পেট ভরে গরম শাক-ভাত খেয়ে গাছের নীচে শুকনো পাতার আস্তরণে মাথা রেখেই ঘুম।

পরদিন ভোরে গুড়-মুড়ি খেয়ে শুরু হল তাদের প্রশিক্ষণ। লেফট-রাইট, হাত উঠাও, সামনে হাঁটো, পিছে হাঁটো, দৌড় লাগাও, উপুড় হয়ে শুয়ে যাও, এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াও, গাছে চড়ো, কাঠবিড়ালীর মতো শাখা বেয়ে চলো, লুকিয়ে পড়ো, বাঁদরের মতো এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফাও- প্রথম কিছুদিন এইসব চলল। পরে ক্রমশ লাঠি খেলা, তলোয়ার চালানো, তীরধনুক বর্শা হ্যান্ড গ্রেনেড ছোঁড়া, বন্দুক চালানোয় হাত পাকানোয়। যে যে-অস্ত্র ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারে তাকে সেই অস্ত্রের আলাদা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেরাদের বেছে নেওয়া হয় অ্যাকশান স্কোয়াডে অংশ নিতে।

চোখ, নাকের ফুটো ও ঠোঁট বাদে আগুনঝরা জ্যৈষ্ঠদিনের মতো সারা মুখ-মাথায় পুরু গামছা বাঁধা বড় এক নেতা এসে একদিন বলল, 'তোমাদের দুঃখদারিদ্র্য দূর করার ক্ষমতা চৌধুরীদের নেই, পুরসভার নেই, কোনও সরকারেরও নেই। তাদের শুধু শাসন আর শোষণ ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতা থাকলেই গরিবের দুঃখ-কষ্ট তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার অধিকার থাকে। গরিব চাষি, তাঁতি, মজুর, পাতা-কুড়ুনি- সকলের সঙ্গে থেকে আমরা তাদের শক্তি জোগাব, অস্ত্র জোগাব। সবাইকে লড়াই করতে হবে। মনে রেখো, যখন যেমন নির্দেশ পাবে সেইমতো তোমাদের তা পালন করতে হবে। তোমাদের সকলের নাম, বাড়ির লোকের নাম, কোন পাড়ার কোথায় বাড়ি, সব আমাদের কাছে লেখা আছে। মাসে মাসে প্রত্যেকের বাড়িতে ডাকপিওনের ছদ্মবেশে তোমাদের ভাতা পৌঁছে দেওয়া হবে। ভাতা বলো আর বেতন বলো আর সাহায্যই বলো, এ শুধু তোমাদেরই দেওয়া হচ্ছে। আমরা তোমাদের পাশে আছি। কোনওরকম চালাকি বা বিশ্বাসঘাতকতা বা পুলিশের চরবৃত্তির শাস্তি কিন্তু একটাই- মৃত্যু।'

পাশাপাশি তিন গ্রামের তেইশজন জোয়ান ছেলে বাদায় কাজে গিয়ে আর ফেরেনি দেখে তাদের স্বজনরা দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে দিন কাটায়। প্রতিবেশীরাও অজানা আশংকায় দিশাহারা। সংক্রামক ব্যাধির মতো তিন গ্রামের ভয় আশপাশের গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ল। একমাস পর ডাকপিওনের কাছ থেকে ছেলেদের পাঠানো টাকা পেয়ে আশায় আনন্দে তারা বুক বাঁধলেও এতগুলো ছেলের একসঙ্গে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া এবং এতদিনে কারও কোনও খবর না পাওয়ায় গ্রামবাসীদের মনের শংকা থেকেই যায়। যে তিন

বাড়িতে ছেলেরা টাকা পাঠায়নি সেই তিন বাড়িতে গ্রামে পিওন আসার দিন থেকে সূর্যাস্তের পর আর আলো জ্বলে না ।

সেদিন থেকেই নিতাই আকুলির উঠোনে দিনের আলোয় রাতের আঁধারে নাতির জন্য তার বুড়ি মার বিলাপ শোনা যায় । দু-হাত দু-পায়ে মোট যত আঙুল, তার চেয়েও কম বয়েস নাতিটার ।

বিলু যেদিন নিরুদ্দেশ হল সেদিনই বৈরাগীবাড়ির হাঁসু বৈরাগী বাদার পাঁক ঘেঁটে অনেকদিন পর বড় একটা শোল পেয়েছিল, বিলুর মা ছেলের পছন্দমতো অসময়ের মুলো দিয়ে এক কড়াই ঝোল রেঁধে সারা রাত ছেলের পথ চেয়ে বসে ছিল । ছেলেকে না পেয়ে সেই ঝোল তারা খায়ওনি, ফেলেওনি । পিওনকে পাশের বাড়িতে টাকা দিয়ে তাদের ঘরের সামনে দিয়ে চলে যেতে দেখে সর-পড়া, পচা শোলমাছের কড়াসুদ্ধ উঠোনে তিনটে ছানা বেষ্টিত একটা কুকুরের সামনে ঢেলে দিল ।

তৃতীয় জন দুখিরাম, বিছানায় লেপটে থাকা তার বাবা কিছুদিনের মধ্যেই হাঁপরের মতো শ্বাস নিতে নিতে একসময় শেষবারের মতো বালিসোনার বাতাসটুকু আর নিতে পারল না ।

এরা কেউ জানে না, প্রথম সপ্তাহেই তাদের তিন ছেলে পালাতে গিয়ে জঙ্গলে পথ হারিয়ে পিছন থেকে বন্দুকের গুলি খেয়ে মারা গেছে ।

ঘোড়াপোষা গ্রামের হারান পই ছেলের পাঠানো টাকায় প্রথমেই নিজেদের জন্য চাল-নুন ছাড়াও তাদের ধান বইবার হাড়জিরজিরে বুড়ো ঘোড়ার জন্য এক বস্তা ছোলা কিনল । ছেলে হারিয়ে সামনের মঙ্গলবার চাষিদের বচ্ছরকার ঘোড়দৌড়ের লড়াইয়ে ঘোড়া নিয়ে যাবার আশা ছেড়ে দিয়েছিল, এবার ঠিক হল, পবন এর মধ্যে না ফিরলে, বারো বছরের নাতি ভোলা ঘোড়া ছোটাবে ।

হাড়ভাঙি গ্রামের ঢাংপাড়ার কেষ্ট ঢাং, নয়ন ঢাং দুজনেই ভৃঙ্গরাজ, ঘৃতকুমারী, শতমূলী, বিশল্যকরণীর লতা-পাতা বস্তা ভরে শহরের আয়ুর্বেদ ওষুধ-কারখানায় সরবরাহ করে কোনক্রমে সংসার চালায় । রহস্যময়ভাবে নিরুদ্দিষ্ট ছেলেদের কাছ থেকে টাকা আসায় তারা বেশি করে নয়নতারা ও ঘৃতকুমারী চাষের কথা ভাবে । একজন ফড়ে বলেছে দুইয়েরই এখন খুব চাহিদা, ভালো দামও পাওয়া যাবে ।

ছেলের পাঠানো টাকা পেয়ে গোপাল ধীবর মুদির দোকানের ধার মিটিয়ে, আবার ধারেই চাল নুন তেল কিনে ঘরে ফিরে দাওয়ায় বউয়ের সামনে বসে পড়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল । মালতী চমকে গিয়ে দুবছরের মেয়ে বিন্তির মুখ থেকে বুকের দুধ ছাড়িয়ে নেওয়ায় বিন্তি ভারি অবাক হয়ে বাবার দিকে একমুহূর্ত চেয়ে রইল, তারপর নিজেও কাঁদতে লাগল । মালতী গলা চিরে জিজ্ঞেস করল, ‘আমাদের কালবোস আর বেঁচে নেই,

তাই তো? তা-ই বলতেই এসেছ তো?’ কথার মধ্যেই আহত জন্তুর মতো হিংস্র আর্তনাদ করে উঠল ।



২০

বালিসোনায় এমন অদ্ভুত কুয়াশা আগে কেউ কখনও দেখেছে বলে বয়োবৃদ্ধরাও মনে করতে পারে না। সকাল আটটা শুধু ঘড়িতেই, ঘন কুয়াশায় ঢাকা চারপাশ দেখে বেলা বোঝাই যায় না। বকুলবেদি, শিরীষগাছ, ছাতিমবন, শিউলি-চাঁপা গোরস্থান সব কর্পূরের মতো উবে গেছে। গোটা বালিসোনা এক অসীম সাদা শূন্যতায় ঢাকা।

কুয়াশা ফুঁড়ে কে এই অসময়ে এসে চৌধুরীবাড়ির দরজার ভারি কড়া নেড়েই চলেছে, জানার উপায় নেই।

দরজা খুলে দরোয়ানের সঙ্গে বাইরে এসে ভণ্ডুল মানুষটার একহাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখে বুঝল একে আগে কোনওদিন দেখেনি। লোকটা ভরাট গমগমে গলায় বলল, 'এটা যদি অম্বরীশ চৌধুরীর বাড়ি হয়, তাকে গিয়ে বলো তার জাহাজের দোস্ত জাহাঙ্গীর এসেছে।'

মা-বাবা দুজনের কেউই বোধহয় কুয়াশায় সময় বুঝতে পারেনি, তাদের দরজা বন্ধ দেখে পরীক্ষিৎ বেরিয়ে এল।

জাহাঙ্গীর পরীক্ষিতের মুখের দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, 'আশ্চর্য! এতটা বয়েস কমালি কী করে?'

'আমি ওঁর ছেলে, পরীক্ষিৎ।'

'অম্বরীশ কোথায়, ডাকো তাকে। দেশে ফিরে শাদি করল অথচ আগে বা পরে একটা খবরও দিল না। ওর ছেলে হিসেবে তোমার বয়েস তো অনেক বেশিই মনে হচ্ছে।'

ভেতরের দালানে জাহাঙ্গীরকে বসিয়ে পরীক্ষিৎ বেরিয়ে যাবার অল্প পরে অম্বরীশ এল, নিজের চোখকেই তার বিশ্বাস হয় না।

তার চেয়েও বেশি অবাক জাহাঙ্গীর, কেউ যেন তার চুলের মুঠি ধরে এক ঝটকায় তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সেই অবস্থায় কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতার পর সে কথা বলতে পারল- 'এ চেহারা তোর হল কী করে? করল কে?'

'ভূতে আর মানুষে।' অস্থিচর্মসার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বসতে বসতে অম্বরীশ বলল, 'বোস। কত যুগ পরে দেখা! বাড়ি খুঁজে পেলি কী করে?'

'আমাকে হঠাৎ হাবা ঠাওরালি নাকি? বালিসোনার কথা, তোদের রাসমাঠের কথা, বকুলবেদির কথা তোর মুখে লক্ষবার শুনেও তোদের বাড়ি খুঁজে পাব না? অম্বরীশ, সত্যি করে বল তো, তোর কি এডস হয়েছে?'

'তার চেয়েও বেশি। বালিসোনার গরল গিলেছি। অতীতের, বর্তমানের সব বিষ পান করেছি আমি।'

'আগে তো এ ভাষায় কথা বলতিস না। আমাকে বুঝিয়ে বল তো তোর ঠিক কী হয়েছে? আমি বলছি তোর ভয় পাবার কিছু নেই! রিও-র সেই রিভলবার আজও আমার সঙ্গেই আছে।'

সমুদ্র জ্বালানো জ্যোৎস্নায় রিও-ডি-জেনেরোর কোপাকাবানা বিচে তিন গুণ্ডার সমবেত আক্রমণ রুখে দিয়ে একজনের রিভলবার কেড়ে নেবার সেই হাড় হিম করা ধ্বস্তাধ্বস্তি অম্বরীশকে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক করে দিল।

'সবকিছু খুলে বল আমাকে। দোস্তের জন্য আমি সবকিছুই করতে পারি।'

অম্বরীশ তখনও চুপ করে আছে দেখে বন্ধুকে বাঁচাতে নিজের প্রাণ হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চেয়ে জাহাঙ্গীর চোখমুখ হাত কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলতে থাকে- 'মাইকেল বন্দরের কথা নিশ্চয়ই ভুলিসনি!'

'মাইকেল না, মার্সেই বা হয়তো ভার্সাই। ফ্রান্সে মাইকেলের ঋণজর্জর প্রবাসজীবন কেটেছিল সেখানে। ওখান থেকেই মাইকেল মধুসূদন দেশে বিদ্যাসাগরের কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখতেন। আমার অবস্থাও এখন ওইরকম। ঋণজর্জর। পূর্বপুরুষের ঋণের বোঝা বইছি।'

'কত টাকার ঋণ? আমি মেটাব। আমি একটা জাহাজ কিনেছি। মালবাহী জাহাজ। লন্ডন থেকে আইসল্যান্ডের রেকিয়াভিক হয়ে গ্রিনল্যান্ডের তাসিলাক আর নানোরতালিক রুটে কন্টেনার দেওয়া-নেওয়া করছি, ভাব তো! তোকে ছাড়া আমি ভাবতে পারি না। চল, আবার দুই জিগরি দোস্ত একসঙ্গে সমুদ্রে!'

'আমার সেই স্বাস্থ্য আর নেই। হয়তো বয়েসও নেই।'

'সে আমি দেখব, আমি বুঝব। আগে হাত মেলা।'

অনেক দিন পর অম্বরীশ আবার বালিসোনার পথে নামল। জাহাঙ্গীরকে নিয়ে পুরনো অস্টিন থেকে নেমে ক্রাচে ভর করে বন্ধ পাউরুটির কারখানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বেশির ভাগ পতাকা গ্রীষ্ম-বর্ষার রোদে-জলে পচে গেছে। অবরোধকারীদেরও অনেককেই আর দেখা যাচ্ছে না। যারা তখনও বসে বা শুয়ে আছে তাদেরও আগের সেই উগ্র দৃষ্টি, সেই মারমুখী তেজ আর নেই। তাদের কাছেই জানা গেল, অনেকেই ধরনা ছেড়ে উঠে

গেছে । কেউ রোগে শয্যাশায়ী, কেউ অনাহারে মৃতপ্রায়, দুজন চরম দারিদ্র সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে ।

'আমি তোমাদের মালিকের বন্ধু । কী পেলে তোমরা আবার কারখানা চালু করতে পারো?'

কারখানার কাজের শেষে যাত্রার পার্ট করে বিখ্যাত হরিদাস অম্বরীশের দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'হাতে কিছু টাকা পেলেই ধার-কর্জ মিটিয়ে বউ-বাচ্চা মিলে পেট পুরে দুটো ভাত খেয়ে আবার আমরা লেগে পড়তে পারি, কত্তাবাবু । মাস-কতক আগে উল্টোরথের দিন বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর নিয়েও আমরা ক'জন আপনার কাছে এই কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, আমাদের নেতা যেতে দিল না ।'

জাহাঙ্গীরকে নিয়ে বাদার পথে এগোতে এগোতে অম্বরীশের শারীরিক কষ্ট বেড়ে গেল ।

'তুই এখন যা বলবি তাতেই এরা রাজি হয়ে যাবে । কাজে ফিরতে ইচ্ছুকদের হাতে কিছু টাকা দিলেই হবে । যদি বলিস আমিই দিয়ে দিতে পারি ।'

'আমার অত কষ্টের কারখানা নতুন করে করার আর ইচ্ছে নেই । কারখানায় আমার আর মনই নেই ।'

বাদায় পৌঁছে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'রুটি-কারখানা করেছিলাম এই নদীর জন্য ।

জাহাঙ্গীর শীতের বাদা, আধখোড়া মরা নদী চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে অম্বরীশের ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বালিসোনা ভ্যাম্পায়ারের মতো তোর রক্ত চুষে খেয়েছে । তোকে ছিবড়ে করে দিয়েছে । আমি তোকে শহরে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করে জাহাজে নিয়ে যাব । বালিসোনার বাইরে গেলেই তোর রোগমুক্তির শুরু । চল দোস্ত, প্রাণের বন্ধু আমার, আমাকে নিরাশ করিস না । তোকে নিয়ে যেতেই আমি বালিসোনায় এসেছি রে ।'

অম্বরীশের দু-চোখ জলে ভরে উঠল । জাহাঙ্গীরের উৎসুক দৃষ্টি থেকে জলভরা চোখ আড়াল করে তার একটা হাত ধরে বলল, 'যাব, নিশ্চয়ই যাব । সমুদ্রেই যাব । এখনই না, তুই বসন্তকালে আসিস ।'

বন্ধুকে বিদায় জানাবার পর আর সে মুখ খোলেনি । তিনদিন ধরে পারমিতা পরীক্ষিৎ অবনী সরোজিনীরা বার বার প্রশ্ন করেও তাকে কথা বলাতে পারেনি । চোখের অবিরাম জল ছাড়া অম্বরীশের আর কোনও ভাষা নেই । পঞ্চমদিনে কুয়াশাঢাকা সকালে যখন তার কান্না চিরকালের মতো থেমে গেছে বলে জানা গেল, তখনও অম্বরীশের দু-চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়া জলের দাগ শুকোয়নি ।

জঙ্গলের মাথা, রেললাইনের পাথর, দূরের বাদা বিকেলের আলোয় বড় মায়াময়, পরীক্ষিতকে কাতর করে । বাবা এই সেদিনও এই সব কিছুর মধ্যে ছিলেন, এখন আর কোথাও নেই, কোনওদিন তাঁকে দেখা যাবে না- পরীক্ষিতের মন এখনও এ-সত্য সইতে

পারে না । সব সময় তার মন জুড়ে থাকেন বাবা । যখন ছিলেন, এখন তার চেয়ে অনেক বেশি । শীতের স্বল্পায়ু বিকেলে রেললাইন ধরে হেঁটে যেতে যেতে তার ভ্রম হয় পাথরকুচির ওপর, কাঠের স্লিপারগুলোর ওপর ক্রাচের মৃদু খটখট শব্দ তুলে বাবাও তার সঙ্গে চলেছেন ।

বাবাকে সে কখনও ঠিকমতো বুঝতে পারেনি শুধু নয়, বুঝতে চায়ওনি ভেবে তার মন টনটন করে ওঠে । বাদায় মাটির ঢিবির গায়ে হেলান দিয়ে তাঁর সেই বসে থাকা সে চেষ্টা করেও আর ভুলতে পারে না । তার কেবলই মনে হয়, মানুষের জীবন কোথায় শুরু হয়ে কোথায় গিয়ে শেষ হবে, কেউ জানে না । এক যুগ আগে রাঙা-জ্যাঠাইমা হয়তো ঠিকই বলেছিলেন, ‘মেথর তাড়া করে সেই যে বালিসোনা ছাড়ল, তারপর থেকে তোর বাবা সারা জীবন শুধু নিষ্ফল যুদ্ধই করে গেল ।’



২১

বসন্তের সূচনায় এক সন্ধের মুখে বিষাদগ্রস্ত পরীক্ষিৎ তিকানদের বাড়ি গিয়ে দেখে একসময়ের পোড়-খাওয়া লড়াকু নেতা জগদীশ আচার্যের নিম্নাঙ্গ বহু কসরৎ করে সাবান দিয়ে ধুইয়ে তিকান নোংরা লুঙ্গি বদলিয়ে দিচ্ছে । পরীক্ষিৎ নিমেষে উল্টো মুখে ঘুরে গেল । ভারি অপ্রস্তুত হয়েও বাবাকে কাচা ফতুয়া পরাতে পরাতে তিকান বলল, ‘বাইরের দরজা বন্ধ করিনি? আমার আর মাথার ঠিক নেই । ভেতরে এসো । বাবা তো আর আমাকেও চিনতে পারছে না!’

এদিকে ফিরে পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করল, ‘ডাক্তার দেখিয়েছ?’

‘ডাক্তার দেখেছেন, ওষুধ খাওয়াচ্ছি, খুব করে হলুদ খাওয়াতে বলেছেন তাও দিচ্ছি, কিন্তু ফল কিছু দেখছি না ।’

‘আমি একটু আসছি’ বলে চলে গিয়ে পরীক্ষিৎ অবনীমোহনকে নিয়ে যখন ফিরে এল, তখন হিংস্র পাঁচ যুবকের একটা দল শাসাতে শাসাতে তিকানদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে । একজন মাঝারি মাপের নেতাকেও ওদের সঙ্গে দেখা গেল ।

অবনী জগদীশের চোখের শূন্যদৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করার পর চেয়ারে বসে বলল, ‘স্মৃতি হল আরণ্যক মৃত্তিকা । তার স্তরে স্তরে জীবনের শিকড় নেমে গেছে । এঁর তো মূল শিকড়টাই ছেঁড়া । আর জোড়া লাগবার নয়, এখন দরকার শুধু সেবা আর সাহচর্য ।’

পরীক্ষিৎ তিকানকে জিজ্ঞেস করল, ‘ওরা কারা, ওভাবে শাসিয়ে গেল!’

ভয়ে উত্তেজনায় তিকান তখনও স্বাভাবিক স্বর ফিরে পায়নি । বলল, ‘বাড়িটা ভেঙে পাঁচ-সাত তলা তুলবে, ফ্ল্যাট করে বিক্রি করবে । আমাদের তাড়াতে চায় । বাবা যতদিন পার্টিতে ছিলেন, কিছু বলতে পারেনি, এখন মাঝেমাঝেই শাসাতে আসে ।’

বালিসোনার শিমুলগাছ লাল ফুলে ভরে গেছে, সজনে ফুল শেষ হয়ে ডালে ডালে ডাটার সূচনা হয়ে গেল, হঠাৎ-হঠাৎ মন-উদাসী হাওয়া দিচ্ছে, সেই পূর্ণ বসন্তে একদিন তিকান হারিয়ে গেল ।

বুধবারের ‘বিষাদগাথা’ আজকাল ক্রমশ মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। কোনও কোনও দিনের কোনও লেখার কয়েক লাইন তুলে স্টেশনে রাস্তায় পোস্টারও দেখা যায়।

ফাল্গুনের শেষে একদিন সকাল থেকেই মেঘবৃষ্টিতে আকাশ কালো হয়ে আছে। স্যাঁতসেঁতে আবছা অন্ধকার ফুঁড়ে চৌধুরীবাড়ির দরজার ভারি কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলতে পরীক্ষিৎকে এগিয়ে আসতে দেখে দরোয়ান ব্যস্ত হল। দরজা খুলেই সেই জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর- ‘অম্বরীশ কোথায়? ডাকো তাকে। বলো গিয়ে, তার জাহাজের দোস্ত জাহাঙ্গীর এসেছে।’

‘ভেতরে আসুন। এত দেরি করে এলেন!’

‘আমাকে তো বসন্তকালেই আসতে বলেছিল। বলেছিল ওই সময় আমার সঙ্গে জাহাজে যাবে।’

‘বাবা চলে গেছেন। আমি আপনার জাহাজে যেতে চাই। আমাকে সঙ্গে নেবেন?’

‘প্রথমত, তোমার সমুদ্রের অভিজ্ঞতা নেই। দ্বিতীয়ত, তোমার বাবা বলেছিলেন, তোমাকে বালিসোনার খুব দরকার।’

যেমন মেঘবৃষ্টির অন্ধকারে এসেছিল, তেমনই মেঘবৃষ্টির অন্ধকারেই চলে গেল। যাবার সময় মাছ ধরার জাল-ঢাকা প্লাস্টিকের ছাউনির মেয়ে দুটি তাদের জন্মান্ধ ভাইকে নিয়ে পারমিতার কাছে তাদের আরও দুঃখের কথা জানাতে এসেছিল, নিজেদের ঘরে ফেরার এখনও কোনও ব্যবস্থা হয়নি। জাহাঙ্গীর তাদের সব কথা শুনে ‘এই তোমাদের ভাইটির সব দায়িত্ব আমি নিলাম’ বলে যেন সম্মতির জন্য অথবা ছেলেটার দুই দিদিকে বুঝিয়ে বলার জন্য পরীক্ষিতের দিকে তাকাল। তাদের অভাগা ভাইয়ের এমন ভাগ্য খুলে যাওয়ার বিষয়ে পরীক্ষিতের কাছে বিস্তারিত শোনবার আগেই দুই বোন আচমকা এমন শব্দ করে ফুঁপিয়ে উঠল যে জাহাঙ্গীর-পরীক্ষিৎ দুজনেই চমকে গেল।

জাহাঙ্গীর জানতে চাইল, ‘তোমাদের এতে মত নেই, এই তো?’

‘না, না, বাবু, আমরা দুই বোন জীবনে কখনও এত আনন্দ পাইনি। আনন্দে কেঁদে ফেলেছি। এতদিনে ভগবান মুখ তুলেছেন।’

দু-বোনের এক বোনের মুখে কান্নার কারণ শুনে জাহাঙ্গীর বলল, ‘আল্লাহ তোমাদের ভালো করুন।’

‘আপনি মোছলমান? মোছলমান এমন হয়?’

‘কী নাম তোমাদের?’

‘ও লজ্জাবতী, আমার নাম ময়নামতী। আপনার দেশ-ঘর কোথায়?’

‘শুনলে না আমার কোনও দেশ-ঘর নেই, আমি দেশে-দেশে জাহাজে মাল বওয়া-নেওয়া করি।’

দুই বোনের আরও কী কথা বৃষ্টির সঙ্গে আকস্মিক দিক বদলানো বাতাসের ঝাপটায় ভেসে গেল । জাহাঙ্গীর গায়ের রেইনকোট খুলে ছেলেটার গায়ে বেঢপ চড়িয়ে ক্রমবর্ধমান স্যাঁতসেঁতে আবছা অন্ধকারে এগিয়ে গেল ।

একটু পরে অকালের মেঘবৃষ্টির আঁধার ফুঁড়ে সে একাই ফিরে এল । দু-হাতে চোখ-মুখের জল চেঁছে ফেলে পরীক্ষিৎকে হঠাৎ বুকে চেপে ধরে খুব বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তোমার বাবার মৃত্যুদিনে তাঁর কবরে আইসল্যান্ড গ্রিনল্যান্ডের মাটি দিয়ে যাব ।'

পরীক্ষিৎ তৎক্ষণাৎ তার অসম্মতি জানাল- 'মাটি তো দেয় কবর দেওয়ার সময় । বাবাকে নিয়ে আর খোঁড়াখুঁড়ি করবেন না ।'

ভেতরের বারান্দায় জাহাঙ্গীরের জন্য বাগানের মুচকুন্দ ফুলের সরবত পড়েই রইল, জাহাঙ্গীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'এই বসন্তেই ওর সমুদ্রে যাবার কথা ছিল ।'



২২

উনিশটি পূর্ণিমা গাছবাড়িতে সুখে কাটবার পর অমাবস্যার দুদিন আগে তিন মাসের পোয়াতি নন্দিনীর পেটের ওপর হাত, উরুর ওপর পা রেখে দিবাকর যখন গভীর নিদ্রায়, দুজনের কেউই দরজার চার ফেরতা দরমা কাটার শব্দও শুনতে পায়নি, তখন চার সশস্ত্র যুবক আচমকা দুজনের হাত মুখ শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে ।

একজন দিবাকরের বুকে, আরেকজন তার পিঠে রিভলবার ঠেকিয়ে তাকে ঘরের বাইরে এনে এবার মাথার তালুতে রিভলবার ঠুকে হুকুম করল- 'সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামো ।' একজন তার একটা পা টেনে সিঁড়িতে প্রথম ধাপে দাঁড় করিয়ে দিল । আরেকজন নন্দিনীর দিকে ফিরে গম্ভীর স্বরে শোনাল- 'আমরাই ওকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব । পুলিশকে খবর দিলে তক্ষুনি গুলি করে এর মাথার খুলি উড়িয়ে দেওয়া হবে ।'

বাঁধা দুহাতের এক আঘাতেই সামনের ছেলেটির মুণ্ডু উড়িয়ে দেবার জন্য দিবাকর শরীর টানটান করে মোক্ষম মোচড় দেবার আগেই একজন নন্দিনীর বাঁ স্তনের ওপর তার রিভলবারের মুখ চেপে ধরল, আরেকজনের হাতের লম্বা ছুরি তার তলপেট ছুঁয়ে রইল ।

দিবাকরকে নীচে নামিয়ে দুচোখ বেঁধে দেওয়া হল । মোটর লাগানো নৌকোয় তুলে তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে না ভেবে জঙ্গলের মধ্যে অসহায় নন্দিনীর কথা কল্পনা করে ক্রোধে তার মাথা চৌচির হয়ে যাচ্ছে । বুকের মধ্যে নিরুপায় হাহাকারের লাভাস্রোত বইছে ।

নৌকো থেকে নামিয়ে দিবাকরকে জিপে তোলা হল । সাত ঘন্টা পর জিপ থেকে নামিয়ে আরও কয়েক ঘন্টা হাঁটিয়ে তাকে গভীর জঙ্গলে একটা তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়ে তার চোখ মুখ হাতের বাঁধন খোলা হল ।

পুরু গামছায় প্রায় সারা মুখ ঢাকা একটা লোক দিবাকরের কাছে এসে কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'তোমার যন্ত্র তৈরির হাত মাথা খুব পরিষ্কার । আমাদের এই দোনলা বন্দুক ভালো করে দ্যাখো, তোমাকে পাঁচনলা বন্দুকের নকশা করে দিতে হবে । সেই নকশা

মতো একটা বন্দুক বানিয়ে এখানকার দুজনকে হাতে-কলমে তোমার নকশা ও তার কারিগরি শিখিয়ে দিয়ে তোমার ছুটি ।'

তার প্রতি এদের ব্যবহার শুধু ভালোই নয়, তাকে এরা রীতিমতো যত্ন আত্তি করছে । আলাদা তাঁবুতে তার থাকার ব্যবস্থা, দুবেলা পেট পুরে সুখাদ্য খাওয়ানো, যখন যে যন্ত্রপাতি দরকার জানালেই পাওয়া যায় । কামার বা ছুতোরের সহায়তাও চাইলেই মেলে । তবে আলাদা তাঁবুতে থাকতে দিলেও তাঁবুর চারপাশের পাহারা এক মুহূর্তের জন্যও আলগা করে না ।

পাশাপাশি পাঁচ গুলি ছোড়বার পাঁচনলা বন্দুক এরা মানুষ মারার কাজে লাগাবে । সেই বিষাক্ত বন্দুক তাকেই উদ্ভাবন করতে হবে ভেবে দিবাকর মনে মনে যন্ত্রণা বোধ করে । এদের বিরুদ্ধে ক্রোধে মাথা জ্বলতে থাকে । নন্দিনীর কথা ভেবে মুখ বুজে সে কাজ করে যায় ।

তার আরও একটা বড় দুঃখ, লিওনদাদার পরামর্শ মতো বালিসোনার গরিব মানুষের জন্য সে একটা যন্ত্রের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে । ঘাস, পাতা, ফুল, ফল, ফলের বীচি, বাদাম, ধান, গম, শেকড়বাকড় সেই যন্ত্রে ঢুকিয়ে হাত দিয়ে মাড়াই করে নিলেই খুব সস্তায় প্রচুর প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থে ভরপুর খাদ্য তৈরি হয়ে যাবে । এ কাজে সে অনেকটা এগিয়েও ছিল, এখন সব ভুলে মানুষ মারা বন্দুকের ভাবনা ভাবতে হচ্ছে!

গাছবাড়িতে দাগানো উনিশ পূর্ণিমার পর আরও তিন পূর্ণিমা কেটে গেছে । বিপ্লবীদের জঙ্গলে দিবাকর দুই শিক্ষার্থীর চোখের সামনে পাঁচনলা বন্দুক তৈরি করে নকশাসমেত সেই বন্দুক তাদের হাতে তুলে দেবার পরদিন পুরু গামছায় প্রায় সারা মুখ ঢাকা নেতা দিবাকরের সামেন এসে দাঁড়াল । একটাও কথা না বলে বন্দুকে পাঁচটা গুলি ভরে উড়ন্ত পাখির ঝাঁক তাক করে ট্রিগার টিপল । ঠিক পাঁচটা পাখি ওলোটপালোট খেতে খেতে নীচে পড়ে গেল ।

বন্দুকে হাত বোলাতে বোলাতে লোকটা বলে উঠল, 'সাবাশ, সাবাশ! ভেরি গুড!'

তার চোখের ইঙ্গিতে আগের মতোই দুজন দিবাকরের চোখ বাঁধতে এগিয়ে এল । মুখ-ঢাকা লোকটি দিবাকরকে বলল, 'বন্দুকের ব্যাপারে, আমাদের ব্যাপারে, জঙ্গলের ব্যাপারে কখনও কারও কাছে মুখ খুললেই মৃত্যু । কথাটা প্রাণ থাকতে ভুলবে না আশা করি ।'

দিবাকর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেও তার চোখের দৃষ্টিতে রাগ ও ঘৃণার ঝিলিক । ভয়ে ও উদ্বেগে সে কিছুটা অস্থিরও ।

তার চোখ বেঁধে দেবার পর মুখ ঢাকা লোকটি সেই দুজনকেই আদেশ দিল, 'বালিসোনায় বউয়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে আয় ।'

'জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছেলে দুটির একজনের পেছন-পেছন তার হাতের লম্বা লাঠির ডগা ধরে জিপ অব্দি দিবাকর হেঁটে চলেছে । ঘন্টাখানেক চলার পর লাঠি হাতে ছেলেটি

দাঁড়িয়ে পড়ে দিবাকরকে বলল, ‘পেচ্ছাপ করবে?’

‘দরকার নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে চাই।’

‘আমি পেচ্ছাপ করে আসছি। একটু দাঁড়াও।’

দু-মিনিট দুজনের কারও-ই সাড়া নেই। তারপরই একসঙ্গে দুটি রিভলবারের গুলি দিবাকরকে শুধু ‘মা গো!’ বলে চেঁচিয়ে ওঠবার সময়টুকু দিল।

বাইশতম পূর্ণিমাও এসে চলে গেল, দিবাকর তবু ফিরে এল না দেখে নন্দিনী দিবাকরের লেখা চিঠিখানা নিয়ে বার বার পড়ে। দিবাকরকে নিয়ে যাবার পর-পরই অল্পবয়েসি অচেনা একটা ছেলে এসে চিঠিটা দিয়ে গেছে। সে ভালো আছে, শিগগিরি ফিরে আসবে, তার বিষয়ে কাউকে কিছু জানাবার দরকার নেই। পড়তে পড়তে বুক ব্যথা করে উঠলে কখনও সরোজিনী কখনও লক্ষ্মী কখনও মিতার কাছে ছুটে যায়, কখনও বড় মা’র কাছে। নিজের মা’র কাছে আর যায় না, তাকে দেখলেই ‘ও রে, সে আর বেঁচে নেই রে’ বলে অলক্ষুণে কান্নায় মেয়ের বুকেই মাথা খুঁড়বে। ভোরবেলা অবনীমোহন ধ্যানে বসলে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে নন্দিনীও নীরবে বসে থাকে- যদি হঠাৎ তিনি চোখ খুলে কোনও আশার কথা শোনান। একেক দিন তাদের যে সন্তান আসছে তার হাত পা গা মাথার মাপ কল্পনা করে সারা দিন সেইমতো উল বোনে আর দিবাকরের সঙ্গে মনে মনে কত যে কথা বলে যায় সে নিজেই তার খেই রাখতে পারে না।

লিওন ও পরীক্ষিৎ প্রথম থেকেই পুলিশকে ঘটনাটা আগাগোড়া খুলে বলতে চেয়েছিল। নন্দিনীর বাধায় তাদের নিরস্ত হতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে আলোচনা করে থানায় যখন নিখোঁজের ডায়েরি করা ঠিক হল, তখনও নন্দিনী কেঁদে-কেটে একসা, পুলিশকে জানালেই তার দিবাকরকে নাকি ওরা শেষ করে দেবে।

উলের মোজা, দস্তানা, টুপি, হাঁটু ঢাকা, গোড়ালি পর্যন্ত নানা মাপের ফ্রক ও নানা রঙের পঞ্চে ঘর ভরে গেল, দিবাকরের কোনও খোঁজ বা খবর পাওয়া গেল না। পূর্ণিমার হিসাব রাখা নন্দিনী ছেড়ে দিয়েছে, অমাবস্যার কাছাকাছি এক রাতে যখন সবাইকে অবাক করে একমাথা কোঁকড়ানো চুল আর তারই গায়ের রং নিয়ে তার পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হল তখনও নন্দিনী জানে না দিবাকর কবে ফিরবে। শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে, তেল মাখিয়ে রোদে রেখে স্নান করাবার সময়, বিকেলবেলা সাজিয়ে গুজিয়ে কপালে চুমু ও কাজলফোঁটা দিতে দিতে উদাসমনে ভাবে ছেলে কবে তার বাবার কোলে ঝাঁপাবার সুযোগ পাবে? কবে দিবাকর জোনাকজ্বলা ঘরের পূর্ণিমা-অমাবস্যায় তার ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে শিশুর মতো খুশি হয়ে উঠবে? যত ভাবে ততই তার বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

ছেলের নাম প্রভাকর, না জ্যোতির্ময়, না অপরাজেয়- তা নিয়ে অনেক আলোচনার পরও বাড়ির সকলে একমত হতে পারছে না দেখে পরীক্ষিৎ বলল, ‘ওর নাম রাখো

মেঘাবৃত । মেঘাবৃত বসু । তোমাদের দুজনের পদবী জুড়ে বসুচৌধুরীও হতে পারে ।'

নামকরণ শেষ হবার জন্য কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে ব্রতীন দরজার বাইরে থেকে জানাল, 'একজন দিদিমণি এসেছেন, পরীক্ষিৎ দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান ।'

লখনউ থেকে সরস্বতীর চিঠি নিয়ে এক মহিলা এসেছে । সে পতিতাপল্লীর মেয়েদের পেশাপূর্ব পারিবারিক জীবন নিয়ে গবেষণা করছে । সেই কাজে বালিসোনার রেড লাইট এরিয়ায় ওই পেশায় যুক্ত মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে পরীক্ষিৎ কি মেয়েটিকে সাহায্য করতে পারে? মেয়েটি বাঙালি হলেও জন্ম, শিক্ষা সবই বাংলার বাইরে ।

আগে এপাড়ায় আট-দশটা খড়ের চালাঘর মাত্র ছিল, এখন টিন টালি অ্যাসবেসটসের ছাদ দেওয়া প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটি ঘর । দরজায় দরজায় সন্ধে থেকে উগ্র সাজসজ্জা করে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে । যেসব দরজার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে নেই, সেসব দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ।

অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে তার আগের অভিজ্ঞতা থেকে এখানেও নীলাঞ্জনা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মেয়েদের প্রথমেই জানাল সরকার এইসব অসহায় মেয়েদের সাহায্য করতে চায় । সেই জন্যই নীলাঞ্জনাকে এখানে পাঠানো হয়েছে প্রত্যেকের আগেকার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে । নীলাঞ্জনা প্রথমে অভ্যাসবশে ইংরিজিতে বলল । পরীক্ষিৎকে তার বাংলা করে দিতে হল ।

দ্বিতীয় দিনে একটা দরজার সামনে এক দীর্ঘাঙ্গী মেয়ের মুখে পরীক্ষিতের চোখ আটকে গেল । লজ্জাবতী-ময়নামতীর একজন!

লজ্জাবতী বা ময়নামতী পরীক্ষিৎকে চিনতে পারেনি । তার সঙ্গে মহিলা দেখে পরীক্ষিৎকে ঘরে আসার জন্যে পীড়াপিড়ি করবে কিনা স্থির করতে পারল না ।

'হোয়াট এ চার্মিং লুক! ল্য ফ্লর দু মাল! হাউ শি কুড অ্যাপিয়ার ইন দি সিন? আই মাস্ট নো হার পাস্ট ইন এভরি ডিটেল ।'

'প্লিজ ডোন্ট আস্ক হার এনিথিং । আই নো এভরিথিং অফ হার । শি হ্যাজ এ টুইন সিস্টার উইথ ইকোয়ালি ইল ফেট । লেটার আই উইল টেল ইউ অল ।'

অন্যদিকে চলে যাবার সময় পরীক্ষিৎ নিজের কৌতূহলে না জিজ্ঞেস করে পারল না- 'তুমি ময়নামতী?'

মেয়েটি পাশের বন্ধ দরজাটা দেখে বা দেখিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'ময়নামতী ভিতরে । আমি লজ্জাবতী ।'



২৩

ছেলেবেলায় তারই বয়েসি একটা ছেলেকে মেলার দোকান থেকে মোয়া চুরির অপরাধে মোয়া ভরতি বিরাট ধামা এক লাফে ডিঙিয়ে এসে দোকানদারের চড় কিল ঘুঁষি মারার দৃশ্য এখনও হঠাৎ হঠাৎ পরীক্ষিতের মন ফুঁড়ে উঠে আসে । মোয়ার ধামা লাফিয়ে পেরবার সময় নিজেরই পায়ে লেগে ধামা উল্টে সব মোয়া দোকানের সামনের কাদায় পড়ে যাওয়ায় দোকানদার রাগে অন্ধ হয়ে মেরেই চলে । দোকানের সামনের জলকাদা ঢাকতে ভাঙা ইট টালি ফেলা হয়েছিল, তার ওপর উপুড় করে ফেলে সবাই মিলে ছেলেটাকে পায়ের চাপ দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলল । মোয়ায় কাদায় মাখামাখি । দোকানদার তখনও জোর পায়ে ছেলেটার পিঠের ওপর লাফাতে লাফাতে বলছিল- প্যাঁকাটির মতো তোর সব ক'টা পাঁজর আমি গুণে গুণে ভাঙব রে ছোড়া!

একটা একটা করে বুকের পাঁজর ভেঙে গেলে মানুষের কী হয়- পরীক্ষিতের ছেলেবেলার সেই ভীত সন্ত্রস্ত ভাবনা আজও মাঝে মাঝে পেয়ে বসে, বিশেষত বিনিদ্র রাতে ।

এই ভাবেই এক গ্রীষ্মের গুমোট রাতে বাবার কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে তাঁরই হাতে লেখা ভাঁজ করা কয়েকটা কাগজে পরীক্ষিতের চোখ আটকে গেল । একটা কাগজের মাথায় লেখা- 'সাত খুন মাফ ।' নীচে বিবরণ । অম্বরীশের ঠাকুরদার আমলে তাঁরই নেতৃত্বে বালিসোনার কোন এক কপিখেতের যুদ্ধে সাত চাষিকে খুন করা হয় । জমিদারের লোকেরাই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাতটি শবদেহ বাদায় গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেয় । আরেকটা কাগজের মাথায় লেখা- 'সাত কংকালের কাহিনী ।' গভীর রাতে একে একে সাতটি কংকাল এসে অম্বরীশের বুকের ওপর বসে তার দম বন্ধ করে ফেলতে চায়, তারই বিশদ বর্ণনা ।

তৃতীয় কাগজের শিরোনাম- 'খুন করে কাউকে মেরে ফেলা যায় না ।'

পুরো রাতটা জেগে বসে সব ক'টা কাগজের লেখা বার বার পড়ার পর ভোরে সেগুলো নিয়ে অবনীমোহনের কাছে গেল । অবনীমোহন ছাদে উদীয়মান সূর্যের মুখোমুখি

বসে ছিল, ভোরের প্রথম আলোয় পৃথিবীকে দেখা তার অনেক দিনের অভ্যাস । পরীক্ষিতের কাগজের বান্ডিলের শিরোনামগুলোয় একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে বলল, 'এর সবটাই আমি জানি । খুন করে সত্যিই তো কাউকে মেরে ফেলা যায় না । সব হত্যাই কোথাও না কোথাও বেঁচে থাকে । হয় বিষ ছড়াতে, নয় অমৃত ফলাতে । আসল কথা, কোনও ঘটনাই কোনওদিন চিরতরে অতীত হয়ে যায় না ।'

কৃষ্ণপক্ষের শুরু থেকেই মাঝ রাত পেরিয়ে পরীক্ষিৎ, অবনী আর লিওন বাদায় এসে খোঁড়াখুড়ি শুরু করে দিল । বাইরের শুধু একজনকেই সঙ্গে নেওয়া হয়েছে, সে অভিজ্ঞ নিদ্দা । তৃতীয় দিনে একটা ঢিবি খুঁড়ে, ভাঙা-চোরা সাতটি কংকালই পাওয়া গেল । এই ঢিবির গায়ে হেলান দিয়ে অম্বরীশ সারা রাত ঘুমিয়ে ছিল ।

পরীক্ষিৎ দেরি করতে চায় না, বর্ষা আসার অনেক আগেই বালিসোনার বিশিষ্ট মানুষদের ডেকে, চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে সাত কংকালের ভাঙা হাড়গোড় তুলে ঢিবির পাশে নতুন খোঁড়া গর্তে সযত্নে মাটি চাপা দিল । তার ওপরে কংক্রিটের বেদিতে শ্বেতপাথরের ফলক গেঁথে দেওয়া হল । সাদা পাথরের গায়ে কালো হরফে পরীক্ষিৎ লিখিয়ে এনেছে:

বালিসোনার কপিখেতে

প্রথম ফসলরক্ষার যুদ্ধে নিহত

সাত শহীদের স্মৃতিতে

হিন্দু-মুসলমানের কংকালের একত্র অবস্থান নিয়ে ভিড়ের মধ্যে নিহতদের পল্লীর লোকেরা ও পরিবারের বংশধররা প্রথমে গুঞ্জন, পরে প্রতিবাদ করলে পরীক্ষিৎ তাদের বুঝিয়ে বলল- কংকালের কোনও ধর্ম থাকে না । কংকাল শেয়ালের না মানুষের, বালকের না বৃদ্ধের, পুরুষ না নারীর- কংকালের হাড়ে-গঠনে তার পরিচয় থাকে, কিন্তু কংকাল হিন্দুর না মুসলমানের, বৌদ্ধদের না খ্রিস্টানদের, কংকালের গায়ে তার কোনও চিহ্নই থাকে না । কেন থাকে না? কারণ কংকালের কোনও ধর্ম নেই । কংকাল সর্ব ধর্মের অতীত ।

পরীক্ষিতের কৈফিয়তে অসন্তুষ্ট, হিংস্রদৃষ্টি কয়েকজনকে শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিবেশীরা জোর করে নিয়ে যাবার পর জলকাদাভরা জনশূন্য বাদায় শহীদবেদীর সামনে অসময়ে ধ্যানরত অবনীমোহনের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে পরীক্ষিতের দুচোখ জলে ভরে এল ।

বাড়ি ফিরে অনেকদিন পর মিতার বুকে মাথা রেখে সে হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলল, 'বাবা বোধহয় এবার একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারবেন!'

লক্ষ্মী-লিওনের বাড়িতে নীলাঞ্জনার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। পরীক্ষিৎ ব্যস্ত থাকায় এর মধ্যে পতিতাপল্লীতে আর যাওয়া হয়নি, সে-ক'দিন নীলাঞ্জনা ঘরে বসে লিখে, বই পড়ে কাটিয়েছে।

সপ্তাহখানেক পর পরীক্ষিতের সঙ্গে এ-চালা ও-চালা ঘুরে ঘুরে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে পল্লীর পশ্চিম প্রান্তে একটা নতুন দোতলা বাড়ি থেকে গান বাজনার আওয়াজ শুনে নীলাঞ্জনা দাঁড়িয়ে পড়ল।

পরীক্ষিৎও বিস্মিত। এপাড়ায় এরকম বাড়ি কখনও ছিল না।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠেই ছোট একফালি অপ্রশস্ত লম্বা ঘর, মেঝেয় এলোমেলোভাবে জুতো রাখা আছে, কয়েকজন বাদার মাটি কাটার লোক কড়া ফিনাইলের গন্ধে ভরা প্লাস্টিকের বালতি-ঝাঁটা নিয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে আছে। অ্যালুমিনিয়ামের থালায় মদের বোতল, সোডার বোতল, বাটি-ওপচানো বরফ খণ্ড নিয়ে সার্কাসের মেয়েদের মতো ফোলানো ইজের ও আঁটো ব্লাউজ পরা যুবতীরা ব্যস্ত হয়ে এদিক-ওদিক যাতায়াত করছে।

বড় হলঘরের দরজার পর্দা সরাতে বাইজীর নাচগানের জমজমাট আসর আলোয় ঝলমল করে উঠল। মাথায় কদমছাঁট চুল, ধুতির ওপর হাফশার্ট পরা পালোয়ানের মতো দুটো লোক পরীক্ষিৎদের সামনে লাফিয়ে এসে তাদের আটকে দেবার আগেই সামনে মদের সুদৃশ্য পাত্র হাতে তাকিয়ায় আধশোয়া আরবের এক শেখ নীলাঞ্জনার উদ্দেশে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল- 'এনতি জমিরা! এনতি জমিরা! শু ইসমাক?'

বোম্বাইয়ে 'হোটেল-প্রসটিটিউশন' সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের সময় নীলাঞ্জনাকে আরবি ভাষা কিছুটা শিখতে হয়েছিল। এরকম একটি পরিবেশে আরব শেখের মুখে 'এনতি জমিরা' শুনে সে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হল। কথাটার মানে 'তুমি সুন্দর! কী সুন্দর তুমি!' এত সাহস যে নামও জিজ্ঞেস করছে- 'শু ইসমাক', তোমার নাম কী? তাকেও নিশ্চয়ই এই পল্লীর মেয়ে ভেবেছে। বিদেশে এসে মেয়েদের এরা কী চোখে দ্যাখে তার ভালোই জানা আছে।

লোকটা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে নীলাঞ্জনার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে পরীক্ষিৎ হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে এল।

তার আগেই তার কানে এল- 'হেডমিস্ট্রেসের সেই জারজ ছেলেটা না? তুমিও শেষে বেশ্যাপাড়ায় মাগী সাপ্লাইয়ে লেগে পড়লে, বাবা? মালটা তো ভালোই বাগিয়েছ!'

পিছন ফিরে ফরাসে প্রায় গড়িয়ে পড়া রুদ্র ঝম্পটিকে দেখেই চিনতে পারল পরীক্ষিৎ। চুলে পাক ধরেছে, মুখ আরও গোল, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি।

'সাপ্লায়ার, না নিজেই মাড়াতে এসেছ, খোকা?'

সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছে পরীক্ষিৎ হড় হড় করে বমি করে দিল।

নীলাঞ্জনা তার কাঁধের থলে থেকে ছোট তোয়ালে বের করে দিয়ে বলে, ‘লেট’স গো টু পোলিস ফার্স্ট ।’

পরীক্ষিতের স্বর দুর্বল, হতাশায় ভরা- ‘লাভ নেই, ঝম্পটি পুলিশের চোখে এখনও ফেরার । সে এখানে আছে, হয়তো নিয়মিতই আসে, পুলিশ ভালো করেই জানে ।’

অনেক রাতে পরীক্ষিতের মনে হল তার একটা পাঁজর এবার প্যাঁকাটির মতো পুড়ছে ।

সকালে অবনীমোহনের কাছে গিয়ে সে প্রশ্ন করল, ‘আপনার কি মনে হয় না মানুষ মাত্রই সম্পূর্ণ অসহায়? জন্ম থেকেই চিরপরাজিত?’

‘আমার ঠিক এর উল্টোই মনে হয় । আমার মনে হয় মানুষ অপরাজেয়, শুধু সকলে সেটা উপলব্ধি করতে পারে না ।’

অবনীমোহনের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেও পরীক্ষিৎ কোনও সান্ত্বনা পেল না । অনেকদিন থেকেই মিতার তীর্থদর্শনে যাবার ইচ্ছে নানা অজুহাতে সে ঠেকিয়ে রেখেছে, এবার হঠাৎ রাজি হওয়ায় মিতা রাত জেগে বাঁধাছাঁদা শেষ করে ফেলল ।

সাতসকালেই সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ির পুরনো অস্টিনে চড়ে দুজন বেরিয়ে পড়ল । লক্ষ্মী-লিওনও সঙ্গে গিয়ে ট্রেনের ইন্টার ক্লাসে তাদের বসিয়ে দিয়ে এল ।

পরীক্ষিত মিতাকে নিয়ে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে দেবদেবী দর্শন করায় । সে নিজে তখন মন্দিরে ঢোকার মুখে মিতার চটি পাহারা দেয় । আসলে ওই ফাঁকে সে মানুষের মুখ দেখে । সারি সারি মানুষ মন্দিরে ঢুকছে বা ঢোকার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, আবার দর্শন সেরে দলে দলে বেরিয়ে আসছে । এ এক মানুষের চলমান মেলা । কারও মুখের সঙ্গে কারও মুখের সামান্য মিলও নেই ।

সন্ধেবেলা বহু কালের পুরনো লোহার রেলিং-ঘেরা নদীর ধারে বসে নদীর জলে ওপারের মন্দিরের আলোকমালার প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে দুজনেই নিঃশব্দে যে যার স্মৃতিপুঞ্জে ডুবে আছে, হঠাৎই নদীর শীতল হাওয়ায় ভেসে-আসা কীর্তনের সুরে মিতার মন ব্যথাতুর হয়ে উঠল-

না পুড়ায়ো রাধাঅঙ্গ

না ভাসায়ো জলে

মরিলে তুলায়ে রেখো

তমালের ডালে

পরীক্ষিতের বুকে ভূমিকম্প হল । এ তো তিকানের গলা, তার প্রিয় পদাবলী! এ পদ সরোজিনীরও বড়ই প্রিয় । তাঁর হুকুমে কত বার যে তিকান এই পদ তাঁকে শুনিয়েছে তার শেষ নেই ।

'আমাদের তিকান না? দ্যাখ না খোঁজ নিয়ে । তীর্থে এমন অনেক কিছুই ঘটে । যা পাবার আর আশা নেই, তাও পাওয়া যায় ।'

অনেকক্ষণ বসেও ওপারে যাবার কোনও নৌকোর দেখা নেই । নিরাশ হয়ে কাল সকালে যাবার কথা ঠিক করে উঠে পড়বার মুখে তীরের কাছ ঘেঁসে একটা বড় মাপের ছইওলা নৌকো যেতে দেখে পরীক্ষিৎ হেঁকে বলল, 'এ কি ভাড়ার নৌকো? ওপারে আমাদের পৌঁছে দেবে?'

'এ আবার কোন সুমুন্দির পো রে?'

নেশায় জড়ানো গলায় কথাটা বলতে বলতে একজন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে আবার বসে পড়ল, বাকি দু'জন শুয়েই শুয়েই বোতল থেকে চুমুক দিচ্ছে । ছইয়ের মুখে হ্যাজাকের আলোয় ঝলমলে শাড়ি গয়না পরা একটা মেয়েকে তীর থেকেও দেখা যাচ্ছে ।

হাওয়ায় তখনও ভেসে আসছে-

না পুড়ায়ো রাধাঅঙ্গ

না ভাসায়ো জলে

মরিলে তুলায়ে রেখো

তমালের ডালে ।

কৃষ্ণ কালো তমাল কালো

তাইতে তমাল লাগে ভালো ।

পরদিন সকালে নদীর ওপারে কাছাকাছি তিনটি মন্দিরে খোঁজ করেও তিকানের কোনও খবর পাওয়া গেল না ।

কিছুটা দূরে অশ্বত্থগাছের ঝুরি-জর্জরিত একটা মন্দিরে গিয়ে জানা গেল, সন্ধ্যায় যে কীর্তন গেয়েছিল ভোরে সে তার বোষ্টমের সঙ্গে মন্দির ছেড়ে চলে গেছে । সাত মাস তারা ছিল এই মন্দিরে ।

'তার নাম কি তিকান?'

'তাকে তো পুতুলবোষ্টমী বলেই সবাই ডাকত ।'

'তার চিবুকে তিল দেখেছেন?'

'নদীতে নেয়ে উঠলে দেখা যেত । অন্য সময় চন্দনের ফোঁটায় ঢেকে রাখত । তার আসল কথাই তো আপনি জানতে চাইলেন না । প্রভুদত্ত গলা! প্রভুর কৃপা না হলে অমন কীর্তনের কণ্ঠ কেউ পায়? আপনারা কে?'

মিতা বলল, 'ওর দেশের মানুষ ।'

মন্দির থেকে ফেরার পথে খেয়াঘাটের পাশে চায়ের দোকানে মুণ্ডিতমস্তক, কপালে তিলক কাটা এক তরুণের হাতের খবরের কাগজে পরীক্ষিতের চোখ আটকে গেল । দিবাকরের বিকৃত মুখের ছবি । সন্দেহবশে ভালো করে দেখতে গিয়ে পুলিশের সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপনটি পরীক্ষিৎ পড়ে ফেলল । মিতাকেও দেখাল ।

'কী সাংঘাতিক! এ তো দিবাকরের ছবি । চল, ফিরে যাই, খোকা । অমন চুপ করে আছিস কেন? তোর চোখ এত লাল হল কী করে?'

'খুব তাড়াতাড়ি বালিসোনায় ফিরতে হবে আমাদের' -যেন জ্বরের ঘোরে কথা বলছে পরীক্ষিৎ ।



২৪

জ. লে তিনদিন ধরে রেইড করে ফেরার পথে দিবাকরের পচা-গলা দেহ পুলিশই আবিষ্কার করেছে । সরোজিনী-হাসপাতালের মর্গে শব রেখে খবরের কাগজে আনুমানিক বয়েস ও অন্যান্য তথ্য জানিয়ে মৃতের আবক্ষ ছবি সহ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে । বিজ্ঞাপনে আরেকটি তথ্যও উল্লেখ করা হয়েছে । মৃতের শার্টের ঘড়ির পকেটে শুকনো বিবর্ণ একটা রজনীগন্ধা ফুল পাওয়া গেছে ।

ছবি দেখেই দিবাকরের মুখের আদল চিনতে পেরে নন্দিনীর বুকের ভেতর হাতুড়ি ঘা পড়ছিল, রজনীগন্ধার কথা পড়ে সে চিৎকার করে উঠে জ্ঞান হারাল । মাথায় অনেকক্ষণ জল দিয়ে হাওয়া করে তার জ্ঞান ফেরানোর পর সে হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে খবরের কাগজে রজনীগন্ধার জায়গাটা দেখিয়ে ফিসফিস করে বলল, ‘ওই ফুল ও নিজেই চিংড়ির জল ঝরানোর মেশিনে শুকনো করে শার্টের ভেতরের পকেটে রেখে দিয়েছিল । ওটা আমাদের ফুলশয্যার ফুল ।’ কথাটা শেষ করে ঢিল-খাওয়া কুকুরের মতো সে কঁকিয়ে উঠল ।

কেন ওকে ওরা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে গেল, কোথায় ওকে নিয়ে গেল, বলেছিল পুলিশকে কিছু না জানালে ওকে শীগগিরই ফিরিয়ে দিয়ে যাবে, আমি তো পুলিশকে কিছু জানাইনি, কাউকে জানাতেও দিইনি, তবে কেন ওকে মেরে ফেলল- তিনমাস ধরে কয়েক ঘন্টা পর পর এইসব কথার সঙ্গে তার আর্ত কান্না বহু দূর থেকেও লোকে শুনেছে ।

ছ'মাসের শিশু মুখে কয়েকটা আঙুল পুরে শুধু ওয়া, ইয়া, হোআও ইত্যাদি শব্দ করে কী যে বলে যায় কেউ বোঝে না ।

থানায় গিয়ে দিবাকরের হত্যার বিষয়ে কোনও তথ্য তো জানাই গেল না, বরং যখন-তখন চৌধুরীবাড়িতে পুলিশের আনাগোনা শুরু হল । নন্দিনীকে গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদও ক্রমেই বেড়ে চলেছে ।

পুলিশের অভিযোগ, এতদিনেও কেন মিসিং ডায়েরি করা হয়নি? মাঝরাতে বিছানা থেকে রিভলবারের মুখে দিবাকরকে তুলে নেওয়া হয়েছে জেরায় সেকথা জেনে পুলিশের

আরও অভিযোগ- কেন থানায় কিডন্যাপিং রিপোর্ট করা হল না? ডাকাতি বা খুনের চেষ্টার অভিযোগও তো করতে পারতেন। পুলিশকে কিছুই জানাননি কেন?

'আমাকে ভয় দেখিয়েছিল, পুলিশকে জানালে তক্ষুনি ওকে মেরে ফেলবে।'

'পুলিশের কাজ পুলিশকে করতে না দিলে বিপদ কি কমে? বাঁচাতে পারলেন ওকে?' গোয়েন্দা অফিসার নোট লিখতে লিখতে চোখ না তুলেই কথা বললেন।

নন্দিনীকে সরিয়ে এগিয়ে এসে এবার পরীক্ষিৎ বলল, 'পুলিশ বাঁচাতে পারত? পুলিশকে জানালে পুলিশ কি ওকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পারত? পুলিশের চোখের সামনে ফেরার রুদ্র ঝম্পটি দশ বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পেরেছে? পশ্চিমপাড়ার একেবারে পশ্চিমে নতুন দোতলা বাড়িতে গেলেই রুদ্র ঝম্পটিকে পাওয়া যায়, তবু পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করতে পারছে না, পুলিশের ওপর মানুষ আর আস্থা রাখতে পারে কি?'

'আপনারও তাহলে ওপাড়ায় যাতায়াত আছে? তা তাতে দোষেরই বা কী!'

কাকতালীয় ঘটনার মতো ঠিক ওইসময়ই উত্তেজিত নীলাঞ্জনা, পরীক্ষিৎ এ ঘরে আছে জেনে, তাকে কিছু বলতে এসে সামনেই পুলিশ দেখে বলে উঠল, 'রেডলাইট এরিয়ায় দোতলা বাড়ি এখনই রেইড করুন। বাইজী নাচের বড় হল ঘরের পিছনে ব্লু ফিল্মের স্টুডিও, এখনও সেখানে শুটিং চলছে, এক্ষুনি গেলে হাতেনাতে ধরা যাবে।'

গোয়েন্দা অফিসার কিছু বলতে যাচ্ছিল, থানার ও সি তাকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় নীলাঞ্জনাকে বলল, 'নতুন নাকি? নাম? কত নম্বর চালা? ওখানে লাগল কার সঙ্গে? কবে এসেছ ওপাড়ায়?'

পরীক্ষিৎ ও সি-র চোখে চোখ রেখে বলল, 'ইনি নীলাঞ্জনা মিত্র, সুইডিশ সরকারের স্কলারশিপে ভারতের পতিতাদের নিয়ে গবেষণা করছেন। দেহব্যবসাকে যাদের জীবিকা হিসেবে নিতে হয়েছে তাদের পেশায় আসবার আগের পারিবারিক জীবন এঁর গবেষণার বিষয়। পশ্চিমপাড়ায় এঁকে আমিই প্রথম কয়েকদিন নিয়ে গিয়েছিলাম, এখন একাই যান। আপনাকে আলাদা করে আর দোষ দেব কী! দারিদ্র ও দুর্নীতির দেশে রাষ্ট্র যেমন পুলিশকে অমানুষ বানায়, পুলিশও তেমনি সাধারণ মানুষের জীবনে ঢুকে তার শোধ তোলে।'

মূর্তিবৎ পুলিশদের মধ্যে থেকে ও সি-র গলা শোনা গেল- 'পশ্চিমপাড়া আজই রেইড করা হবে।'

'কখন?' নীলাঞ্জনার প্রশ্ন।

ও সি-র উত্তর, 'কাগজপত্র রেডি করতে, ফোর্স অ্যারেঞ্জমেন্টে যেটুকু সময় লাগে। আপনিও আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন।'

ঠিক দুঘন্টার মাথায় পশ্চিমপাড়ার নতুন দোতলা বাড়ি চারদিক থেকে সশস্ত্র পুলিশ ঘিরে ফেলা মাত্র রিভলবার-হাতে আরও বড় একটা পুলিশের দল বাড়ির ভেতরে ঢুকে প্রত্যেকটা ঘর সার্চ করেও কোথাও আপত্তিকর কিছু পেল না । বড় হলঘরে আজ শুধু গানের আয়োজন চলছে । বড় টি-পটে চা, থালায় ঢালাও বিস্কুটের ব্যবস্থা, আলাদা রেকাবিতে সাজা পানের স্তূপ ।

পিছনের স্টুডিওয় বিয়ে ও অন্নপ্রাশনের ছবি প্রসেসিং ও ডেভেলপিংয়ের কাজ চলছে । আরবের শেখ ও রুদ্র ঝম্পটিকে এখানকার কেউ চেনে না, ওদের কথা শোনেইনি কখনও ।

এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুটা পুবমুখো এগিয়ে লজ্জাবতী-ময়নামতীর দুই দরজাই পাশাপাশি বন্ধ দেখে নীলাঞ্জনা ও সি-কে বলল, ‘এরা দুজনেই আজ দুপুরে শুটিংয়ে ছিল, লজ্জাবতীকে ভালো মতো সরকারি সাহায্যের লোভ দেখিয়ে ওর কাছ থেকেই আমি সব জেনেছি । এখানে নাকি ভদ্রঘরের মেয়েরা, কলেজের ছাত্রীরাও কেউ কেউ আসে । এই ডানদিকের ঘরটা ওর, বেরলেই ওকে চেপে ধরুন, ব্লু ফিল্মের ব্যবসা এখানে কারা চালাচ্ছে জানতে পারবেন ।’

দারোগার ইঙ্গিতে দুজন কনস্টেবল এগিয়ে গিয়ে দুটো দরজাতেই প্রথমে জোরে ধাক্কা ও পরে লাথি মারতে দরজা খুলে পড়ে গেল । কোনও খদ্দের না, দুই বোন যে যার নিজের ঘরে আচমকা ঘুম ভেঙে সামনে পুলিশ দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠে বসেছে ।

দুজনকে টেনে এনে বাইরে দাঁড় করানো হল । নীলাঞ্জনা বলল, ‘পুলিশ তোমাদের কিছু বলবে না, আমাকে যে অসভ্য বায়োস্কোপের কথা বলেছিলে সেই অসভ্য বায়োস্কোপের ছবি তোলা আজ কখন শুরু হয়েছিল, কতক্ষণ চলছিল এদের বলো তো লজ্জাবতী ।’

‘আমি লজ্জাবতী না, আমি আপনারে চিনি না ।’

আরেক বোনও একইভাবে বলল, ‘আমি আপনারে চিনি না ।’

‘অ্যারেস্ট দেম । দে উইল হ্যাভ টু কনফেস ।’

দারোগার নির্দেশে দুটো মেয়েকেই মোড়ের মাথায় কালো গাড়িতে তুলে থানায় এনে লক-আপে ঢোকানো হল ।

নীলাঞ্জনা ‘থ্যাংক ইউ স্যার’ বলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ফিরে গেল ।

রাত্রে লজ্জাবতী-ময়নামতীকে একসঙ্গে বসিয়ে জেরা শুরু হল ।

দারোগা প্রথমে লজ্জাবতীকে জিজ্ঞেস করল, ‘বায়োস্কোপের ফটো তোলে বড় না ছোট ক্যামেরায়?’

‘ছোট ক্যামেরায় ।’

'তোদের পাড়ার মেয়েরা সেখানে শাড়ি-সায়াটায়া খুলে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ায়? তোরা দুজন আজ দাঁড়িয়েছিলি?'

যেমন শেখানো হয়েছিল সেইমতো ছোট ক্যামেরার কথাটা মিথ্যে বলেই বুক ঢিবঢিব করছে। দুজনের কারও মুখে কথা নেই। দারোগা কিছু বলবার আগেই লজ্জাবতী বলল 'একটা মিথ্যে বলে ফেলেছি বাবু, ছোট ক্যামেরা না, বড় ক্যামেরায় ছবি নিচ্ছিল।'

লজ্জাবতীর কোমরে রিভলবারের একটা ঘা দিয়ে দারোগা এবার হুংকার ছেড়ে বলল, 'ঠিক করে বল, ল্যাংটো হয়ে তোরাও দাঁড়িয়েছিলি?'

'একটা ব্যাটাছেলেও ছিল।'

'প্যান্ট পরা?'

'না, ন্যাংটা।'

'তোরা দুজনও ছিলিস তো?'

'আর একটা মেয়েও এসেছিল।'

'সেও এপাড়ার?'

'না, সে বাইরে থেকে এসেছিল, হাতে বই-খাতা ছিল। প্রথমে শাড়ি-বেলাউজ খুলতে চাইছিল না।'

'তিনটে মেয়ে ওখানে কী করছিলি?'

'লোকটা তিনজনের সঙ্গেই করছিল।'

'সে কী? কীভাবে? তিনজনের সঙ্গেই কীভাবে?'

'একজনকে মেঝেয় শুইয়ে, আরেক জনকে পিঠে শুইয়ে, আরেক জনকে সামনে বসিয়ে। ছবি তোলা হচ্ছে তো, তাই।'

'তোরা ওভাবে ন্যাংটা হয়ে, ব্যাটাছেলের সঙ্গে বায়োস্কোপের ছবি তুলতে দিস কেন?'

'অনেক টাকা দেয় বাবু। হপ্তাভর চল্লিশ-পঞ্চাশটা খদ্দের থেকে যা আয় হয়, একবেলা ছবি তুলিয়ে তার চেয়ে বেশি পাই বাবু।'

জবানবন্দী লিখে নিয়ে দারোগা মোটা খাতাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আঙুলের ছাপ দে। এই নে কালির বাক্স। বাঁহাতের বুড়ো আঙুল কালিতে ভিজিয়ে ঠিক এই খানটায় ছাপ দে।'

দুজনেই পর পর বুড়ো আঙুলের ছাপ দিল।

দারোগা এতক্ষণে একটা কিং সাইজ সিগারেট ধরিয়ে গাঁজার কলকের মতো দুহাতে ধরে লম্বা লম্বা কয়েকটা টান দিয়ে বলল, 'ছোট ক্যামেরাই সত্যি, কেউ জিজ্ঞেস করলে ওটাই বলবি। ল্যাংটো ব্যাটাছেলে-মেয়েছেলেদের যেসব কথা বললি, ওসব ভুলে যা, ওরকম কেউ ওখানে কখনও যায়নি, ক্যামেরার সামনে তোরাও কেউই দাঁড়াসনি। যা যা আমাকে বলেছিস, সেগুলো আর মনে আনবি না, আমি যা বলে দিলাম সেটাই তোরা

বলেছিস, তাতে আঙুলের ছাপ দিয়ে দিয়েছিস । কথাটা মনে রাখিস । যা, ঘরে যা । বড় ক্যামেরার সামনে যত পারিস ল্যাংটো হয়ে নেত্য কর ।’

দুদিন পরে নীলাঞ্জনা পশ্চিমপাড়ায় লজ্জাবতী-ময়নামতীদের দেখে কিছুটা অবাক হয়ে জানতে চাইল কে তাদের জামিনের ব্যবস্থা করল ।

জামিন কী, দুজনের কেউই জানে না শুনে নীলাঞ্জনা বলল, ‘কে তোমাদের থানা থেকে ছাড়িয়ে আনল?’

দুই বোন একসঙ্গে দারোগার শেখানো কথাটাই বলল, ‘থানায় মেয়েদের আলাদা লক-আপ নেই বলে বড়বাবু আমাদের ঘরেই থাকতে বলেছে ।’

কিছুটা দূরে, দোতলা থেকে যথারীতি নাচ গান বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে ।

পরীক্ষিৎ একদিন দুপুর রোদে নীলাঞ্জনার খোঁজে নানা জায়গায় ঘুরে পশ্চিমপাড়ায় তার চেনা-জানা লজ্জাবতী-ময়নামতীদের কাছে গিয়ে দেখল লজ্জাবতীর ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, ময়নামতী নিজের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দূরে হালুইকরের দোকানের কাউকে তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ করছে । পরীক্ষিৎ বলল, ‘কেমন আছো লজ্জাবতী?’

‘আমি লজ্জাবতী না, ময়নামতী ।’ বলে সে হাসল ।

‘আমার সঙ্গে সেই যে সরকারের দিদিমণি আসতেন, তাঁকে আজ এপাড়ায় দেখেছ?’

‘আজ দেখিনি । কয়েকদিন আগে এসেছিল ।’

কথার মধ্যেই লজ্জাবতীর ঘরের দরজা খুলে গেল । ঘর থেকে লজ্জাবতীর আগে আগে দ্রুত বেরিয়ে এল অল্পবয়সি একটা ছেলে । সারা মুখে শিশিরের মতো ঘাম । পরীক্ষিৎকে দেখে উল্টো মুখে হন হন করে হাঁটা লাগাল । দুম করে পরীক্ষিতের মনে পড়ে গেল এ তো বিরোধী দলের ছাত্র ফ্রন্টের এক নেতা, তপন না তাপস কী যেন নাম ।



২৫

রাতের বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি ভোরের দিকে কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে সকাল থেকে আবার শুরু হয়ে গেল । নীলাঞ্জনা চলে যাবে বলে পরীক্ষিতের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে । পরীক্ষিৎ হাতের তালুতে মাথা রেখে সাদা পাতার ওপর ঝুঁকে চুপ করে বসে আছে, নীলাঞ্জনা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে তার পিছনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মৃদু স্বরে বলল, ‘আমি চলে যাচ্ছি পরীক্ষিৎ ।’

‘এত বৃষ্টিতে তুমি যাবে কী করে?’

‘বৃষ্টি তো একসময় থামবেই, তখন তো যেতেই হবে ।’

‘আর দুয়েকটা দিন থেকে যেতে পারো না?’

‘পারলে চিরদিন তোমার কাছে থেকে যেতাম ।’

পরীক্ষিতের একটা হাত নিজের হাতের তালুতে অনেকক্ষণ ধরে রেখে নীলাঞ্জনা বলল, ‘এ-ক’দিনে তোমাকে দেখে বুঝেছি তুমি বড় দুঃখী, আমাকে তোমার প্রয়োজন । ভুল বলেছি?’

পরীক্ষিৎ এবার মৃদু হাসে, ‘ভুল মানুষ যখন করে, তখন ভুল বলে তাকে চেনা যায় না । আমি ভুল ধরিয়ে দিলেও তুমি মানবে না । ভুল তো তুমি করেছই । তোমার চেয়ে বয়েসে আমি কত বড় তুমি জানো?’

নির্বাক দুজনের মাঝখান দিয়ে ধীর লয়ে সময় বয়ে যায় । নীলাঞ্জনা ব্যাগ থেকে নিজের নাম-ঠিকানা ফোন নম্বর লেখা এক টুকরো কাগজ টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে বলল, ‘সরস্বতীপ্রতিমার কাছে কখনও গেলে, আমাকে ভুলে যেও না, দেখা না হলে দুঃখ পাব ।’

দেশের বিভিন্ন শহর থেকে, গ্রাম থেকে নীলাঞ্জনা পরীক্ষিৎকে চিঠি লেখে । প্যারিস থেকে পর পর দুটো এয়ারোগ্রাম পেয়ে সে তার কাজের পরিধি আঁচ করে ।

ব্রাজিলের সাওপাওলো থেকে পাঠানো হর্নবিল পাখির ডাকটিকিট লাগানো এনভেলাপ খুলে বড় চিঠি সে আগাগোড়া দুবার পড়ল । পরীক্ষিতের প্রতি তার গভীর ভালোবাসার

উত্তাপ লাইনে লাইনে । তার গবেষণার ক্ষেত্রে তার দার্শনিক নিরীক্ষণের কথাও পরীক্ষিৎকে লিখেছে ।

'বেশির ভাগ পশুপাখির মধ্যে দেখবে স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক মিলন ভালোবেসেই হয় । এটাই প্রকৃতির নিয়ম । শুধু কুকুর আর মানুষের মধ্যেই বোধহয় ধর্ষণের রেওয়াজও আছে । মানুষের মধ্যে যারা ভাগ্যদোষে কি সামাজিক শোষণে পতিতাবৃত্তি নিতে বাধ্য হয়, সেটা শুধু তাদেরই লাঞ্ছনা না, সমগ্র মানবসমাজেরই ক্যানসার । যা দেখছি, যত দেখছি, নারী-পুরুষের এই খাদ্যখাদক সম্পর্কের বিষ ততই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে । শুনলে অবাক হবে আমাদের দেশে যত মেয়ে যে পরিস্থিতিতে এ পথে আসে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি মেয়ে একই আর্থিক সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করতে বাধ্য হয় ।'

কোজাগরী পূর্ণিমার দিন সকাল থেকে নন্দিনীর দু-চোখ বেয়ে জল ঝরতে থাকে । অদ্ভুত একটা স্বরে কাঁদতে কাঁদতে সে জেদ ধরল, তাদের আগের সেই গাছবাড়িতে সেদিনই তাকে নিয়ে যেতে হবে । পরীক্ষিতের পক্ষে সেদিন নিতান্ত অসম্ভব, পরদিনও তা-ই, অগত্যা লক্ষ্মীপুজোর দুদিন পরে এক বছরের মেঘাবৃতকে সরোজিনীর কাছে রেখে নন্দিনী পরীক্ষিতের সঙ্গে সাগরখাড়ি রওনা হল । স্টেশনের দিক থেকে রিকশায় নীলাঞ্জনা আসছে, নন্দিনীর মনে ভয়, তাদের যাত্রা পণ্ড হবে না তো! ওদের গন্তব্য শুনে নীলাঞ্জনা আবদার করে সে-ও গাছবাড়িতে যাবে ।

সমুদ্রতীরে চিংড়ির জল নিংড়োনোর মেশিনের দুজন ছেলের একজন শুখা-চিংড়ির প্যাকেটের পাহাড় পাহারায় সেখানেই থেকে গেল, আরেকজন নৌকোয় তিনজনকে দ্বীপে পৌঁছে দিয়ে দ্বীপের সৈকতে নৌকো তুলে নৌকোতেই চিৎ হয়ে শুয়ে রইল ।

সিঁড়ির দড়ি পচে গাছের গুঁড়িতে এক টুকরো লেগে আছে, সিঁড়িটা জোয়ারের সময় ভেসে গিয়ে একটু দূরে কয়েকটা গাছের গোড়ায় আটকানো । পরীক্ষিৎ নীলাঞ্জনা সিঁড়ি টেনে এনে গাছবাড়িতে লাগাল । ঝড়ে ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো ছড়ানো, তার মধ্যে জোনাকি রাখার মাটির প্রদীপটা খুঁজে পেয়ে নন্দিনী সেটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ কী ভাবল, তারপর, বালিসোনার বাড়ি থেকে বেরনোর পর এই প্রথম কথা বলল, 'আমি এ ঘরে একটু একা থাকব ।'

দ্বীপের সরু এক চিলতে সৈকত ছেড়েই জঙ্গলের শুরু । দিবাকরদের গাছবাড়ি অনেক পিছনে ফেলে পরীক্ষিৎ নীলাঞ্জনা ক্রমশ জঙ্গলের আরও গভীরে চলে এসেছে । এক জায়গায় পাতলা হয়ে আসা গাছপালার পরই দীর্ঘ কাশবন । ওপরে ছড়ানো মেঘের ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সূর্যের রাঙা আলো চুঁইয়ে পড়ছে ।

এগিয়ে যাচ্ছে, না ফেরার পথ ধরেছে সে বিষয়ে কারও চেতনা নেই । ছিল স্নিগ্ধ কাশবন, এখন সামনেই মারাত্মক কেয়াঝোপ ।

কেয়াঝোপ ঘেঁষে কিছুটা এগিয়ে পরীক্ষিৎ ধন্দে পড়ল- এবার কোনদিকে? নীলাঞ্জনা সঙ্গে নেই এতক্ষণ খেয়াল করেনি । পিছনে তাকিয়ে দেখল, অস্বাভাবিক বড় একটা মাদারিগাছের মোটা গুঁড়িতে হেলান দিয়ে নীলাঞ্জনা দাঁড়িয়ে আছে । বোঝাই যায় অনেকক্ষণই সে পরীক্ষিতের চলে যাওয়ার দিকে অপলক চেয়ে আছে । তার মাথাটাও কন্টকাকীর্ণ গাছের গায়ে হেলানো, কিছুটা ডান কাতে । মুখে মাথার চুলে শেষ বিকেলের আলো অতি স্বচ্ছ রেশমফালির মতো লেগে আছে ।

মাদারিগাছের লাল রঙের পাতলা ফুলের আকর্ষণে বালকবয়েসে পরীক্ষিৎ অনেকবার কাঁটার আঁচড় খেয়েছে । নীলাঞ্জনা জ্ঞানে আছে তো!

পরীক্ষিৎ কাছে এসে নীলাঞ্জনার মুখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে দুহাতে মুখটা ধরে ধীরে ধীরে নিজের দিকে টেনে নিল ।

‘তোমার জীবন থেকে আমি সত্যিই ঝরে গেলে তুমি হয়তো টেরও পাবে না পরীক্ষিৎ ।’ এই প্রথম তার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়ল ।

‘আমি তো জানিই না তুমি আমার সঙ্গে আসছ না ।’

‘কী ভাবছিলাম জানো? তুমি যদি এই দ্বীপে আমাকে একা রেখে চলেও যাও, আমি পিছু ডাকব না ।’

কথা শেষ হতে না হতেই পরীক্ষিতের বাঁ কনুই তুলে ধরে বলে উঠল, ‘এ কী! কাটল কী করে?’

‘কী জানি! হয়তো কেয়াপাতায় ।’

‘এ তো রক্তের ধারা নামছে! চোষো, চোষো, চুষে নাও ।’

পরীক্ষিতের দ্বিধা দেখে নীলাঞ্জনা হঠাৎই নিচু হয়ে রক্তরেখায় মুখ লাগিয়ে চুষতে শুরু করেছে ।

পরীক্ষিৎ বলল, ‘সাপে কাটলে ওঝারা এভাবে বিষ ঝাড়ে দেখেছি ।’

নীলাঞ্জনা মুখ তুলল । রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে । বলল, ‘আমি তো তোমার বিষই ঝাড়লাম । তুমি আমাকে অমৃত দাও ।’

সূর্য এখানে অনেকটা সময় নিয়ে অস্ত যায় ।

তৃণশয্যায় নগ্ন যুগলমূর্তির ওপর দিয়ে একটা সাপ ধীরে ধীরে কখন একদিক থেকে আরেকদিকে চলে গেছে, দুজনের কেউই টের পায়নি ।

ক্রমশ সূর্য ডুবে গেলে নারকেলবনের সারির ফাঁকে তখনও রঙিন আভা, পুবদিকে দ্বাদশীর সদ্যোজাত হালকা জ্যোৎস্না, দুজনে উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে হাঁটতে নীলাঞ্জনা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, ‘চলো, ফিরে যাই । যাবে? সেই আমাদের তৃণশয্যায়? ওই আদিম জঙ্গল, প্রাণী বলতে শুধু আমরা- তুমি কী ভাবছ?’

‘ভাবব কী, আমার মন থেকে দুটো চোখ কিছুতেই মুছতে পারছি না । প্রথমে ভেবেছিলাম প্যাঁচা, পরে দেখলাম মানুষ । একটা লোক উবু হয়ে বসে চোখের সামনের লতাগুল্মভম দুহাতে সরিয়ে নিষ্পলক চোখে তোমাকে দেখছে, তুমি যখন উঠে দাঁড়িয়েছ তখনই প্রথম দেখলাম ।’

পরীক্ষিৎ এবার সময় নিয়ে আবার বলল, ‘মানুষের শরীর বোধহয় মহাকাশের মতোই বিস্ময়কর ।’

গাছবাড়ি খুঁজে পাওয়ার যেন তাড়া নেই, বড় বড় প্রাচীন সব গাছের বাধা পেরিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে আসার পথে নীলাঞ্জনা এবার বলল, ‘আজকের এই জঙ্গল, এই সন্ধ্যা তুমি ভুলে যাবে?’ কথাটা বলে পরীক্ষিতের মুখের দিকে চাইল ।

বিলম্বিত জ্যোৎস্নায় অনেকক্ষণ অনুমানে অচেনা জঙ্গলে হাঁটার পর নীলাঞ্জনার সন্দেহ হল তারা পথ হারিয়েছে । পরীক্ষিতের মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই ।

দূর থেকে সমুদ্রের শব্দ শুনে নীলাঞ্জনা হঠাৎ বলল, ‘আমার একটা কথা মনে আসছে । অভাগা মেয়েদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের জন্য দুনিয়া জুড়ে একটা আন্দোলন করা যায় না? একটা চিন্তার বিপ্লব?’

পরীক্ষিৎ অন্যমনস্কভাবে বলল, ‘দিবাকরকে যারা খুন করল তারাও কি বিপ্লবই করছে?’

‘সে কি? কবে? ওকে কারা খুন করবে?’

আবার অনেকক্ষণ কারও কোনও কথা নেই, ডালপালা সরিয়ে পথ করার আওয়াজও ঝিঁঝিঁর একটানা তীক্ষ্ণ ডাকে চাপা পড়ে যাচ্ছে ।

গাছবাড়ির কাছাকাছি এসে নীলাঞ্জনা জিজ্ঞেস করল, ‘কী ভাবছ বলো তো?’

‘ভাবছি এরপর কী? যা কিছু ঘটছে তার শেষ কোথায়?’

নন্দিনী ঘরের মধ্যে কারও সঙ্গে কথা বলছে । যে-ছেলেটা নৌকো বেয়ে কাল সকালে সৈকতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে সে-ই হয়তো এসেছে । হয়তো দিবাকরের খবর চায় । পরীক্ষিৎ ঘরে ঢুকে দেখল, নন্দিনী কাঠের রং-চটা দেওয়ালের দিকে মুখ করে হাত মাথা নেড়ে একা একা কথা বলছে, ‘অত ঘন কোঁকড়া চুলে জোনাকির ঝাঁক বাসা বাঁধল কী করে? চুল যদি পুড়ে যায়? চুলের ছায়ায় তোমার মুখ ঢেকে যাচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না গো ।’

বালিসোনা থেকে আনা টিফিন ক্যারিয়ার খুলে নীলাঞ্জনা পুরি হালুয়া নিমকি সন্দেশ নন্দিনীকে দিতে এসে নিঃশব্দে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল ।

পরীক্ষিৎ গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, ‘নন্দিনী! যেটুকু পারো খেয়ে শুয়ে পড়ো । কাল ভোর-ভোর বেরতে পারলে ভালো হয় ।’

নন্দিনী ঘোর ভেঙে পরীক্ষিতদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ।

সমুদ্রসৈকত ছেড়ে যাবার আগে, পরীক্ষিৎ চিংড়ি-মেশিনের ছেলেদুটির সঙ্গে কথা বলল। ছেলেদুটি জানাল, কাছাকাছি দোকান-বাজারে খুব সস্তায় সের দরে চিংড়ির প্যাকেট পৌঁছে দিয়ে যা পাওয়া যায় তা দিয়ে তারা কোনওরকমে কাজটা চালু রেখেছে। লিওন যেমন বলে দিয়েছিল, পরীক্ষিৎ সেইমতো চিংড়ি মেশিনের ছেলে দুটিকে জানাল, এরপর থেকে দিবাকরের লিওনদাদা এই ব্যবসা দেখবে। শিগগিরই এসে টাকাও দিয়ে যাবে। বিপণনের ব্যবস্থাও করবে সে-ই।

'দিবাকরদা আর আসবে না?' এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে তিনজন নদী পার হয়ে গেল।

জুলাই মাসের গোড়ায় একদিন বেলাবেলি লিওনার্দো পরীক্ষিতের সঙ্গে এসে অসীম সৈকতের কোথাও শুখাচিংড়ির কারখানা দেখতে পেল না। সাগরখাঁড়ি জায়গাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেই সৈকতটাই সমুদ্রে তলিয়ে গেছে দেখে কারখানার ছেলে দুটো হয়তো সাগরের আরও ভেতরের দ্বীপে, হয়তো দিবাকরের গাছবাড়িতে যন্ত্র তুলে নিয়ে গেছে- এমন অনুমান করে একটা জেলেডিঙিতে তারা দ্বীপের দিকে এগিয়ে চলল।

চারদিকে সমুদ্র, দ্বীপ কোথাও নেই।

তীর ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে এসে ডিঙি-বাওয়া জেলে সাগরে জাল নামিয়ে দিয়েছিল, বাবুদের কথা থেকে আঁচ পেয়ে বলল, 'আপনারা কি কিছু খুঁজতে এয়েছেন বাবু?'

পরীক্ষিৎ বলল, 'এখানে কোথাও একটা দ্বীপে একটা গাছবাড়ি ছিল না?'

'এখনও আছে, জলের নীচে। গাছবাড়ির ভাঙা-পচা কাঠের টুকরা-টাকরা, সমসারের দু-একখানা সামগ্গিরি মাঝেমধ্যে জালে ওঠে।'

ফেরার পথে নদীর পাড়ে শুখাচিংড়ির ছেলে-দুটোর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। পরীক্ষিৎদের সামনে ঝুঁকে করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দিবাকরদা কবে আসবে?'

'ইনি দিবাকরের লিওনদাদাবাবু। চিংড়িকারখানার জন্য কিছু টাকা এনেছেন।'

'সে-কারখানা সাগর গিলে খেয়েছে বাবু। আমরা এখন সাপধরার কাজ করি। ওষুধকারখানায় সাপের বিষ সাপ্লাই দিই।'

আকাশ কালো করে বৃষ্টি আসছে। লিওন ছেলেটার দিকে টাকা বাড়িয়ে ধরে বলল, 'এটা রাখো।'

'দিবাকরদার সেই যন্ত্রই তো নেই, টাকা দিয়ে আর কী হবে বাবু!'

'তবু রাখো। সাপধরা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক, তোমরা তো বেদে নও। পারলে একাজ ছেড়ে অন্য কিছু করো।'

'জন্ম থেকে আমাদের তো বাবু সাপ-খোপ নিয়েই জীবন কাটে। এই বর্ষাকালেই ফি বছর কত লোককে এখানে সাপে কাটে।'

ছেলে-দুটোকে দূরের নারকেলবনের দিকে হারিয়ে যেতে দেখে লিওন-পরীক্ষিৎও মেঘ-বিদ্যুৎ মাথায় নদী পার হতে এগিয়ে গেল।



২৬

বাদায় সকাল থেকে লোক আসার আর বিরাম নেই। বেলা যত বাড়ে ভিড়ও তত বাড়ে। যেখানে বুজকুরি কেটে জল উঠছে সকলেই সবার আগে সেই জায়গাটা দেখতে চায়।

জলের উৎসমুখ জলে ঢাকা, শুধু বুজকুরি উঠে বৃত্তাকারে জল বেড়ে চলেছে। হারানো নদীর খোঁজে বেশ কয়েকটা গর্ভীর গর্ত খোঁড়া হয়েছিল তারই কোনওটা থেকে হয়তো অবিরাম জল উঠছে।

জল যত বাড়ে, মানুষের আনাগোনাও তত বাড়ে। তৃতীয় সপ্তাহে অম্বরীশের কাটা খাত ধরে হঠাৎই একদিন উত্তরে দক্ষিণে জল ছুটতে লাগল। সাউথ উইন্ড টাউনশিপের গভীর করে খোঁড়া দীর্ঘ ভিতও আর আলাদা করে বোঝা যায় না।

সারাদিনের কাজের শেষে চারজন মাটি-তোলা শ্রমিক গর্তের ঠান্ডায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, তিনদিন পর আবার তাদের জলে-ফোলা শবদেহ পাওয়া গেল বালিসোনার পাঁচ গ্রাম পরের সোনাগুঁড়া গ্রামের নারকেললসারির নীচে যেখানে বহু যুগ পরে শীর্ণকায় নদী হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসে আছড়ে পড়েছে।

‘বলা নেই কওয়া নেই, এমন কৌশিকী ষাঁড়াসাড়িঁর বান এল কোত্থেকে?’ বালিসোনার বয়োবৃদ্ধদের মনে ভয়, অল্পবয়সিদের মনে উত্তেজনা। অশুভ সংকেত ধরে নিয়ে গৃহবধূরা পুজো দেয়। বান যদি, তবে আর নামে না কেন- তা নিয়ে পথে-ঘাটে, মাঠে-বাজারে আলোচনা তর্কাতর্কি দিনে দিনে বেড়ে চলল।

অম্বরীশের কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া ঘাটের ধ্বংসাবশেষের নকশা ও অবস্থান অনুযায়ী একটা ঘাট নির্মাণ করা হবে, পরীক্ষিৎ তার সাধ ও কল্পনা মতো শহর থেকে সাদা পাথরে ‘মিতাম্ববþ শাখানদী’ লিখিয়ে একটা স্তম্ভের গায়ে বসাচ্ছে, পর পর তিনটে জিপে পুলিশ ও দুটো অ্যাম্বাসাডরে কয়েকজন সরকারি অফিসার এসে কাজ থামাবার নির্দেশ দিল। একজন সরকারি অফিসার পরীক্ষিতের সামনে এসে কড়া স্বরে বলল, ‘এ জমি সরকারি, সরকার লিজ দিয়েছে। অন্য কেউ এখানে কিছু করার চেষ্টা করলে সেটা আইনের চোখে অপরাধ, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।’

একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে একটা অস্পষ্ট কার্বন কপি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আর এক মিনিট এখানে থাকলে এই কোর্ট অর্ডার অনুযায়ী আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব ।'

সরকারি অফিসারদের আরেকজন যোগ করল , 'আপনার মতো শিক্ষিত মানুষ ভুললেন কী করে সরকারের জমিতে বিনা অনুমতিতে কিছু করা যায় না!'

'এ তো জমি না, নদী!'

'নদীর নীচেই জমি আছে ।'

'ভুল । জমির নীচে এই নদী প্রাচীন কাল থেকেই ছিল । মানুষই তাকে মাটি চাপা দিয়েছে ।'

'ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট! চলুন, আমার সঙ্গে থানায় চলুন, কাল আপনাকে কোর্টে প্রডিউস করা হবে ।'

আসামীকে জিপে তুলে কিংসাইজ সিগারেট ধরিয়ে অভ্যাসবশে দু-হাতের তালুতে গাঁজার কলকের মতো ধরে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পুলিশ অফিসার না বলে পারল না, 'আপনাদের মতো চিন্তাশীলদের জন্যই আজকাল পুলিশের কাজ বেড়ে গেছে! সেবার তো দেখলেন, বেশ্যাপাড়ায় রেইড করে কিছু পাওয়া গেল?'

পরীক্ষিৎ এতক্ষণে চিনেছে, এ সেই ও-সি, যে নন্দিনীকে জেরায় নাস্তানাবুদ করে তুলেছিল । নীলাঞ্জনাকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমপাড়ায় সাজানো রেইডে গিয়েছিল!

দুপুর থেকে বসিয়ে রেখে সন্ধে নাগাদ একজন কনস্টেবল এসে পরীক্ষিৎকে জানাল বড়বাবু বলে পাঠিয়েছেন আপনি বাড়ি চলে যেতে পারেন ।

নদীর নামকরণ ও ঘাট নির্মাণে সরকারি বাধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য পরীক্ষিত থানা থেকে লক্ষ্মী-লিওনের বাড়ি গিয়ে দেখল শিবকৃষ্ণের সাধনসঙ্গী উমাশশীও এসে বসে আছে । সকলের মুখ থমথমে, উমাশশীর বাড়িতে আজ সকাল থেকেই অরন্ধন ।

শিবকৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে নীলাম্বরের ভর্তি হওয়ার সুযোগ নেই, লিওনদের স্কুল পুরোপুরি আবাসিক, তার মা তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না, ফলে সেখানেও সে ভর্তি হতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির ফ্রি স্কুলে নাম লেখাতে হয়েছে । তার এমন ভয়ানক দাম দিতে হবে কেউ ভাবেনি ।

দাম শুনে পরীক্ষিতের মুখও অন্ধকার ।

'জানেন ভাই, কী হয়েছে? কী আর বলব দাদা, আপনাদের?' -বলে উমাশশী উদ্বেগভরে বলে চলল, 'কাল স্কুল থেকে ফিরে নীলাম্বর আমাকে কী বলল জানেন? বলল- 'আমার ফিতে' ইংরিজিতে কী মা? আমি যখন জানতে চাইলাম, তোকে এসব কে বলেছে? তখন কী বলল আপনারা ভাবতে পারবেন না । বলল ওদের স্কুলের দু-ক্লাস উঁচুতে কে

এক হলধরদা আছে, সে আমাদের স্কুলের ক্লাস টেনের মেয়েদের আমার ফিতের ইংরিজি জিজ্ঞেস করতে বলেছে । আরও এরকম কী কী শিখছে ভগবান জানেন! আমি আজ রান্নাঘর খুলিনি, ওকে স্কুলেও যেতে দিইনি ।'

সকলেই পরস্পরের দিকে চিন্তিত চোখে তাকায় । পরীক্ষিৎ শোক পালনের নীরবতা ভেঙে হঠাৎ স্বগতোক্তির মতো বলে উঠল, 'কী অপরূপ আদিগন্ত ধানখেত ছিল এখানে । ধানখেতের ঢেউ লেগে লাল টালির বাড়িটা যেন আবেশে দুলত । সেসব কোথায় গেল!'

লক্ষ্মীদি ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সত্যি রে, পরীক্ষিৎ । কত পাখি আসত এখানে, আর আসে না ।'

'লক্ষ্মীদি, তোমার মনে আছে, মিতার সঙ্গে এখান থেকে চলে যাবার পরও আমি যখনই আসতাম ফিরতে চাইতাম না!'

উমাশশী উদ্বেগ আর ধরে রাখতে পারল না । লিওনের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনাদের স্কুলে এখন আর ভর্তি হওয়া যায় না? হোস্টেলে থেকেই না-হয় পড়ুক । ছেলে তো মানুষ হবে । ওকে বাড়িতে রাখতে আর ভরসা পাচ্ছি না । ছি ছি!'

লক্ষ্মী আশ্বাস দিল, ক্লাসের সিট ও হোস্টেলের ব্যবস্থা দেখে কিছু একটা নিশ্চয়ই করা যাবে ।

বাবার সারা জীবনের স্বপ্নের সঙ্গে মায়ের নাম জুড়ে দেবার ইচ্ছে থেকে নতুন এই আঞ্চলিক নদীর নাম 'মিতাম্বর শাখানদী' । এ নাম লক্ষ্মী লিওন অবনীমোহন সরোজিনী সকলেরই পছন্দ । ঘাট নির্মাণের বাধা দূর করতে অন্যদের সঙ্গে মেজো জ্যাঠাবাবুরও পরামর্শ নেওয়া হল । সেজোজ্যাঠা ও তার দলনেতাদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও ঐতিহাসিক ঘাট নির্মাণের পক্ষে বালিসোনার মানুষের সাত হাজার স্বাক্ষর ও তেরো হাজার টিপ সই পুরসভায়, পুরমন্ত্রণালয়ে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরে জমা দিয়ে সরকারকে অনুমতি দিতে বাধ্য করা হল ।

জল একইভাবে বেড়ে চলেছে । সাউথ উইন্ড টাউনশিপের যেটুÅকু বা কাজ হচ্ছিল, তার সবটাই জলের তলায় । কপিখেতের যুদ্ধের শহীদদের স্মৃতিফলকের ডগাটুÅকু শুধু জেগে আছে ।

দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় পরীক্ষিৎ নদীর ধারে ঘুরে বেড়ায় । কখনও নির্মীয়মাণ ঘাটের দেওয়ালে মাথা রেখে বহু দূরের দিকে চেয়ে থাকে । মাঝে মাঝে মাথা একপাশে ঢুলে পড়েই সোজা হয়ে যাচ্ছে দেখলে বোঝে দু-চার মিনিট ঘুমিয়েও পড়েছিল ।

সমুদ্রে সাংঘাতিক জলোচ্ছ্বাসের বিস্তারিত খবর বালিসোনায় পৌঁছল ঘটনার অনেকদিন পর । কুড়ি-পঁচিশ ফুট উঁচু ঢেউয়ের তোড়ে তীরের চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে গ্রামের পর গ্রাম চিরতরে তলিয়ে গেছে । সরকারি হিসেবে মানুষ মারা গেছে তিনশো সাতান্ন জন । নিখোঁজের সংখ্যা চার হাজার । তাছাড়া এগারটা নদী-শাখানদী-উপনদীর গতিপথ কম-

বেশি বদলে গেছে । তার সঙ্গে বালিসোনা নদীর পুনর্জন্মের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও যোগসূত্র আছে কিনা সেটা এখনও জানা যায়নি । লিওনের মতে ইন্দোনেশিয়ায় বালিদ্বীপের হোলিস্প্রিং মন্দিরের কুন্ড যেমন অবিরাম পাতাল ফুঁড়ে ওঠা জলেরই সৃষ্টি, এ-ও হয়তো তেমনই, পাতাল-নদী । কে একজন বলল, পাতালগঙ্গা নয় তো?

একদিন গোধূলিতে গাছের মোটামোটা ডাল বেঁধে তৈরি নৌকোর মতো একটা জলযান অসমাপ্ত ঘাটে এসে নোঙর করল । জোর বাতাসে ফুলে-ওঠা খুব উঁচু পালের নীচে দু-পাশের দুই গুঁড়ির ওপর পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে রোগা ঢ্যাঙা একটা লোক । বয়স চল্লিশ হতে পারে, ষাটও হতে পারে, সঠিক আন্দাজ করা যায় না । দুই গুঁড়ির মাঝখানের বিরাট ফাঁকা জায়গা থেকে জল ছিটকে উঠে লোকটার প্যান্টের পা ভিজিয়ে দিচ্ছে । গায়ে নানা রঙের ছিটকাপড় জোড়া দেওয়া ঢিলে-ঢালা জ্যাকেট, মাথায় বেতের ছুঁচলো টুপিতে ময়ূরের পালক গোঁজা, কোমরে তলোয়ারের মতো কাঁচা কাঠের দিশি বেহালা ঝুলছে ।

পালতোলা, অথচ নৌকোও ঠিক না, অদ্ভুত চেহারার এই বাহন বালিসোনায় কেউ কখনও দেখেনি । নৌকো থেকে নেমে লোকটি অসমাপ্ত সিঁড়ির ঢাল বেয়ে পরীক্ষিতের সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, ‘স্বর্গত অম্বরীশ চৌধুরীর বাড়ি কোন দিকে বলতে পারেন ভাই?’

পরীক্ষিৎ চমকে উঠে দাঁড়ায় । লোকটার টুপির পিছনে আকাশ রাঙিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, ফলে তার মুখ আরও অস্পষ্ট, প্রায় অন্ধকার, পরীক্ষিৎ সম্পূর্ণ সংশয়াচ্ছন্ন মনে নিয়ে জানতে চাইল- ‘আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন? আপনার নাম কী? কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন?’

‘আসছি নেগম্বো থেকে । না, না, নিকোবর থেকে, এটাও ভুল বললাম, আসছি ফিফি দ্বীপ থেকে । হয়তো এটাও ভুল । এই আজকাল আমার হয়েছে, সবসময় সব কিছুর নাম ভুলে যাই । মনে পড়েছে, এখন আসছি রাশিয়ার মারস্মার্ক বন্দর থেকে, না কী, কে জানে- হয়তো ব্লাডিভস্টক থেকে । দূর ছাই, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে- এখন আসছি ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের ফোতোভেনতুরা থেকে । মুশকিল কী জানেন, যত বলি ততই ভুল বলি । ধরে নিন চূর্ণী বা জলঙ্গী নদী থেকে আসছি । কোত্থেকে আসছি-র থেকে, কোথায় এলাম অনেক বড় ব্যাপার । তার চেয়ে বড় কথা, আমার নাম বীরবল বিদুষক, না, না, আলাউদ্দিন খিলজি, দূর ছাই, মনে পড়ে না কেন? আমার নাম কী জানেন? চেঙ্গিস খান, নাকি কুবলাই খান, না না, আমার নাম কলম্বাস, এও বোধহয় ভুল বললাম, আমার নাম কি তবে আলেকজান্ডার, নাকি হিউয়েন সাং? ভাস্কো ডা গামা বলেছি নাকি? আমার নাম মনে হয় আলেকজান্ডারই হবে । সবচেয়ে বড় কথা আমি জাহাঙ্গীরসাহেবের নোকর । এখন বলুন তো স্বর্গত অম্বরীশ চৌধুরীর বাড়ি কোন দিকে?’

কথা বলে শরীর দুলিয়ে-দুমড়িয়ে, সামনে-পিছনে ঘন ঘন ঘাড় ঝাঁকিয়ে। তারই ফাঁকে ফাঁকে অস্তগামী সূর্যের মেঘফাটা আলো হঠাৎ হঠাৎ পরীক্ষিতের চোখের ওপর ঝাঁপায়। লোকটার কোমরের বেহালার সঙ্গে প্যান্টের ঢোলা পকেটের কঠিন কিছুর ঠোকাঠুকি পরীক্ষিতের কান এড়াল না।

'আমার সঙ্গে আসুন। অম্বরীশ চৌধুরী আমার বাবা। জাহাঙ্গীরসাহেব এখন কোথায় আছেন?'

টুপিটা একবার খুলে জোরে জোরে তার ভেতরে বার-কতক ফুঁ দিয়ে আবার পরে নিয়ে হাতের বিচিত্র ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে আলেকজান্ডার বলল, 'তিনি এখন রেকিয়াভিক, না না, নানোরতালিকে তাঁর সাগরবিবির সঙ্গে নিদ্রা গেছেন। ভুল, একদম ভুল বলেছি। তিনি একটা অন্ধ ছেলেকে নিয়ে লন্ডনে চোখের হাসপাতালে দিন-রাত্তির এক করে দিচ্ছেন। ভুল নাকি? এটাও কি ভুল বললাম? মনে পড়েছে, তাসিলাকের পথে প্রচণ্ড ঝড়ে জাহাজডুবি হতে হতে বেঁচে গিয়ে তিনি জাহাজের ছাদে বসে বালিসোনার নকশা আঁকতে লেগেছেন। না না, এই ঠিক মনে পড়েছে- জলদস্যুদের আক্রমণে বিধ্বস্ত একটা জাহাজ থেকে একটা মেয়েকে উদ্ধার করতে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন। এই এক মুশকিল। যত বলি তত ভুল বলি। এই দেখুন না, 'দরিয়াবিবি' বললাম তো-?'

'সাগরবিবি বলেছেন?'

'সাগরবিবি ভুল, দরিয়াবিবি ঠিক।'

টুপি খোলার সময় পড়ে যাওয়া ময়ূরের পালক ফিরিয়ে দিয়ে পরীক্ষিৎ বলল, 'দরিয়াবিবি কে?'

'সম্রাট জাহাঙ্গীরের যেমন নূরজাহান, জাহাঙ্গীরসাহেবের তেমনই দরিয়াবিবি।'

'জাহাঙ্গীরসাহেব বলেছিলেন, তিনকুলে ওঁর কেউ নেই-'

'কুলে তো নেই, সমুদ্রে আছে। আমিও সমুদ্র থেকেই আসছি। আপনাকেই আমার দরকার।'

বাড়ি পর্যন্ত এসে প্যান্টের পকেট থেকে একটা কাঠের বাক্স বের করে পরীক্ষিতের হাতে দিয়ে বাক্সের গায়ের লেখাটা দেখিয়ে বলল, 'এই যে দেখছেন আইসল্যান্ড লেখা, এদিকে আইসল্যান্ডের মাটি, আর ওপাশে গ্রিনল্যান্ড লেখাটা দেখেছেন? ওদিকে গ্রিনল্যান্ডের মাটি, মাঝখানে পার্টিশান। এই মাটি আপনার বাবার কবরে ছড়িয়ে দেবেন। জাহাঙ্গীরসাহেব নিজে আসতে পারলেন না, তাই আমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।'

কথাটা বলেই লোকটা সোজা উল্টো মুখে হন হন করে ঘাটের পথে হাঁটা লাগাল।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, আজকের রাতটা এখানে থেকে যান।' বলতে বলতে পরীক্ষিৎ দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরার আগেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, অসমাপ্ত সিঁড়ির ধাপে তার কপাল ঠুকে গেছে। নির্জন সন্ধ্যায় নদীর হাওয়ায় এমন গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল তার

নিজেরই বিশ্বাস হয় না । তাছাড়া যেসব কথা লোকটা বলল সেসব তো সত্যিও হতে পারে, অথচ আইসল্যান্ড-গ্রিনল্যান্ডের মাটির অংশটা বাদে পরীক্ষিৎ কোনওটার বিন্দুবিসর্গ জানত না । তবে এই যে বলে গেল- তার ওই অদ্ভুত নৌকোটা আসলে ক্যাটামেরন, তামিল ভাষায় ক্যাটা মানে গাছ আর ম্যারন মানে বাঁধা, এখন মনে পড়ছে পরীক্ষিত সেটা অম্বরীশের লংকাদ্বীপের কাগজপত্রের মধ্যে দেখেছিল । সেখানে ক্যাটামেরনের একটা স্কেচও ছিল । বড় বড় গাছের ডাল বেঁধে নৌকোর মতো একটা যান । তাহলেও কি এটাকে স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে! ওর অনেক কথাই তো পরীক্ষিৎ আগে কারও কাছে শোনেনি! আবার স্বপ্নই যদি না হবে তাহলে সেই কাঠের বাক্স কোথায় গেল? আর সেই অদ্ভুত ক্যাটামেরন? নদীতে নৌকো বাওয়ার মতো জলই তো নেই!



২৭

বালিসোনায় প্রতিবছর শীতকালে কুয়াশা যেন বেড়েই চলেছে । এরকম এক শীতের কুয়াশা ঢাকা ভোরে চৌধুরীবাড়ির দরজার ভারি কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল । এবারও জাহাঙ্গীর । সঙ্গে লজ্জাবতী-ময়নামতীর সেই জন্মান্ধ ভাই ।

জাহাঙ্গীর জানাল, ছেলেটাকে নিয়ে যাবার পর থেকেই তার জীবনে অনেক শুভ ঘটনা ঘটছে । সে জন্য আজন্ম নামহীন ছেলেটার নাম রেখেছে শুভ ।

শুভ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আমার দিদিরা কেমন আছে? আমি দিদিদের কাছে একবার যাব । দুজনের জন্য অনেক কিছু এনেছি ।'

পরীক্ষিৎ জাহাঙ্গীরকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কাঠের বাক্সে দু-দেশের মাটি নিয়ে এসেছেন? ডালায় দু-দেশের নাম পাশাপাশি লেখা?'

'আশ্চর্য! আশ্চর্য! তুমি কী করে জানলে? তুমি কি আল্লার দূত? আল্লার করুণা তুমি পেয়েছ?'

দুদিন পরে অম্বরীশের মৃত্যুদিনে তার সমাধিতে পরীক্ষিৎ পারমিতা ও তাদের অনুরোধে জাহাঙ্গীর প্রথমে আইসল্যান্ডের, পরে গ্রিনল্যান্ডের মাটি ছড়িয়ে দিল । অবনীমোহন সেদিন ভোর থেকেই ভাইয়ের সমাধির পাশে বসে দীর্ঘক্ষণ ধ্যানে কাটাল । সরোজিনী প্রতিবারের মতো ফুল ছড়িয়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে যাবার সময় নন্দিনীর ছেলে মেঘাবৃতর কচি হাতে কয়েকটা ফুল গুঁজে দিয়ে গেল । লিওনার্দো নিজের বুকে ক্রশ এঁকে তাদের মেয়ের দু-হাতের ফুল কবরের ধারে ছড়ানো শেষ না হওয়া পর্যন্ত লক্ষ্মীকে হাতের আড়াল দিয়ে হাওয়া বাঁচিয়ে পর পর অনেকগুলো ধূপকাঠি ধরাতে সাহায্য করে ।

আগের দু-রাতের মতো রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর পরীক্ষিৎ জাহাঙ্গীরকে অতিথিকক্ষে পৌঁছে দিয়ে চলে আসবার সময় জাহাঙ্গীর তাকে বসতে বলল ।

'বালিসোনার কথা কিছু ভাবছ? এখানকার নতুন নতুন দোকান-বাজার বা ব্যবসা-বাণিজ্যের বদলে যাওয়ার ধরন আর চাষের জমির ব্যবহার- এই দুটো বিষয় নিয়ে ভাবো, দ্যাখো কিছু করা যায় কি না । আল্লাহ যখন নদী ফিরিয়ে দিয়েছে তখন এখানকার মাটিতে

মানুষের মনও হয়তো নতুন করে গড়া যাবে । অম্বরীশের স্বপ্ন ছিল বিরাট, জীবন ছিল ছোট । সে নদী এনেছে, তুমি মানুষ আনো ।'

পরীক্ষিৎ সোফায় বসে মুখ নিচু করে শুনছিল । মাথা তুলে বলল, 'দরিয়াবিবি আপনার কে হয়?'

'দরিয়াবিবি?'

'সম্রাট জাহাঙ্গীরের যেমন নূরজাহান, আপনার তেমনই দরিয়াবিবি, তাই তো? আপনি বলেছিলেন, আপনার কেউ নেই ।'

'দরিয়াবিবি, নূরজাহান- এসব কী বলছ তুমি?'

'আলেকজান্ডার নামে আপনার কোনও কর্মচারী আছে?'

জাহাঙ্গীর বিছানায় বসে কথা বলছিল, লাফিয়ে উঠে বলল, 'আলেকজান্ডার? কী ব্যাপার বলো তো? আমার একজন কর্মচারী ছিল, তার নাম আলালুদ্দিন । একবার মাঝসমুদ্রে জাহাজডুবি হতে হতে বেঁচে ফিরি, ও আর ফিরতে পারেনি ।'

'দরিয়াবিবি বা সাগরবিবি বলেও কি কেউ নেই?'

'এসব নাম তুমি পেলে কোত্থেকে? সাগর, দরিয়া- আমার তো কোনও বিবিই নেই । তবে একজন ছিল, সে আমার কেউ না, আলালুদ্দিন তাকে বুয়েনস-বিবি বলত ।' খানিক চুপ থেকে জাহাঙ্গীর আবার বলল, 'আমার জীবনে অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে, সমুদ্রে অনেক আশ্চর্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু সান্দ্রা আরান্দার সঙ্গে আলালুদ্দিনের প্রেম দেখে ভেবেছি এ কী করে সম্ভব? ওই একবারই আমি আমার জীবন নিয়ে আফশোস করেছি! উন্মাদ সমুদ্রঝড়ে মারাত্মক বিদ্যুৎচমকের মতো ওই একবারই আমার হৃৎপিণ্ড চলকে উঠেছিল! আর্জেন্টিনার মেয়ে, জলদস্যুদের হঠাৎ হানায় জাহাজের প্রায় সবাই যখন হয় মৃত, নয় বন্দী, তখন সে জলে ঝাঁপ দেয় । আমিই তাকে আল্লার কৃপায় উদ্ধার করি । আমার জাহাজ থেকে সমুদ্রে জোডিয়াক নামিয়ে আলালুদ্দিনকে দায়িত্ব দিই সবচেয়ে কাছের বন্দরে নিয়ে যেতে । যতদিন না তার দেশের আপনজনদের সন্ধান মেলে ততদিন সেই বন্দরশহরে তার থাকার ব্যবস্থা করে দিই । দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছিলাম আলালুদ্দিনকে । হয়তো জোডিয়াকে তুলে নেবার পর থেকেই আলালুদ্দিন ওর প্রেমে পড়ে যায় । সান্দ্রাকে সে বুয়েনস-বিবি বলত । আলালুদ্দিনের মৃত্যুর খবর পেয়ে সান্দ্রা সেই যে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল, চার মাস পর মারা যাবার আগে পর্যন্ত তাকে আর কিছু খাওয়ানো যায়নি । ওষুধও না ।'

আবার চুপ । এবার বলল, 'তুমি বালিসোনার কথা ভাবো । আমার দিক থেকে সবরকম সাহায্য তুমি পাবে । চালুÅ লাইনসুদ্ধু জাহাজ বিক্রি করেও আমি চলে আসতে পারি । আমার জীবনে ওই একজনই বন্ধু- অম্বরীশ ।'

লজ্জাবতী-ময়নামতী ভাইকে এরকম পরিবেশে আসতে দেবে কিনা তা নিয়ে পরীক্ষিতের মনে সংশয় ছিল। প্রসঙ্গটা তোলবার আগেই বালিসোনায় ভাই এসেছে শুনে দুই বোন আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

পরীক্ষিৎ তবু বলল, 'ভাইয়ের সঙ্গে কোথায় দেখা করতে চাও?'

'আমাদের তো কোথাও যাবার উপায় নেই, ওকেই এখানে নিয়ে আসুন। একবার অন্তত চোখের দেখা দেখে নিই।'

শুনে শুভরও আর তর সয় না। বেলা থাকতে থাকতে পরীক্ষিতের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

মুখে পুরু পাউডার, ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, ঝলমলে শাড়ি-ব্লাউজে সেজে তার দিদিরা দরজার বাইরে কেন দাঁড়িয়ে আছে ভেবে না পেয়ে শুভ দুজনের হাতে গার্নেটের লাল টকটকে বালা তুলে দিতে দিতে বলল, 'আমি আসব বলে তোমরা এমন সেজেছ?'

'তুই দেখতে পাস? তুই আমাদের দেখতে পাচ্ছিস? মা গো!'

প্রথম বাক্যটা লজ্জাবতীর। দ্বিতীয়টা ময়নামতীর। 'মাগো!' দুজনের একসঙ্গে কঁকিয়ে ওঠা।

'এটা খুব বিচ্ছিরি জায়গা! ফিশিং-হারবারের মতো আঁশটে গন্ধ!' শুভর মুখ থেকে সব খুশি নিমেষে মুছে গেল।

দুই বোন গলা চিরে চেঁচিয়ে উঠল- 'ওকে এখানে আনলেন কেন?'

'তোমরাই তো বললে।'

'ও যে দেখতে পায় বলেননি তো?'

'এখন চোখে দেখতে পাচ্ছে বলে তোমরা খুশি হওনি?'

এক মাঝবয়সি মাতাল 'লজ্জাবতীর লজ্জা ভাঙতে এয়েচি গো!' বলতে বলতে ময়নামতীর চিবুক ধরে আদর করতেই ময়নামতী পিছন ফিরে মুখ আড়াল করল।

'দিদি গো! কী মুখ দেখলাম তোমাদের। জীবনে প্রথম তোমাদের দেখলাম। এই তোমাদের বাড়ি? এখানেই তোমরা থাকো?' বলতে বলতে শুভ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

রাতে অতিথিকক্ষে ঘটনাটা শুনে জাহাঙ্গীর কিছুক্ষণ থম মেরে থেকে ধীরে ধীরে বলল, 'এ তো একটা মাত্র ঘা, গোটা শরীরের রক্তই যেখানে দূষিত, সেখানে শরীরের নানা জায়গাতেই বিষ শুধু ফুটে বেরবার অপেক্ষা। কথাটা সবাই মিলে ভাবো। বালিসোনায় কবি, শিল্পী, ভাবুকের তো অভাব নেই।'

যেদিন কোনও রাজনৈতিক দলের মিছিল বা জনসভা নেই সেরকম একটা রবিবার দেখে রাসমাঠে বালিসোনা-মঙ্গলমঞ্চের সমাবেশ ডাকা হল। হাতে আড়াই সপ্তাহ সময়, তার মধ্যে সভার পরিকল্পনা ও প্রচারের সব কাজ শেষ করতে পরীক্ষিৎরা সকলেই হাত

লাগাল । সমাবেশে বালিসোনার মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন অবনীমোহন, লক্ষ্মী, লিওনার্দো, প্রদীপ, পরীক্ষিৎ, পারমিতা, অম্বরীশের বন্ধু হিসেবে জাহাঙ্গীর, তাছাড়া আরও কয়েকজন বিশিষ্ট কবি, অধ্যাপক ও চিন্তাশীল মানুষ । নন্দিনী ওদিন কিছু বলতে চায়, তাকে বোঝাতে হল এখনও তার শোকের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে, এখনই তার জনসমক্ষে কিছু না বলাই ভালো, তার বক্তব্য অন্যরা তো বলবেনই । সরোজিনীর মঞ্চে বলা অভ্যেস নেই, নেপথ্যে থেকে পুরো অনুষ্ঠানের দেখভাল করার দায়িত্ব তার ।

সমাবেশের লোকসংখ্যা আগের শোভাযাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেল । নানা দিক থেকে আলোচনার পর ঠিক হল বালিসোনার মানুষের দুঃখদুর্দশা দূর করার জন্য দৈনন্দিন যা কিছু করণীয়, পুলিশ, প্রশাসন ও মঙ্গলমঞ্চকে একসঙ্গে বসে তা স্থির করতে হবে । মঙ্গলমঞ্চের মতে, বালিসোনাকে অশুভের প্রভাব-মুক্ত করতে প্রথমেই তিনটি ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হোক । একদিকে নতুন নতুন দোকান-বাজার ব্যবসা-বাণিজ্যের নৈতিক-সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, আরেকদিকে চাষের জমির ন্যায্য ও মানবিক ব্যবহার । তৃতীয় সমান গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র- ভয় ও দারিদ্র্য থেকে বালিসোনার সব শ্রেণীর মানুষের মুক্তি । এইসব কাজে বালিসোনা মঙ্গলমঞ্চ থেকে যখন যে ন্যায়-নীতির বিধান দেওয়া হবে, স্থানীয় প্রশাসনকে মেনে চলতে হবে । রাজনৈতিক দলগুলোও এর বিরোধিতা করতে পারবে না । আপাতত মঙ্গলমঞ্চের একটি অস্থায়ী কোর কমিটি... ঘোষণা শেষ হবার আগেই বিস্ফোরণের শব্দে ধোঁয়ায় আর্ত চিৎকারে বালিসোনার ঐতিহাসিক সমাবেশ ছত্রখান হয়ে গেল ।

সেদিনই বেশি রাতে সেজোভাই আনন্দমোহন বাড়ি ফিরেই অবনীমোহনকে ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, ‘তোরা কী মনে করিস- প্রশাসন গাঁজাখোরদের আসর? নাকি ছোকরা কবিদের বাসর?’

অবনী শান্ত স্বরে জানতে চাইল, ‘এসব কথা উঠছে কেন?’

‘উঠছে এই জন্য যে তোরা প্যারালাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাতে চাস! এ আমরা কিছুতেই সহ্য করব না ।’

কথার সঙ্গে মুখ থেকে মদের গন্ধ আসছে, অবনীমোহন ভ্রু কুঁচকে চুপ করে রইল ।

যেতে গিয়েও আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে আনন্দমোহন কৈফিয়ত চায়, ‘পরীক্ষিৎ, প্রদীপ, রাঙাবউ, লক্ষ্মী, লিওনরাই বা এসবের মধ্যে যাচ্ছে কেন? দেশের ব্যাপারে কিন্তু বিদেশিদের নাক গলানো সহ্য করা হবে না!’

অবনীমোহন এবারও শান্ত স্বরে বলল, ‘এর মধ্যে বোমা-বারুদ আসছে কী করে সেটা তো আগে ভাবা দরকার ।’

বিস্ফোরণের ঘটনায় পরীক্ষিতের মন বিষাদে ছেয়ে গেছে । মঙ্গলমঞ্চের পথে কোথাও শেষ পর্যন্ত পৌঁছনো যাবে কিনা সে-বিষয়ে তার মনে ঘোর সন্দেহ ।

রথের মেলায় শুভকে পঞ্চমুখী বাঁশের বাঁশি কিনে দেবার শপথ ভেঙে রথের চার মাস আগেই সে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল । এবার সেও সমুদ্রে যাবে ।

বাঁশির কথা শুভরও আর মনে নেই । বেশিরভাগ সময় সে জাহাজে তার ছোট্ট কুঠুরিতে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, নয়তো পিছনের ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে অনন্ত জলরাশির দিকে চেয়ে থাকে । যখন কাঁদে, তখন কখনও কখনও পরীক্ষিৎ এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় । জাহাজ গভীর সমুদ্রে না পড়া পর্যন্ত এভাবেই নির্বাক তার দিন কাটে । গার্নেট কেটে বালা তৈরির কাজ আবার শুরু করার দিনও মাঝে মাঝেই মেশিনে মাথা রেখে তাকে কাঁদতে দেখে জাহাঙ্গীরও এসে তার মাথায় হাত রাখে । কোণের টেবিলে গার্নেট পালিশ করা থামিয়ে প্রৌঢ় ইংরেজ কারিগর বলে, 'হি মাস্ট হ্যাভ লস্ট সামওয়ান ভেরি ডিয়ার টু হিম ।' একটু পরে আবার বলে, 'আই কুড ফিল হিজ সাফারিং । গত বছর লন্ডন টিউবে বিস্ফোরণে স্ত্রী-কন্যা দুজনকেই হারিয়েছি আমি ।'

পরীক্ষিতের স্বপ্নের কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায়, জাহাঙ্গীরকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'শুভকে আপনি লন্ডনের আই হসপিটালে অনেকদিন ধরে চিকিৎসা করিয়ে ছিলেন, না?'

জাহাঙ্গীর মাঝসমুদ্রের মতো স্থির দৃষ্টিতে পরীক্ষিতের দিকে চেয়ে থাকে ।

বালিসোনায় মিথ্যার মহামারী থেকে পালিয়ে দেশে-দেশে মানুষের জীবন দেখে বেড়ানোর স্বপ্ন পরীক্ষিতের মনে দিনে-দিনে ফিকে হয়ে আসছে । জাহাঙ্গীরের অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার মালবাহী জাহাজে এই সমুদ্রযাত্রার কোনও মিল নেই ।

ওপর তলায় ছ'টা একশয্যার এয়ার কন্ডিশানড কেবিনের চারটেয় তারা থাকে । বাকি দুটিতে কখনও কখনও বিশিষ্ট দুয়েকজন যাত্রীও নেওয়া হয় । তারা মন্ত্রীও হতে পার, মাফিয়াও হতে পারে । একবার এক আরবদেশের রাজা গণআন্দোলনের চাপে শুধু তাঁর কনিষ্ঠ বেগমকে নিয়ে গোপনে দেশত্যাগ করে এই জাহাজেই বেশ কয়েকদিন ছিলেন । সেসময় জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মগোপনে নানা ভাবে সাহায্য করেছিল । তাঁর শোক লাঘব করতে কোমল শয্যা ও বিবিধ সুখাদ্যের ব্যবস্থা করেছিল । পালকের চেয়েও হালকা চিনদেশের রেশমসুতোর লেপ আর আর্জেন্টিনার বিফের স্টেক বিষাদগ্রস্ত বেগমসাহেবার আহারে-শয্যায় অরুচি নাকি কিছুটা হলেও কাটিয়ে দিয়েছিল । সেই উপকারের কথা রাজা ভোলেননি । তাঁর বর্তমান আবাস স্পেনের গ্রানাডার কাছে আলমেরিয়া উপসাগরের তীরে আলমেরিয়া বন্দর থেকে যখনই তাঁর কোনও না কোনও জাহাজ জাহাঙ্গীরের সমুদ্রপথ দিয়ে যায় তখন ক্যাপ্টেনের হাতে তিনি জাহাঙ্গীরের জন্য অতি মূল্যবান সব উপহার পাঠান । জাহাজের ব্যবসার বীজও তিনি নাকি জাহাঙ্গীরের কাছেই পেয়েছেন । একবার রেকিয়াভিকে জাহাজ আনলোডিং-লোডিংয়ের মাঝখানে আরব-রাজার ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরকে হীরের কুচি বসানো স্পেনের ষাঁড়ের শিঙের তৈরি বড় এক জোড়া চিরুনি ও মিনে-করা

কাঠের বাক্সে তিল-পেস্তার আরবি মিঠাই দিয়ে জানাল, রাজার ইচ্ছেয় তাঁর সমুদ্রপরিবহণ ব্যবসা বাড়াতে জনা-ষাটেক শখের অভিযাত্রী নিয়ে ছোট একটা জাহাজে সে শিগগিরই বিশ্বপরিক্রমায় বেরোবে ।

'মাই অ্যারাবিয়ান কিং জানতে চেয়েছেন তোমার জাহাজের দায়িত্ব তোমার লোকেদের হাতে ছেড়ে তুমি রাজার মেহমান হিসেবে আমাদের সঙ্গে যেতে চাও কিনা ।'

রাজার আতিথেয়তা সম্পর্কে গ্রানাডায় আল-হামব্রার প্রাসাদের কাছে তাঁর নতুন কেনা মস্ত অট্টালিকায় দু'দিন থেকেই জাহাঙ্গীরের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এবার জাহাজে বিশ্বপরিক্রমায় পরীক্ষিৎকে ঠেলে দিতে চায় । ঠিক হল, তার প্রাণের বন্ধু অম্বরীশের ছেলে, তার ইয়াং ফ্রেন্ড, পরীক্ষিৎকে নিয়ে জাহাঙ্গীর নিজেই রাজার গ্রানাডার বাসভবনে যাবে । তাঁর সম্মতি থাকলে এই স্বপ্নচর, বিষাদগ্রস্ত পরীক্ষিৎকে আলমেরিয়া বন্দরে সে-ই জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে আসবে ।



২৮

নদী নিয়ে যখন অনেকে অনেক কিছু ভাবছে, পাতালগঙ্গা, আদিগঙ্গা, বালিসোনা, মিতাম্বর-শাখানদী- নানা নামে নানা মানুষ ফিরে-পাওয়া নদীকে নিজের মতো করে আঁকড়ে ধরেছে, ঠিক তখনই নদী আবার শুকোতে শুরু করল । চৈত্রে বাদা ফেটে চৌচির । নদীর বওয়া জলও বেশির ভাগ জায়গায় রুখে গিয়ে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে ।

মাটি ফুঁড়ে ওঠা জলের বুজকুরিও আর দেখা যায় না । সেবছরই হেমন্তের মাঝামাঝি নদীখাত ভরাট করে নতুন করে শুরু হয়ে গেল টাউনশিপের পাইলিংয়ের কাজ ।

প্রথমে পাতাল-ফোয়ারা দেখতে ও পরে নদীর পুনরুজ্জীবনের সাক্ষী হতে যারা সারা দিন ভিড় করত, তাদের অনেকেই এখন বিকেলে নতুন সিঁড়ির ধাপে এসে বসে । হাওয়ায় দুদণ্ড জিরোয় । তরুণরা রাজনীতি নিয়ে তর্ক করে, খেলা, সিনেমা নিয়ে আড্ডা দেয় । বয়স্করা নিজেদের মধ্যে গল্প করে । বৃদ্ধরা মনোরম অতীতের জন্য হা-হুতাশ করে । কেউ-বা সমাজের সাংঘাতিক পরিবর্তন নিয়ে ছি-ছি করে । রাত নামলে দুনিয়ার পাগল ও ভিখিরিরা যে যার চট ছেঁড়াকাথা মাদুর বিছিয়ে শোওয়ার জায়গার দখল নেয় । যাদের চট, কাঁথা, মাদুর বা অন্য কিছুই নেই তারা সিঁড়িতে শুয়ে পড়ে সেই জায়গাটুকুর ওপর নিজের মালিকানা জাহির করতে সেখানে বার বার প্রস্রাব করে । পাগলদের মধ্যে যাদের ঘুম আসে না, তারা সারা রাত জেনারেটর, মিক্সিং যন্ত্রের আওয়াজ কেউ সন্দেহবশে, কেউ আহ্লাদ করে শোনে । তরুণ-বয়সি শ্রীরামচন্দ্র তার চোদ্দ বছরের বনবাসে শয্যাগ্রহণ করবে না বলে প্রতিরাতে ঘাটে বসেই আকাশের বাঁধা পথে নিঃশব্দে বিচরণশীল ক্রেনের সঙ্গে তর্জনী তুলে অবিরাম কথা বলে যায় ।

রাত কিছুটা নির্জন হলে লিওন তাদের অ্যাডভোকেট মেজোজ্যাঠার পরামর্শে পেশাদার ফটোগ্রাফার নিয়ে নানা দিক থেকে টাউনশিপের নির্মাণকাজের ছবি তোলায় । লিওনের আগ্রহে একদিন একসঙ্গে অনেকগুলো ছবি দেখতে দেখতে অবনীমোহন হঠাৎই ধ্যানস্থ হল । পরে ধ্যান থেকে জেগে উঠে বলল, ‘এ এক স্বল্পায়ু শহর হবে । এক আত্মঘাতী নির্মাণ ।’

ছেলেবেলায় একা একা হাঁটতে হাঁটতে জনশূন্যি মোড়ে যে বৃদ্ধ বটবৃক্ষকে দেখে অবনীমোহনের মনে হত এই সেই বোধিবৃক্ষ, এখানেই গৌতম বোধিলাভ করেছিলেন, যৌবনে গাঁজা ও আফিংয়ের দোকানে লুকিয়ে আফিং কিনতে এসে যে গাছের ডালে নানা সময়ে তিনজনকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখে ভয়ে তার বুক হিম হয়ে গেছে, এখন যে গাছের পাঁচশো পায়ের মধ্যে গাঁজা আফিংয়ের দোকানের পিছনে গাছের কাটা-গুঁড়ির বেঞ্চে সন্ধে থেকে মাঝ রাত পেরিয়ে দেশি-বিলাতি মদের আসর বসে, একদিন সূর্যোদয়ের আগেই সেই বটবৃক্ষের নীচে এসে অবনীমোহন অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধ্যানস্থ হল ।

তার মন বড় ব্যাকুল । সে বুঝতে চায় কেন হঠাৎ বালিসোনায় মানুষ ঘুমের মধ্যে সারা রাত দুঃস্বপ্ন দেখবে । যারা দীর্ঘদিনের অধিবাসী, দিনের বেলা তাদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের দেখা হলে আগের রাতের অদ্ভুত সব দুঃস্বপ্ন ছাড়া আজকাল আর কোনও কথা হয় না । সব সময় মনের এই ভয়-বিনিময় করতেও পারে না, চোখে চোখ রেখে পরিত্রাণহীন বিপন্নতায় বাক্যহারা হয়ে যায় । মানুষ এত ভয় পাবে কেন, জীবন এমন দুঃস্বপ্ন পাবে কেন, অবনীমোহন এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজে ।

সূর্য গাছের মাথায় চড়ে ক্রমশ পশ্চিমে অস্ত গেল, গাঁজা-আফিংয়ের দোকানের পিছনে মদের আসর বসে গেছে, বেঞ্চে জায়গার অভাবে যারা দাঁড়িয়ে বাঁ হাতের গেলাসে চুমুক দিয়ে ডান হাতের শালপাতার চুবড়ি থেকে জিভ দিয়ে চাট নিতে নিতে অপেক্ষা করছে- বেঞ্চের কয়েকজন কতক্ষণে পশ্চিমপাড়ায় যাবার জন্য জায়গা খালি করবে, অবনীমোহন তখনও গভীর ধ্যানে মগ্ন । তার স্থান-কালের বোধ সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে ।

থানায় রাত বারোটার ঘন্টাও বেজে গেছে । মদের আসরের মাতালদের একজন 'নিরুপমা আমার রে বাঞ্চোৎ ।' 'ও তোর বউদি, এঁড়েচোদা ।' 'তোর মুখ আমি জুতিয়ে, জুতিয়ে না, গুঁতিয়ে যদি না দি-' বলতে বলতে বটতলা পেরিয়ে যাবার সময় দলের একজন অন্ধকারে অবনীমোহনকে দেখে টেনে টেনে বলল, 'এ আবার কোন সাধুবাবা রে শালা!'

সকলেই নিঃশব্দে অবনীমোহনের দিকে এগিয়ে গেল ।

'এ তো সেই মঙ্গলমঞ্চের পাণ্ডাটা রে! নারদমুণি সেজে ঘুরে বেড়ায় ।'

ঠোঁটে আঙুল চেপে সকলেই সকলকে চুপ থাকতে বলে পরস্পরের প্রতি ইঙ্গিতে কর্তব্য বিনিময় করে দলের সাতজন প্যান্টের বোতাম খুলে একযোগে অবনীমোহনের ঘাড়ে মাথায় প্রস্রাব করতে লাগল । একজন পিছন থেকে অবনীমোহনের চুলের ঝুঁটি ও দুজন তার দুহাত মুচড়ে টেনে ধরে হ্যা হ্যা করে হাসছে । বাকিরা প্যান্ট খুলেও হেসে লুটিয়ে পড়ায় তাদের প্রস্রাব কিছুটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল ।

সরোজিনীর কচি-সংসদে মেঘাবৃতর পরে আরও একজন নতুন সদস্য হয়েছে । তিন বছরের অরণ্য । নীলাঞ্জনার ছেলে, ছুটি পেলেই ছেলেকে নিয়ে বালিসোনায় চলে আসে ।

কর্মসূত্রে কখনও লম্বা সফরে যেতে হলেও ছেলেকে সরোজিনীর কাছে দিয়ে যায় । সরোজিনী গুনগুন গান গেয়ে তাকে ঘুম পাড়ায় । মিতার মধ্যে যেদিন কোনওরকম অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না, সেইসব দিনে মিতার কাছে ঘুমোতে পাঠায় । দুয়েকদিনের জন্য কোনও সেমিনারে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গেলে ছেলে লখনউয়ে নিঃসন্তান সরস্বতীদিদির হেপাজতে দিব্যি থাকে ।

'বিয়ের খবর দিলি না, জামাই দেখালি না, কেমন মেয়ে রে তুই!' সরোজিনীর এ-কথার উত্তরে নীলাঞ্জনা মৃদু হেসে বলল, 'আরণ্যক বিয়ের তারিখ কি আগে থেকে কেউ বলতে পারে? আর তোমার জামাই? তিনি এখন বিদেশে ।' কথার শেষেও সে মুখ টিপে হাসল ।

ভোরে ও বিকেলে রাসমাঠে সরোজিনীর নিজের পাঠক্রম ও প্রশিক্ষণ সূচি অনুযায়ী কচি-সংসদের সব সদস্যের আনন্দপাঠ চলে । নিজের নাতি-নাতনি ছাড়াও লক্ষ্মীদের স্কুল ও সুষমা বালিকা বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র-ছাত্রী কচি-সংসদের দুবেলার মুক্তমেলায় শামিল হয়েছে । হইচই, খেলাধূলা, আবৃত্তি, গান গল্পে রাসমাঠ উৎসবের মতো ভরে উঠছে দেখে ঘরে ফেরার পথে অনেকে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে যায় ।

সন্ধের আগে ঘরে ফিরে অবনীমোহন তখনও ফেরেনি দেখে সরোজিনী ব্রতীন ও ভণ্ডুলকে তার খোঁজে পাঠাল । সাত সেলের টর্চ নিয়ে দুজন তখনই বেরিয়ে পড়ল । নদীর ঘাটে, দিঘির পাড়ে, রেললাইনের ধারে আলো ফেলে ফেলে তারা অবনীমোহনকে খুঁজে বেড়াল । পথে লিওনের সঙ্গে দেখা, সেও খবর পেয়ে খুঁজতে এসেছে ।

মধ্যরাত পার করে হতাশ হয়ে উৎকণ্ঠা নিয়ে ফিরে আসার পথে বকুলবেদির কাছে অবনীমোহনের দেখা পাওয়া গেল, নিঃশব্দে বাড়ি ফিরছে । গায়ে উৎকট প্রস্রাবের গন্ধ ।

বারান্দায় সরোজিনীর একেবারে সামনে এসে অবনীমোহন ফুঁপিয়ে উঠল, পরের মুহূর্তে মুখে হাত চাপা দিয়ে বমি আটকাতে আটকাতে বাথরুমে ছুটে গিয়ে কমোডে হড় হড় করে বমি করতে লাগল । বমির তোড়ে তার একপাটি বাঁধানো দাঁত খুলে কমোডের ভেতর পড়ে গেল । সরোজিনী ঠোঁট কামড়ে ধরে তার পিঠ ডলে দিতে থাকে ।

ঠিক কোথায় আঘাত, কী ধরনের আক্রমণ, অবনীর মতো মানুষের ওপর এমন নারকীয় অত্যাচারের পিছনে কে বা কারা, অনেক চেষ্টা করেও অবনীমোহনের কাছ থেকে সরোজিনী, লিওন, কেউই কিছু জানতে পারল না । কাল ভোরেই লক্ষ্মীকে নিয়ে আসবে জানিয়ে লিওন বাড়ি গেল । সরোজিনীর ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত মাঝে মাঝে শুধু দুজনের দীর্ঘশ্বাস শুনে এঘরের বংশানুক্রমিক এক বাসিন্দা উঁচু কড়ি-বরগা থেকে প্রতিবারই 'ঠিক ঠিক ঠিক' বলে সমবেদনা জানাল ।

দীর্ঘ বিনিদ্র রাত শেষ হবার মুখে অবনী আরও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এখানকার জল হাওয়া মানুষ- কিছুই আর আমাদের জন্য নয়, সরোজিনী । বালিসোনায়

এমন অদ্ভুত ভাষা, এত অচেনা মানুষ কখনও দেখিনি ।'

এবারও সেই আদিযুগের প্রাণী কড়ি-বরগা ছেড়ে দেওয়ালের মাঝামাঝি নেমে এসে বলল, 'ঠিক ঠিক' ।

পরদিন সকালে ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে বললেন, 'সিভিয়ার মেন্টাল শক । ভিকটিম অব এক্সট্রিমলি আনপারমিসিবল টর্চার । হিউম্যান ইউরিন নাক মুখ দিয়ে অনেকটাই ভেতরে গেছে ।'

অবনীমোহনের প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে দুয়েকটা দিন হাসপাতালে থাকতে হবে ।

ব্লাড প্রেশার, ওয়েট, এজের সঙ্গে প্রেসক্রিপশনের কোণায়, ডাক্তারের হাতে লেখা তিনটি পর্যবেক্ষণও থানায় ও-সিকে দেখানো হল । হাতের লেখার ওপর বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নতুন ও-সি লিওন লক্ষ্মী সরোজিনীকে পর পর দেখে নিয়ে মুখ খুলল- 'কাউকে সন্দেহ করেন? এনি সাসপেক্ট? ভিকটিম কাউকে চিনতে পেরেছেন? কারও নাম বলেছেন?'

'তিনি কথা বলার অবস্থায় নেই । আমরাও কেউ স্পটে ছিলাম না ।'

'দ্যাট'স দ্য প্রবলেম! এফ-আই-আর করে যান । দেখি কী করা যায় । সুস্থ হলেই আমায় জানাবেন, ওঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে ।'

লক্ষ্মীকে হাসপাতালে অবনীমোহনের কাছে রেখে সরোজিনী রাসমাঠে যাবার জন্য বেরতে যাচ্ছে, লক্ষ্মীই বাধা দিল- 'আজ বাদ দাও না, মা । কাল থেকে আবার যেও ।'

সরোজিনী ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার কি আর কাল আছে রে! তোমরাও আর কালকের দিকে চেয়ে থেকো না । ওরা মঙ্গলমঞ্চ করতে না দিক, আমরা মঙ্গলসংগীত গেয়ে বেড়াব ।'

পরদিন লখনউ থেকে সরস্বতী-তাপসও অরণ্যকে নিয়ে চলে এল । ভুবনমোহনের সমাধির পাশ কাটিয়ে বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র সরোজিনী অরণ্যকে বুকে টেনে নিল ।

'এ কী মা! তোমার এমন চেহারা হল কী করে?'

ছেলেকে সরস্বতীর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে সরোজিনী হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে উঠল, 'কাল বলে আর কিছু নেই রে । তোমরাও কালকের ওপর বরাত দিয়ে আর বসে থেকো না ।'

অবনীমোহনকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর একদিন রাতে সরোজিনী তাকে অনেকক্ষণ ধরে নানা ভাবে বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত সেদিনের ঘটনা বলতে রাজি করাল । সব কথা শুনে মহিষাসুরমর্দিনীর মতো ক্রোধে সরোজিনীর সমস্ত মন জ্বলে ওঠে ।

বিকেলে ও-সি এলে সে-ই তাকে ঘটনার বিবরণ দিল ।

'হসপিটালের ফাইন্ডিংস, ক্লিনিক্যাল টেস্ট রিপোর্ট, সব আমি দেখেছি । নাক মুখ দিয়ে প্রচুর ইউরিন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল ।' ও-সি নোট করতে করতে অবনীমোহনকে

জিজ্ঞেস করল, 'অপরাধীদের দেখলে শনাক্ত করতে পারবেন? গাঁজা-আফিঙের দোকানদারকে অ্যারেস্ট করে সে-রাতের মদের আসরের চোদ্দটা মস্তানকে তুলে এনেছি, আসল কালপ্রিটগুলোকে পারবেন আইডেন্টিফাই করতে?'

'আমি ওদের মুখ আর দেখতে চাই না ।'

ধীরে ধীরে কথাটা বলে অবনীমোহন দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন ।

সবাই চলে যেতে সরোজিনী অবনীমোহনের মুখ নিজের দিকে টেনে নিয়ে আঁচল দিয়ে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া চোখের জল মুছিয়ে দিল ।

অবনী তার আঁচল ধরা হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল, 'আমার বরাবরের ধারণা, যার শেষজীবনটা, গৌতম বুদ্ধ বোধি লাভের অনেক আগেই যেমন বলেছিলেন, মসৃণ ঝিনুকের মতো হল না, তার পুরো জীবনটাই বৃথা । আমার এ জীবন বৃথা গেল, সরো ।'

সরোজিনী অবনীর মুখে হাত চাপা দেয় ।

মাঝরাতে দরজায় চেনা খটখট শুনে সরোজিনী ঘর থেকেই চেঁচিয়ে বলল, 'এখনও ঘুমোসনি? যা, যা, শিগগির গিয়ে শুয়ে পড় । রাত আর কতটুকু বাকি!'

'দরজাটা একবার খোলো না রাঙাদি । খুব দরকারি কথা আছে ।'

সরোজিনী জানে দরজা না খুললে মিতাকে নিরস্ত করা যাবে না । আবার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে দিলে সারারাত আর বেরতে চাইবে না । দরজাটা ভেজিয়ে রেখে সে নিজেই বাইরে এল । মিতা মাঝে মাঝেই যেমন বলে সেইরকমই ফিসফিস করে বলল, 'শুনছ, শুনতে পাচ্ছ? বাদার হাওয়া!'

'এ তো বালিসোনার জন্মের সময় থেকে শোনা যায় রে । লক্ষ্মীর জন্মের সময়ও আমি শুনেছি । তখন হাসপাতালের খড়ের চালা মাঝে মাঝে উড়িয়েও নিত । তুই শুতে যা তো ।'

'না, রাঙাদি, না । এ হল কুবাতাস । কংকালের গন্ধ পাচ্ছ না? আর কী জোরে বইছে!'

'ওরে বাবা, পুব থেকে পশ্চিম এ হাওয়া কোথাও কোনও বাধা পায় না বলেই এত জোরে বয়! রাঙাদা তোকে ক্যালিফস দিয়েছিল না? খাস নিয়ম করে? আজ খেয়েছিস?'

'অরণ্যকে আমার কাছে দেবে? একা ভয় করছে ।'

'ওকে তো লক্ষ্মী নিয়ে গেল । আমি তোর কাছে শোবো । তুই শো গিয়ে, আমি তোর রাঙাদাকে ঘুম পাড়িয়ে, আসছি ।'

মুখের কথায় মিতার ভয় কাটল না । সরোজিনী ঘরে ঢুকে যাবার আগেই সে খুব জোরে তাকে আঁকড়ে ধরল ।



২৯

অনেক দিন পর পরীক্ষিতের চিঠি পেল পারমিতা। দীর্ঘ চিঠি, তবু যতবার পড়ে ততবারই শেষ পর্যন্ত পড়ে। জাহাজে চড়ে কত অদ্ভুত সব দেশে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রকৃতির কী আশ্চর্য রূপ, কোমলে-কঠোরে, সৃষ্টিতে-প্রলয়ে সব একাকার! মানুষের কতরকম সুখ-দুঃখ, সমুদ্র কত বিশাল, এখনও-বর্তমান হিমযুগের সুদীর্ঘ হিমবাহ কত বিস্ময়কর, পরীক্ষিৎ তার বিশদ বিবরণ দিয়ে লিখেছে 'এসব দেখতে দেখতে লোভ হিংসা মিথ্যাচারে জরাজীর্ণ বালিসোনার কথা ভেবে মহাসমুদ্রের উন্মাদ ঢেউয়ের মতো আমার সমস্ত মন তোলপাড় করে। একদিন রাতে (তোমাদের ওখানে পরের দিন বিকেলে) আমাদের জাহাজ সাংঘাতিক ঝড়ে পড়েছিল। সাড়ে তিনঘন্টা জীবন-মৃত্যুর মাঝখান দিয়ে যাবার পর ভোরবেলায় ঘুমিয়ে বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম। বিরাট একটা মিছিলের সামনের সারিতে গলা খুলে গান গাইতে গাইতে চলেছেন। একবার মনে হল গানটা আমার লেখা, তারপরই বুঝলাম ওটা বাবারই লেখা। খুব আশ্চর্য, না?' চিঠিটা কোন দেশ থেকে লেখা তার কোনও উল্লেখ নেই। কোনও ঠিকানাও দেয়নি।

সরোজিনী চিঠিটা পড়ে বলল, 'পরীক্ষিতের সঙ্গে আমার বোধহয় টেলিপ্যাথি চলে। এই যে ছেলেমেয়েদের মঙ্গল-গান শেখাচ্ছি, ভেবেছিলাম স্কুলে, পাড়ায় ছোট বড় নানা অনুষ্ঠানে এইসব গান এরা গেয়ে শোনাবে, গান দিয়ে মানুষের হুঁস ফেরাবে, তার চেয়ে পরীক্ষিৎ যেমন স্বপ্নে দেখেছে, বড় করে গানের মিছিল বের করলে একসঙ্গে অনেক মানুষের হৃদয় ছোঁওয়া যাবে।'

পুজোর পর থেকে প্রতি রবিবার সকালে বালিসোনার রাস্তায় মঙ্গলসংগীতের মিছিল বেরতে লাগল। প্রাণজুড়নো ওইসব গানের দর্শক-শ্রোতা বাড়তে বাড়তে এমন হল যে প্রতি সপ্তাহেই বালিসোনার প্রধান সড়কের দুপাশে কয়েক মাইল দীর্ঘ মানুষের প্রাচীর উঠে যায়। তাদের মধ্যেও অনেকে মিছিলে এসে গানে গলা মেলায়। শেষ পর্যন্ত শিবকৃষ্ণের রোববার সকালের পাঠশালা দিন বদলিয়ে শনিবারে নিয়ে যেতে হল।

এক রবিবার ঘন কুয়াশা সত্ত্বেও স্থির হল গানের মিছিল যেমন বেরয়, বেরবে । মিছিল চোখে না দেখা যাক, সমবেত কণ্ঠের গান তো মানুষের কানে পৌঁছবে । যারা তখনও লেপের নীচে, কুয়াশাভেদী গান তাদেরও হয়তো ঘুম ভাঙাবে ।

অদৃশ্য মিছিল থেকে গানের কথা, সুরের মায়া ক্রমশ বালিসোনার আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে গেল । রাস্তার দুপাশের মানুষের মন ছুঁয়ে, কাছে-দূরের পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে ঢেউ তুলল ।

হঠাৎই কুয়াশা ফুঁড়ে মিছিলের সামনের সারির ঠিক পিছনে 'অম্বরীশের জাহাজের দোস্ত জাহাঙ্গীরও এই মিছিলে আছে' বলে জাহাঙ্গীর কুয়াশা না কাটা পর্যন্ত গানে বিভোর হয়ে নিঃশব্দে হেঁটে চলল ।

চারদিক স্পষ্ট হবার পর সে সরোজিনী ও পারমিতার কাছে এসে জানাল বালিসোনার মানুষের জন্য অম্বরীশের রুটি কারখানা সে আবার চালু করতে চায় ।

সারা সপ্তাহ রুটি কারখানার কর্মচারীদের সঙ্গে সে কথা বলল । যারা আন্দোলন ছেড়ে ঘরে ফিরে গেছে তাদেরও ডেকে নিল । গোড়ার দিকের কারিগরদের ঠিকানায়ও লোক পাঠায় ।

পরের রবিবার সকাল থেকে সকলের সঙ্গে সেও গানের মিছিলে যোগ দিল । চৌধুরীবাড়ির শুধু অবনীমোহন আর, এই প্রথমবার, নন্দিনী ছাড়া সকলেই এসেছে । তাদের অনেকেরই গানের গলা ভালো । কেউ কেউ শুধু স্লোগানে গলা মেলাল ।

দিবাকরের খুনের ব্যাপারে নতুন ও-সি খুব আগ্রহ নিয়ে নন্দিনীর কাছ থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে । কখনও দুপুরে, কখনও সন্ধ্যায়, কখনও রাতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে, কখনও নন্দিনীকে তার স্মৃতির মধ্যে ডুবতে দিয়ে দীর্ঘক্ষণ কেটে যায় তাদের । অবনীমোহনের অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করায় এই ও-সির ওপর চৌধুরীবাড়ির সেজোছেলে ছাড়া বাকি সকলেরই গভীর আস্থা । রবিবার খুব সকালেই ও-সি চলে আসায় নন্দিনীকে রেখে অন্যরা গানের মিছিলে বেরিয়ে গেছে । দিনে দিনে মিছিলের দৈর্ঘ্য ও সংগীতের আওয়াজ বেড়ে চলেছে দেখে জাহাঙ্গীর প্রায়ই বলে, 'সাইক্লোনের মতো শক্তিশালী অস্ত্র একদিন হয়তো এই গান দিয়েই তৈরি হবে ।'

দুপুরে বাড়ি ফিরে সরোজিনী মিতা ও লক্ষ্মী- মেঘাবৃতকে ফিরিয়ে দিতে এসে একা বসে থাকা নন্দিনীর মুখ দেখে চিন্তায় পড়ে গেল । ও-সি হয়তো দিবাকরের খুনের তদন্ত মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছে, অথবা খুনী কে জেনে ভয়ে উদ্বেগে সে নির্বাক? হয়তো ও-সির জেরায় বারবার দিবাকরের রক্তক্ষয়ী স্মৃতির চাপ সে আর নিতে পারছে না!

এইসব জল্পনার মধ্যেই নতুন ও-সি দরজার বাইরে থেকে বলল, 'ভেতরে আসতে পারি?'

লক্ষ্মীই বলল, 'আসুন ।'

সুদর্শন ও-সির পরনে সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা। হাতে মস্ত একটা গোলাপের তোড়া।

লক্ষ্মী এবার মুখে মৃদু হাসি নিয়ে বলল, 'বালিসোনায় এই প্রথম একজন মানুষের মতো পুলিশ দেখলাম।'

সবাইকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে ফুলের তোড়া টেবিলে নামিয়ে দিয়ে 'সরি, আমি পরে আসব।' বলে ও-সি বেরিয়ে গেল। নন্দিনী তার যাওয়ার সময় একবার মাত্র চোখ তুলে তাকাল।

পরের মুহূর্তেই ও-সি ফিরে এসে হঠাৎ সবাইকে জাপানিদের মতো কোমর ভেঙে 'বাও' করে বলল, 'আই হ্যাভ এ গ্রেট রেসপেক্ট ফর ইউ অল। আপনাদের গানের মিছিল আমি দেখেছি। আই উইশ আই কুড জয়েন ইউ। কলেজ সোশ্যালে রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে আমি হাততালি কুড়িয়েছি শুনলে এখন হয়তো আপনারা হাসবেন।'

এবারও লক্ষ্মীই বলল, 'ওমা, হাসব কেন? বরং জানতে চাইব মিছিলে যোগ দিতে আপনার বাধা কোথায়?'

'আমাদের প্রশাসন এখনও অতটা উদার হয়নি।' কথা বলছে লক্ষ্মী-সরোজিনীর সঙ্গে, কিন্তু মাঝে মাঝেই চোখ চলে যাচ্ছে নন্দিনীর মুখমণ্ডলে।

'সব বেড়াই কখনও না কখনও, কাউকে না কাউকে তো ভাঙতেও হয়।'

সরোজিনীর এ-কথার লেজুড় হিসেবে লক্ষ্মী বলে উঠল, 'প্রশাসনেরও তো পরিমার্জনা দরকার।'

হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে মেঘাবৃতকে দুহাতে উঁচুতে তুলে ধরে ও-সি বলল, 'একশো ভাগ ঠিক। শিশুও যদি মিছিলে যেতে পারে, পুলিশই বা পারবে না কেন?'

'আমাকে নামিয়ে দাও, আমার বগলে লাগছে।'

নন্দিনী দূর থেকেই হাত বাড়াল, 'আয়, আমার কাছে আয়।'

মেঘাবৃতকে নামিয়ে দিয়ে ও-সি বলল, 'ও-সিরা থানায় সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।'

এবার নন্দিনীকেও হাসতে হল।

যাবার সময় ও-সি বলে গেল, 'এই শিশুর পিতৃহত্যাকারীকে আমি ফাঁসিতে ঝোলাবই।'

ঘর খালি হয়ে গেলে নন্দিনী ফুলের তোড়া তুলে ধরে ঘ্রাণ নিতে গিয়ে গোলাপের আড়ালে লুকনো গোলাপি রঙের ভাঁজ করা একটা কাগজ পেল। তাতে একটাই লাইন- 'দেবী, দয়া করো, আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো না।'

ও-সি পরদিন আবার এল। অনেকক্ষণ কথা খুঁজে না পেয়ে নন্দিনীর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় অস্বস্তি কাটাতে মেঘাবৃতকে কাছে টানবার চেষ্টা করে বলল, 'ওকে আমার মেঘদূত বলে ডাকতে ইচ্ছে করে।'

নন্দিনী মুখ তুলে বলল, ‘ডাকুন না।’ একটু থেমে, ‘রাঙাজেঠির কাছে আমি কালিদাসের মেঘদূত কাব্য শুনেছি।’

মেঘাবৃত ও-সির হাত ছাড়িয়ে মিতার ঘরের দিকে চলে গেল।

ও-সি একটু কাছে এসে বলল, ‘তোমাকে নন্দিনী ছাড়া আর কিছু মানায় না। মিসেস বসুচৌধুরী ডাকার পক্ষে বড্ড বড়। আমি ‘নন্দিনী’ বলতে পারি?’

নন্দিনী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ‘অন্য কারও সামনে ডাকবেন না।’

ও-সি হঠাৎ নন্দিনীর মুখ তুলে ধরে ওষ্ঠ চুম্বন করল। নন্দিনী প্রথমে মুখ সরাবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ও-সির দুহাতের মধ্যে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

এরপর চৌধুরীবাড়িতে ও-সিকে আরও ঘন ঘন আসতে দেখা গেল। কাজের কথা ছাড়াও নানা বিষয়ে বাড়ির অন্যদের সঙ্গে অনাবশ্যক আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সে নন্দিনীকে বার বার দ্যাখে। তারপর চা শেষ করে উঠে পড়ে।

একদিন সন্ধে পার করে এসে নন্দিনীকে বলল, ‘দিবাকরকে আর ফিরিয়ে দিতে পারব না, কিন্তু ওর খুনিদের আমি জীবিত বা মৃত ধরবই। দেবী, তোমার পায়ে সে-ই হবে আমার প্রথম হৃদয়াঞ্জলি।’

মেঘাবৃত হঠাৎ ঘরে ঢুকে দুজনকে চুমু খেতে দেখে দুজনের ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে ও-সিকে মাথা দিয়ে হাতের মুঠো দিয়ে ঘা মারতে মারতে চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘কেন আমার মাকে ধরেছ? ছাড়ো, ছেড়ে দাও। ছাড়ো বলছি।’

সেদিন থেকে চৌধুরীবাড়িতে তার আসা নিষিদ্ধ হয়ে যাবার পর কখনও কখনও তেতলার জানলায় হঠাৎ ও-সির স্থির মূর্তি দেখেছে নন্দিনী।



৩০

চার বছর এগারো মাস পর এক শনিবার দুপুরে পরীক্ষিৎ বালিসোনায় ফিরল ।

মিতার চেহারার দিকে আর তাকানো যায় না । তার সদা-শংকাতুর চোখে পরীক্ষিৎ পড়ন্ত বিকেলেও চোখ রাখতে পারল না- তার বুকের ভেতরটা এক ধাক্কায় শূন্য হয়ে গেছে! বিরাট লম্বা চুল-দাড়িতে প্রায়-অচেনা পরীক্ষিৎকে চিনতে পেরে বা না পেরে মিতাও শুধু চেয়ে রইল ।

সেই রাতেই লক্ষ্মী ও নীলাঞ্জনা দুজনে অরণ্যসূর্যের দুহাত ধরে লক্ষ্মীদের বাড়ি যাবার আগে সরোজিনীর সঙ্গে দেখা করতে এসে লম্বা চুল-দাড়ির পরীক্ষিৎকে দেখে বিস্মিত ।

‘চিনতে পারোনি, লক্ষ্মীদি? আমি পরীক্ষিৎ ।’ অরণ্যকে দেখিয়ে, ‘তোমার ছেলে?’

‘তোকে ঠিকই চিনেছি । তুই-ই অরণ্যকে ভুল ভেবেছিস । ও আমার ছেলে না, নীলাঞ্জনার ।’

এবার নীলাঞ্জনাকে, ‘কবে বিয়ে করলে? খবর পাইনি তো ।’

‘যে-বছর তুমি বিদেশে গেলে, সেবছর পুজোর পরেই আমার বিয়ে হয় । সামাজিক বিয়ে তো না যে ঘটা করে খবর দেব, গন্ধর্ব বিয়েও না, আমাদের বিয়েটা আরণ্যক বিয়ে । গোধূলি লগ্নে, তখনও আকাশে অস্তগামী সূর্য ছিল ।’

‘ছেলের কী নাম রেখেছ?’

উজ্জ্বল চোখে, মুখে গর্বমেশা হাসি ফুটিয়ে নীলাঞ্জনা পরীক্ষিতের চোখে তাকিয়ে বলল, ‘অরণ্যসূর্য, আমি অরণ্য বলেই ডাকি ।’

পরীক্ষিৎ তবু প্রশ্ন করল, ‘তুমি কি এখন এখানেই থাকো? তোমার প্রজেক্টের কাজ শেষ হয়নি? তোমার স্বামীও কি এখানেই আছেন, নাকি তিনি লখনউতে?’

সরোজিনীর সংশয় নিমেষে উধাও । সেই এক ভাগ্যচক্র, এক ঘটনাক্রম । সেই একই মুখের আদল । মনে মনে কথাগুলো বলে পরীক্ষিৎকে মুখে বলল, ‘ওরে বাবা, আজই এলি, আজই এত কথা জানতে হবে নাকি? তোকে চিনতে তোর বাবার তো কয়েক মাস

লেগেছিল। নিজেকেও দুটো দিন তো দিবি। তাছাড়া জীবনের সব কিছু কি শুধু শুনলেই জানা হয়ে যায় রে, নিজেকেও খুঁজতে হয়।'

অবনীমোহন আর বাড়ি থেকে বেরয় না। রোজই শুধু এক বাটি খই-দুধ খেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়ে। একদিন হাতছানি দিয়ে পরীক্ষিৎকে কাছে ডেকে মৃদু স্বরে বলল, 'তোর কথাই হয়তো ঠিক। মানুষ আজন্ম হেরেই আছে। শেষ জীবনটাও একবিন্দু আলো জ্বালাতে পারলাম না রে, জীবনের শুরুর মতো শেষটাও লাঞ্ছনাতেই কেটে গেল।'

পরীক্ষিৎ কী বলতে যাচ্ছিল, অবনীমোহন তাকে থামিয়ে বলল, 'বালিসোনার মানুষের দুঃস্বপ্নের মূলে পৌঁছতে চেয়েছিলাম, এখন তো জীবনটাই একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়।'

সরোজিনী কাছে এসে বলল, 'চুপ করো। এক হার-জিতে যুদ্ধ শেষ হয় নাকি? আমি নতুন সেনাবাহিনী তৈরি করছি না? এবার নতুন যুদ্ধ শুরু হবে।'

জাহাঙ্গীরের উদ্যোগে অম্বরীশের রুটি কারখানা অনেক দিন পর আবার চালু হলেও পরীক্ষিৎ ও মিতার হয়ে পরিচালনা করতে হয় লিওনকে। পরীক্ষিৎ তার সঙ্গে কয়েকদিন কারখানায় যাতায়াত করার পর কারখানার সব শ্রমিক কর্মচারীদের সমবায় সমিতি গড়ে তাদের হাতেই কারখানার ভার তুলে দিল।

দুটি শর্তও দেওয়া হয়েছে, লিওন যেমন বাজারের অর্ধেক দামে মিষ্টি তুলসি সরবরাহ করত, তেমনই করে যাবে, কারখানাকেও তেমনই প্রয়াত শিবকৃষ্ণের স্কুলে আগের মতোই সস্তায় নিয়মিত পাউরুটি দিতে হবে।

এদিকে মিতার জন্য শহরের নামকরা সাইকিয়াট্রিস্ট আনা হয়েছে। কেস হিস্ট্রি শুনে ভালো করে রোগী পরীক্ষা করার পর ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে কাগজের মাথায় একটা মেন্টাল হোমের নাম লিখে পরীক্ষিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, এটাই বেটার অপশান।

পরীক্ষিৎ জানে মিতা বাড়ি ছেড়ে যেতে চাইবে না, সে বলল, 'সেটা মনে হয় সম্ভব হবে না। দরকার হলে বাড়িতে নার্সের ব্যবস্থা করা যায়।'

'ডাক্তারের কাজ কি নার্স দিয়ে হয়? আমার পক্ষেও এত দূরে ঘন ঘন আসা তো সম্ভব নয়। হোমে আমার অন্য পেশেন্টও আছে, ওখানে অ্যাডমিশন নিলে আমিও নিয়মিত চেক করতে পারি।'

কথার মাঝখানেই নন্দিনীর ঘর থেকে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেল। জঙ্গলে যেখানে দিবাকরের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, সেখানেই গুলিতে ঝাঁঝরা বালিসোনা থানার 'ন্যায়বান, সুদর্শন' ও-সির দেহ পড়ে আছে বলে মোহন মউলে খবর এনেছে। চৌধুরীবাড়ির ছোটদের জন্য মাস-পয়লার মধু দিতে এসে মোহন অনেকবার ও-সিকে নন্দিনীর ঘরের নীচের বাগানে বেড়াতে বেড়াতে নন্দিনীর সঙ্গে গল্প করতে দেখেছে। ও-

সি যে ন্যায়বান সেকথা মোহনের চেয়ে বেশি আর কে জানে! একবার এক কনস্টেবল ভয় দেখিয়ে ঘুষ আদায়ের চেষ্টা করছিল, তার হাত থেকে এই ও-সিই তাকে বাঁচিয়েছিল। আর মানুষটা সুদর্শন তো বটেই। চোখের জল কিছুতেই থামাতে না পেরে সে কান্নার সঙ্গেই চেঁচাতে লাগল, 'মা গো, ও মাগো, অমন ন্যায়বান, সুদর্শন মানুষটা রক্তের নদীতেই ঘুমিয়ে পড়লেন। শার্টের পিঠে পাঁচটা রক্তের গর্ত দেখে এলাম গো!'

পরীক্ষিতের নুতন নতুন 'বিষাদগাথা' মানুষের মনে ক্রমশ আরও প্রবল হয়ে তরঙ্গ তোলে। রবিবারের গানের মিছিলও ততদিনে আরও অনেক বড় আকার পেয়েছে। খবরের কাগজে বেশ কয়েকবার সচিত্র প্রতিবেদন বেরবার ফলে বালিসোনার বাইরের মানুষও এসে ভিড় করছে। তাদেরও কেউ কেউ মিছিলে পা মেলায়, কেউ কেউ গানে গলা মেলায়।

ঠিক হয়েছে এক রবিবার গানের মিছিলে 'বিষাদগাথা'র বেশ কিছু বাছাই পংক্তি বড় হরফে লিখে একশো প্ল্যাকার্ড বানিয়ে হাতে হাতে বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, পাঁচদিন ধরে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা দিন-রাত তাই নিয়ে মেতে আছে। রবিবার ভোর থেকে রাসমাঠে গানের মিছিলে গলা মেলাবার মানুষজন ভিড় করে আসতে শুরু করেছে, হাতে হাতে প্ল্যাকার্ড উঠে যাচ্ছে, পদযাত্রীদের সারি রাসমাঠের এমাথা থেকে ওমাথা ছাড়িয়ে রাস্তায় অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, সমবেত কণ্ঠে শুরুর গান দিয়ে মিছিল চলতে শুরু করেছে, হঠাৎ পরপর উনিশটি আধা-সামরিক বাহিনীর ট্রাক রাসমাঠে ঢুকতে লাগল। সঙ্গে প্রচুর পুলিশের গাড়িও আসছে। একেকটা ট্রাক মাঠে ঢোকা মাত্র মেশিনগান হাতে সৈনিকরা লাফিয়ে নেমে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কয়েকটা ট্রাক থেকে তাঁবুর সাজসরঞ্জাম নামিয়ে সৈনিকরা তখনই মাঠের মধ্যে তাঁবু খাটাতে লাগল।

সংগীতমিছিল প্রথমে যতটা সম্ভব এক ধার দিয়ে এগোবার চেষ্টা করেও ক্রমশ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। লক্ষ্মী লিওন পরীক্ষিৎ সরোজিনী সরস্বতী তাপস ও প্রথম কয়েক সারির আরও কিছু বিশিষ্ট মানুষ এক আর্মি অফিসারের কাছে জানতে চাইল- এভাবে হঠাৎ শান্তিপূর্ণ সংগীত-মিছিলের ওপর আর্মির অ্যাগ্রেসানের মানে কী?

অফিসার বুঝিয়ে বলল, 'দিস ইজ নট অ্যান এনক্রোচমেন্ট অন ইওর মিউজিক ফেস্টিভ্যাল। অ্যাকসেপ্ট আস অ্যাজ ইয়োর ফ্রেন্ডস। দিস ইজ আ ওয়ার এগেনস্ট জাঙ্গল টেররিস্ট। দে আর ভেরি ক্লোজ টু দিস ফেস্টিভ্যাল গ্রাউন্ড।'

রাসমাঠ থেকে না বেরনো পর্যন্ত মিছিল মিলিটারি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা বাঁচিয়ে খুব ধীর গতিতে এগোতে লাগল। সমবেত কণ্ঠের গানে সকালের আকাশ বাতাস ভরপুর, এরই মধ্যে মিছিলের মধ্যে থেকে তিনটে ছেলে ও একটা মেয়েকে পিঠে মেশিনগান ঠেকিয়ে মাথার ওপর দুহাত তোলা অবস্থায় সেনাবাহিনীর কয়েকজন বের করে এনে ঘিরে ফেলল। প্রত্যেকের হাতে মেশিনগান তাক করা। হঠাৎই বিদ্যুৎ গতিতে তিনজনের দুই যুবক

কুংফুর মতো শরীরের চরকিবাজি করে রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে মাটি ঘেঁসে পালাবার চেষ্টা করতে গেল, অন্য ছেলেটি ও মেয়েটিও একই কায়দায় উল্টো দিক দিয়ে দৌড় লাগাল । সেই চারজন ছাড়াও, ছত্রখান মিছিলের আরও ন'জন নিরীহ তরুণ সশস্ত্রবাহিনীর গুলিতে লুটিয়ে পড়ল । ধরা পড়া চারজনের এলোপাথারি গুলিতে তিনজন সেনার সঙ্গে সাতজন গানের তরুণ-তরুণী ও দুজন বালক-বালিকাও মারা গেল ।

পরীক্ষিৎ হাঁটুতে গুলির ক্ষত নিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত উন্মত্ত মানুষের ভিড়ে একবার সেনাপ্রধানের খোঁজে, একবার জঙ্গলের বিপ্লবীদের নেতার খোঁজে দৌড়োয় । চেনা-জানা যারা হারিয়ে গেছে, তাদের খোঁজে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে, যারা লুটিয়ে পড়ে কাৎরাচ্ছে তাদের ওপর ঝুঁকে পড়ে । নীলাঞ্জনা সরোজিনী লক্ষ্মী সরস্বতীকে খোঁজে, তার ছেলে অরণ্যসূর্যের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকে ।

কারও কাঁধে চড়বে না বলে, শেষ পর্যন্ত পায়ে হাঁটিয়ে পরীক্ষিৎকে হাসপাতালের নিয়ে যাওয়া হল ।

শেষবেলায় সরোজিনীকে ঘরে ঢুকতে দেখে অবনীমোহন জিজ্ঞেস করল, 'রাসমাঠে কি আজ কোনও উৎসব হচ্ছে? অনেক পটকার আওয়াজ শুনলাম!'

সরোজিনী আঁচলে হাত-মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'পটকা কী গো, মেশিনগান-রিভলবারের যুদ্ধ!'

প্রবল উৎকণ্ঠায় অবনী বলল, 'সে কী! এ কাদের যুদ্ধ?'

'তোমাদের সেই কপিখেতের যুদ্ধ । তার কি শেষ হয়েছে নাকি? সেই যুদ্ধই আজও চলছে ।'

আধাসেনা-বিপ্লবীদের গুলির লড়াইয়ে গানের মিছিলের হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ল । তা সত্ত্বেও পরের রবিবার ভোরে রাসমাঠের খালি অংশে জড়ো হয়ে সকলে নিহতদের উদ্দেশে আকাশে মুখ তুলে করজোড়ে নীরব প্রার্থনা জানাল । তারপর যথারীতি বালিসোনার আকাশ বাতাস সমবেত গানের কথা ও সুরে গমগম করতে লাগল ।

তারও দুদিন পরে পরীক্ষিৎকে অ্যাম্বুলেন্সে শুইয়ে বাড়ি আনা হল । মিতার কাছ থেকে চেয়ে এনে অম্বরীশের ক্রাচ-দুটোর ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সরোজিনী আপনমনে বলে উঠল, 'সেই এক ঘটনাচক্র ।'



৩১

সরোজিনীর মাথার চুলে একফালি সাদার পোচ ছাড়া সবটাই কালো, দাঁত অটুট, মেরুদণ্ড সামান্য বেঁকলেও বোঝা যায় না, কিন্তু রাসমাঠে আধাসেনার সঙ্গে বিপ্লবীদের সংঘর্ষের সময় ভীত মানুষের দৌড়োদৌড়িতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার পর থেকে তাঁকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়।

এক রবিবার গানের মিছিল থেকে ফেরার পথে লক্ষ্মীর মেয়ে চিরন্তনী মন দিয়ে দিদিমাকে দেখতে দেখতে বলল, 'তোমাকে এখন আরও সুন্দর দেখায়, দিম্মা। এবার লর্ড বায়রনের স্টাইলে হাতে একটা ছড়ি নাও, দেখবে সবাই তোমার সব কথা শুনবে।'

'তুই নিজে সুন্দর। তোর ফাজলামিও সুন্দর।' বলে সরোজিনীকে হেসে ফেলতে দেখে চিরন্তনী দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'কী অপূর্ব দেখালো গো তোমায়! এবার মঙ্গলমঞ্চে তুমিই কথা বলবে!'

'মঙ্গলমঞ্চ আসলে তোদের জন্য। পরে তোরাই ওখানে বলবি। এখন তাড়াতাড়ি চ', পরীক্ষিৎ মিছিলের কথা শোনার জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে থাকে রে।'

চিরন্তনীকে তাড়া দিলেও সরোজিনী নিজে খোঁড়া পায়ে দ্রুত হাঁটতে পারে না। অনেক বুঝিয়েও তাকে হাসপাতালে ভরতি করা যায়নি, নিজের নামের হাসপাতালে রোগী হয়ে সে কখনওই যাবে না। তার পায়ের পাতার হাড় ভেঙেছে বলেই মনে হয়, অবনীও তাকে হাসপাতালে অর্থপেডিক সার্জেনকে দেখানোর জন্য বলে রাজি করাতে পারেনি। অগত্যা সে-ই কয়েকদিনের জন্য আর্নিকা ও সিম্ভাইটাম খাওয়ায়।

মিছিলের দৈর্ঘ্য সপ্তায়-সপ্তায় বেড়েই চলেছে, প্ল্যাকার্ডে পরীক্ষিতের বিষাদগাথার টুকরো ছাড়াও তার কবিতার কোনও কোনও অংশও এখন তুলে দেওয়া হচ্ছে, মাঝে মাঝে গান থামিয়ে কবিতার অংশগুলো সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তিও করা হচ্ছে। শুনতে শুনতে পরীক্ষিতের চোখে কোনও ভাবান্তর ফোটে না।

একদিন লিওনার্দো সরোজিনীর সঙ্গে এসে পরীক্ষিতের কপালে বটপাতার মতো তার বিরাট হাতের পাতা বুলোতে বুলোতে বলল, 'তোমার কয়েকটা কবিতা আমি আমার

ভাষায় অনুবাদ করবার চেষ্টা করছি । কাজটা কঠিন ।'

পরীক্ষিতের দৃষ্টিতে আগ্রহ লক্ষ করে লিওন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, পরীক্ষিৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বলল, 'এক বক্স হোমিওপ্যাথি ওষুধ আর একটা গাড়ি যদি পেতাম- সব ছেড়ে অবনীজ্যাঠাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষকে আরোগ্য বিলোতাম ।' একটু দম নিয়ে আবার বলল, 'জানো লিওন, বালিসোনার সবাই কোনও না কোনও অসুখে ভুগছে ।'

পরীক্ষিৎ নিচু গলায় বলে চলল, 'অবনীজ্যাঠা ষোলটা ওষুধে অধিকাংশ রোগ সারিয়ে দিতে পারেন । বারোটা আমাকে শিখিয়েছেন, চারটে বাকি ।'

কপালে থেকে লিওনের হাতটা টেনে নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে ধরে দু-তিনবার চাপ দিয়ে আবার বলল, 'তুমি পারবে লিওন । একটা ড্রাইভার সুদ্ধু গাড়ি তুমি জোগাড় করে দাও । টাকার ব্যবস্থা আমরাই করব । ওষুধের দায়িত্বও আমার । অবনীজ্যাঠাকে একবার আসতে বলবে? একেবারে সরে আছেন!'

কথার শেষ পরীক্ষিৎ অনেকক্ষণ ধরে দম নেবার পর ক্লিষ্ট স্বরে বলল, 'অনেক কষ্ট দেখলাম, মানুষের কষ্ট দূর করার চেয়ে বড় কাজ আর নেই দাদা ।'

এতদিন বিকেল হতে না হতেই সরোজিনীর বালসেনার দল চৌধুরীবাড়িতে তাদের লাইব্রেরিতে এসে ভিড় করত, সরোজিনীও তাদের জন্য একেক দিন একেকরকম খাবার নিয়ে বসে সকলের সঙ্গে গানে, গল্পে, বই পড়ার মজায় আনন্দে কাটাত । চৌধুরীবাড়ির ওপর পুলিশ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর নজরদারির গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের আর চৌধুরীবাড়িতে পাঠায় না । বর্তমানে বিপ্লবচিন্তার সঙ্গে সম্পর্কহীন প্রাক্তন বিপ্লবীদের কেউ কেউ এই সেদিনও সরোজিনী বা পরীক্ষিতের কাছে আসত । তারাও আর আসে না । সরোজিনীই তাদের আসতে নিষেধ করে দিয়েছে । সে জানে তাদের ওপর নিশ্ছিদ্র গোয়েন্দা নজরদারি চলছে । পরীক্ষিৎ কোন কোন দেশে কোথায় কোথায় কাদের কাছে কেন গিয়েছিল তার সব তথ্য জানতে চায় তারা । এ জন্য গোয়েন্দারা জাহাজ কোম্পানিতে, বিমান সংস্থায় যাদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহের চেষ্টা করছে তাদেরই একজন, দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়, গোপনে সরোজিনীকে এসব কথা জানিয়ে গেছে । মঙ্গলমঞ্চ কারা চালায়, এর পিছনে কে, জাঙ্গল-টেররিস্টরাও এর মধ্যে আছে কি না, নানা সূত্র থেকে জানবার জন্য গোয়েন্দারা মরিয়া ।

বকুলবেদির কামরাঙাপাগল শীত গ্রীষ্ম বারো মাস বেদির চারপাশে সারা দিন শুধু ঠোঁট নেড়ে মুখের ভঙ্গিতে নেচে কুঁদে নীরবে কথা বলে যায়, চৌধুরীবাড়িতে বাইরের কাউকে ঢুকতে দেখলে শুধু তখনই তার সামনে লাফ দিয়ে পড়ে চোখ ঘুরিয়ে চিৎকার করে ওঠে- 'খবরদার! ঠাকুররে কামরাঙা না দিয়ি ঠাকুরবাড়ি ঢুকতি পাবা না!' আগন্তুক ভয় পেয়ে

গেলে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, 'ঠাকুররে কামরাঙা না দিলি কি চলে রে পাগলা!' তারপরই হুংকার- 'নাম কী? আসছ কোত্থেকে?'

পাগলের লম্ভঝম্ভ হুংকারে ভয় না পেলে বলবে, 'কে হে তুমি? কৃছিজীবি, না মচ্ছজীবি, না বুদ্ধিজীবি, না বন্দুকজীবি, না বিছুটিজীবি?'

'সোমবারউলি বুড়ি' সত্তর বছর ধরে প্রতি সোমবার চৌধুরীবাড়ির দরজা থেকে এক মুঠো চাল আর তিনটে আলু নিয়ে যায়, শেষ ক'বছর একটা করে মিষ্টি রুটিও দেওয়া হচ্ছিল। কামরাঙাপাগলের হুংকার শুনে সেই যে একদিন ভয় পেয়ে চলে গেল, তারপর থেকে আর সে ভিক্ষে নিতে আসে না।

একদিন দুপুরে পাগলের তর্জনগর্জনের সঙ্গে মেয়ে কণ্ঠের হাউমাউ কান্না শুনে ভণ্ডুল বেরিয়ে এসে দেখল দরজার সামনেই মাঝবয়সি এক বিধবাকে কামরাঙাপাগল লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চোখ ঘুরিয়ে ভয় দেখাচ্ছে, আর ধমকে চেঁচিয়ে বলছে, 'নাম কী? ঘর কোথায়? কামরাঙা না দিলি ভেতরে যেতি পারবা না!'

ভণ্ডুলকে দেখে তারই পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিধবা জানাল উদ্বাস্তু বালিকা বিদ্যালয় থেকে তার মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় তিনটে অচেনা ছেলে মেয়েটাকে টেনে-হিঁচড়ে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেছে। তার মাথার ঠিক নেই, সে প্রথমে এখানেই ছুটে এসেছে, বউরানি নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন। ভণ্ডুল লাফিয়ে পা সরিয়ে নিল। তাকে ভেতরে নিয়ে যাবার আগেই সরোজিনী, নীলাঞ্জনা ও মিতা পরীক্ষিতের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে বসতে দিল। বিধবা চোখের জল অফুরান হওয়া সত্ত্বেও বার বার মোছার চেষ্টা করে মিতাকে দেখে বলল, 'আপনাগো দয়াতেই নিরুপমা অ্যাৎটা পথ আইতে পারসে, আপনার স্কুলেরই মাইয়া, ওরে আপনারা বাঁচান, মাগো!'

মিতা তার ছাত্রীর নাম শুনে বলে উঠল, 'নিরুপমা ক্লাস ইলেভেনে পড়ে না? থানায় জানিয়েছেন?'

নীরুপমার বিধবা মা ডাইনে-বাঁয়ে মাথা এত ঝাঁকালো, যে তার চোখের জল ছিটকে মিতার কনুইয়ে এসে লাগল। সে উত্তেজিত হয়ে বিধবার হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, 'এক্ষুনি চলো, থানায় যাব!'

থানার ডিউটি অফিসার দুষ্কৃতীদের দেখতে ঠিক কীরকম জানতে চায়। লম্বা না বেঁটে, কালো না ফর্সা, কপাল সরু না চওড়া, নাক তীক্ষ্ণ না বোঁচা, চুল বড় বড়, না ঘাসছাঁট, ঘন না পাতলা, কালো না কটা, গোঁফ আছে, না নেই, দাড়ি ফ্রেঞ্চকাট না কামানো, না খোঁচা-খোঁচা, না ছাগলদাড়ি, গালে কপালে কাটা দাগটাগ আছে, না ভদ্র চেহারা, কথা বলছিল বাংলায়, না হিন্দিতে, না তেলুগুতে- তিনজনের বিষয়ে আলাদা আলাদা সব প্রশ্নের উত্তর ভীত শংকিত বিধবা যতটা মনে করতে পারল বলল।

লেখা হয়ে গেলে অফিসার বললেন, ‘দুটোকে তো চিনতে পারছি, আপনাদের অবনীমোহন চৌধুরীর ওপর যারা অত্যাচার করেছিল তাদেরই দুজন । ও কেসটার সব আসামীই তো এখন বেইল-এ, সেটাই সেলিব্রেট করছে আর কী! নিরুপমাদেবীর একটা ফটো দিয়ে যাবেন । এনেছেন নাকি?’

‘সঙ্গে তো নাই, আইজই দিয়া যামু ।’

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দরজায় দরজায় ছুটোছুটি করে, এখানে ওখানে ধরনা দিয়ে মেয়ের সঠিক কোনও খবর পাওয়া গেল না । তৃতীয় বছরের মাঝামাঝি পুলিশ অফিসার জানাল নিরুপমাকে খুব সম্ভব মিডল ইস্টে পাচার করে দেওয়া হয়েছে, এবিষয়ে বেশ কিছু তথ্য পুলিশের হাতে এসেছে । তবে নিশ্চিত হতে আরও তদন্ত দরকার ।

আসামীরা প্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস হয়ে গেল ।

নিরুপমার মা দীপান্বিতা দেশ ভাগের সময় নিজের স্বামীকে হারিয়েছে, দেশের এক ভাগ ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে আরেক ভাগে এসে মেয়েকে হারাল ।

গানের মিছিলে এই ঘটনায় গভীর বেদনা ও তীব্র ধিক্কার জানিয়ে লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে হাতে ঘুরতে দেখা গেল । সরোজিনীর নিজের হাতে লেখা আলাদা রকম কোনও কোনও প্ল্যাকার্ড দেখে পথচলতি অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়েছে । সে নিজেও অস্থির । পায়ের ব্যথার জন্য বারণ করা সত্ত্বেও মিছিলের পুরোভাগে হাঁটবেই । শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীর চাপে ভুবনমোহনের তেপায়া লাঠি নিতে বাধ্য করা হল তাকে ।

পরীক্ষিৎ তার বাবার ক্রাচে ভর দিয়ে কোনওরকমে কয়েক পা গিয়ে আধাসেনার ক্যাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে মিছিলের যাত্রা শুরু দেখল । তারপর সারা রাত জেগে সে তার নতুন বিষাদগাথা লেখায় ডুবে রইল ।

মর্মান্তিক নিরুপমা-বৃত্তান্ত এরপর নানা জনের হাতে নানা ভাষায় নানা জায়গায় লেখা হতে লাগল । বালিসোনা থেকে বড় শহর পর্যন্ত সব দোকানে বাজারে স্টেশনে প্রচুর পোস্টারও পড়ল । নিরুপমার অন্তর্ধান রহস্য পুজোর ছুটির আগেই নতুন করে হাইকোর্টে বিচারের জন্য গৃহীত হল ।

ছুটির পর কোর্ট খোলার আগেই, দেওয়ালির পরদিন, বিবস্ত্র দীপান্বিতাকে বটবৃক্ষের পিছনে বসে কাঁদতে দেখে ওই বনাঞ্চলের ছাগলের পাল তাদের রোজকার লতাগুল্মভম ছেড়ে কিছুটা দূরে বিচরণ করতে লাগল ।

তখন থেকেই চোখের সামনে কুকুরকে ঢিল মারতে দেখলে বা লরির চাকায় বিড়াল চাপা পড়লে বা কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে, সারা দিন এরকম সব কিছুতে ‘এয়া নি মানষের সয়!’ বলা দীপান্বিতার মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেল ।

কামরাঙাপাগলের দেখা নেই । তিনদিনের অনুপস্থিতির পর একদিন ভোরে রেললাইনের ধারে মুণ্ডু ও দুহাত কাটা অবস্থায় তার মৃতদেহ পাওয়া গেল । বুকের ওপর

একটা সাদা কাগজে লাল রঙে লেখা- পুলিশের চরের উপযুক্ত শাস্তি ।

ভোরে জোর কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙেই পরীক্ষিতের মনে হল এ নিশ্চয়ই জাহাঙ্গীর । এবার তার মাথার সব চুল সাদা । চুল সাদা হবার কারণ আর এবারের দিগভ্রষ্ট সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা সে এভাবে শুরু করল- 'গাঢ় কুয়াশায় সমুদ্রে পথ হারিয়ে জাহাজ একটা জমাট কুয়াশার দ্বীপে গিয়ে ভেড়ে । সেখানে তিন মাস থাকার সময় মাথার সব চুল কুয়াশার মতোই সাদা হয়ে গেল । সেই দ্বীপে দ্রাগো নামে তিন হাজার বছরের প্রাচীন একটা গাছ আছে । গাছের নীচে এক অতিবৃদ্ধ সাধুর মূর্তির সামনে দ্বীপবাসীরা দণ্ডীকাটার মতো শুয়ে পড়ে তাদের জীবনের তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়ে প্রার্থনা করে । আমি জানতে চেয়েছিলাম আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গুণাহ কোনটি? কেউ যেন কানে কানে বলে গেল- লজ্জাবতী-ময়নামতী দুজনকে নিকা করে জাহাজে না নিয়ে যাওয়া আমার সবচেয়ে বড় পাপ । আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো কাজ কী? ওদের জন্মান্ধ ভাইকে দৃষ্টিদান । আরও অনেক প্রশ্ন মনে ভিড় করে আসছিল, কিন্তু তিনটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না । আমি তৃতীয় প্রশ্ন করলাম- আমার ইন্তেকাল কবে?'

'উত্তর পেলেন?'

'পেলাম । এই তিন প্রশ্নের উত্তর আরও আগে পেলে জীবনটা আরেকটু সুন্দর করে গড়তে পারতাম ।'

পরীক্ষিৎ ব্যথাতুর স্বরে বলল, 'ওই দ্বীপে আমিও কি যেতে পারি না?'

'আমার পুরো একটা জীবন লাগল । তোমার জীবনের এখনও অনেক বাকি । দ্যাখো চেষ্টা করে, হয়তো একদিন পারবে । আশ্চর্যের কথা কী জানো, ওটা মূর্তি, না মানুষের ফসিল, বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা বড় কঠিন । কুয়াশা মাথায় নিয়ে দিনের পর দিন চোখে চোখ রেখে বসে থাকতে থাকতে মনে হয় মূর্তির চোখের পাতা হঠাৎ হঠাৎ নড়ে উঠছে । দ্বীপবাসীদের বিশ্বাস, ওটা সাধুর মূর্তি না, স্বয়ং সাধু । তাঁরও বয়েস নাকি গাছটির মতোই আড়াই তিন হাজার বছর!'

সকালে জাহাঙ্গীরকে কোথাও দেখা গেল না । ভোরে কেউ কোনও কড়া নাড়ার শব্দও নাকি শোনেনি ।

শীতের শেষে বসন্তের সূচনায় শুভ এসে জানাল সে তার দুই দিদিকে জাহাজে নিয়ে যাবে । জাহাজে তারা রান্নাবান্নার কাজ করবে ।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করল, 'জাহাঙ্গীর এলেন না? তাঁর মত আছে এতে?'

'জাহাঙ্গীর সাহেব তো গত মাসে সমুদ্রেই মারা গেছেন । তাঁর জাহাজের ব্যবসা তাঁর শিক্ষামতো এখন আমিই দেখি । দিদিদের নিয়ে যাবার কথাও তিনিই আমাকে বলে গেছেন ।'

ব্যাগ থেকে কড়ে আঙুলের মতো ছোট্ট একটা শুকনো শেকড় বের করে পরীক্ষিতের হাতে দিয়ে বলল, 'জাহাঙ্গীর সাহেব এটা আপনার বাবার সমাধিতে পুঁতে দিতে বলেছেন। এর মধ্যেই নাকি তিনি আছেন, পরকালেও তাঁর জাহাজের দোস্তকে পাহারা দেবেন।'

নীলাঞ্জনা সেদিনই সব ব্যবস্থা করতে লেগে গেল। দুই বোনের ডাক্তারি পরীক্ষা, নতুন পোশাকের ব্যবস্থা, দেহ ও গৃহের পরিচ্ছন্নতা শেখানো- সব কিছুতেই মন দিতে হয় তাকে।

একদিন দুজনকে নিয়ে একটা জেনারেল ডায়েরি করাতে থানায়ও যেতে হল। অভিযোগ- কিছুদিন আগে লজ্জাবতী-ময়নামতীকে ভয় দেখিয়ে তাদের নগ্ন ছবি তোলাতে বাধ্য করা হয়েছিল। সে-ছবি কোনও-না-কোনও ভাবে কপি, প্রদর্শন, বিক্রি বা বিতরণ করা হতে পারে বলে তাদের আশংকা।

ডায়েরি লিখতে লিখতে অফিসার বলল, 'এসব কি কেউ প্রকাশ্যে করে! স্মাগলিংয়ের মতো এও এক গোপন ব্যবসা।' লেখা শেষ করে সোজা নীলাঞ্জনার চোখে চোখ রেখে যোগ করল, 'খোঁজ পেলে খবর দেবেন, পুলিশ রেইড করতে যাবে।'

পরীক্ষিতের সঙ্গে নীলাঞ্জনার বিয়ের পর থেকে সমাজতাত্ত্বিক-গবেষক, মহিলার অবৈধ সন্তানের কারণে তার প্রতি পুলিশের ভয় ও সমীহ ভাব অনেকটাই ফিকে হয়ে গেছে। থানার পদস্থ পুলিশ অফিসাররা তাকে একটু নিচু চোখেই দ্যাখে। বালিসোনায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরকম বিয়ের নামই হয়ে গেছে 'সন্তানোত্তর বিয়ে'। শিক্ষাদীক্ষাহীন লোকেরা বলে, 'বাছুরসুদ্দু গোরু নিয়ে গেল!'

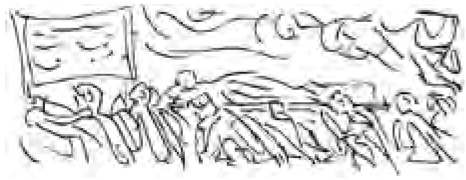
নীলাঞ্জনার নিজের সাজসজ্জা সাধারণ, লখনউয়ের শালোয়ার-কামিজের বদলে বালিসোনায় হালকা একরঙা শাড়ি, কিন্তু লজ্জাবতী-ময়নামতীকে সাজিয়েছে তার রুচি ও কল্পনা উজাড় করে। দুই বোনের মুখের ত্বকের তিক্ততা ও কাঠিন্যের ছাপ মুছিয়ে নীলাঞ্জনা তাদের আগেকার প্রাকৃতিক লাবণ্য ফিরিয়ে দিয়েছে। তবে যেহেতু এ-অঞ্চলের অনেকেই তাদের চেনে, তাই পথে কোনও অশান্তির আশংকায় দুজনেরই আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা।

দুজনকে বসানোও হয়েছে পর্দাঢাকা রিকশায়। শুভ বসেছে পিছনের আলাদা রিকশায়। তারও পিছনে একটা মাতাল 'ওরে আমার ময়নামতী, আমায় ফেলে চললি কোথায়' বলে কাঁদতে কাঁদতে রিকশা ধরার বৃথা চেষ্টায় অনেক দূর এসেও তাদের রিকশা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

রিকশা আটকাল পুলিশ ব্যারিকেডে। আগের দিনই খবরের কাগজে বেরিয়েছিল- প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গুপ্তচর সংস্থার মদতে সাতজন বিস্ফোরণ-প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসবাদী বালিসোনা, অন্নদাসী, কীর্তনখোলা, সোনাগুঁড়া, বামুনগ্রাম, প্রজাপতিপুর- প্রভৃতি গ্রামে

চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকেছে, উদ্দেশ্য শহরের বড় কয়েকটা রেলস্টেশনগুলো উড়িয়ে দেওয়া ।

সকাল থেকেই স্টেশন রোডের মুখে রাস্তা আটকে একদল পুলিশ বাস লরি গাড়ি থামিয়ে ভেতরে সন্দেহজনক কেউ আছে কিনা দেখে তবেই যেতে দিচ্ছে । খোলা রিকশা ছেড়ে দিলেও পর্দাঢাকা রিকশার ছাড় নেই । লজ্জাবতীদের রিকশার পর্দা তুলে বোরখা ঢাকা দুজনকে দেখে একজন মেয়ে কনস্টেবল শিমুলগাছের গুঁড়ির আড়ালে নিয়ে গিয়ে বডি সার্চ করে দুজনকেই ভদ্র নিরীহ মুসলমান বলে নিশ্চিত হয়ে ছেড়ে দিল ।



৩২

'মানুষের কুৎসিত মন দেখিলাম, বিবেকহীন সমাজ দেখিলাম, উদাসীন বিচারব্যবস্থা দেখিলাম, আর আমার বাঁচিবার ইচ্ছা নাই। তোমরা আমাকে ক্ষমা করিয়ো।'

বালিশের নীচে চিরকূট রেখে কখন রাতে উঠে গেছে, সরোজিনী টের পায়নি। অনেক রাত অব্দি পায়ের ব্যথায় জেগে শেষ দিকে গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল সে।

বকুলশাখা থেকে তাকে ঝুলতে দেখে জীবনে প্রথম সরোজিনী জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

অবনীমোহনের সুদীর্ঘ শেষযাত্রার প্রথমেই সাদা কাপড়ের ওপর খুব বড় বড় করে লেখা তাঁর শেষ কথা ক'টি দুপাশে দুজন পতাকার মতো ধরে বয়ে নিয়ে চলল। শবযাত্রা যত এগোয় তার দৈর্ঘ্যও তত বাড়ে। রাস্তার দুপাশের ভিড় বাড়ে আরও বেশি। বালিসোনার নতুন পুরনো সব চওড়া রাস্তা ঘুরে দিনের শেষে মিছিল এসে থামল রাসমাঠে। সেখানে তার ভাইয়ের পাশে তাকে সমাধি দেওয়া হবে।

তিনদিন পরই রবিবারের সংগীতমিছিল। এসপ্তাহের জন্য বন্ধ রাখতে লক্ষ্মী-সরস্বতী-নীলাঞ্জনা-লিওনের অনেক অনুরোধেও সরোজিনী রাজি হল না। সকলের নিষেধ উপেক্ষা করে ভুবনমোহনের তেপায়া লাঠি ভর করে পরীক্ষিৎকে পাশে নিয়ে সে যথারীতি মিছিলের সামনে পরীক্ষিতের মতোই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। তার পিছনেই লক্ষ্মী-সরস্বতীর হাতে অবনীমোহনের শেষ কথাগুলো লেখা বড় পতাকা। অবনীমোহনের আত্মহত্যার একুশ দিন পরে পরীক্ষিৎ তার বিষাদগাথায় সংগীতমিছিলের সমবেত এই গানকে বজ্রগর্জন ও বেহালার মূর্ছনা বলে উল্লেখ করেছিল।

মিছিল থেকে ফেরার সময় সরোজিনীর পায়ের যন্ত্রণা লুকনো গেল না। বাড়ি ফিরে দেখা গেল ডান পায়ের গোড়ালি থেকে আঙুলের গোড়া পর্যন্ত পুরো পা বেলুনের মতো ফোলা।

হাসপাতালের ডাক্তার এসে পায়ের অবস্থা দেখে অবিলম্বে অপারেশনের ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন, কিন্তু সরোজিনী তাতে রাজি না। বালসেনাদের নিয়ে তার আনন্দপাঠ

আগের মতোই চলতে লাগল ।

পরের রবিবার যেভাবেই হোক সংগীতমিছিলে যাওয়া আটকাতে ভোর-ভোর লক্ষ্মী-সরস্বতী আর নীলাঞ্জনা সরোজিনীর কাছে ছুটে এল । পরীক্ষিৎ আগের বারের মতো এবারও সরোজিনীর কোনও কাজে বাধা দেওয়ার বিপক্ষে ।

তিনজনে সরোজিনীর ঘরে ঢুকে দেখল, তখনও তার ঘুম ভাঙেনি । মিছিলের সময় হয়ে যাচ্ছে দেখেও সেদিন তিনজনের কেউ আর মিছিলে গেল না ।

পরীক্ষিৎ বেরবার আগে সরোজিনীর যাওয়া না-যাওয়া বিষয়ে জানতে এসে সেও আর সেদিন মিছিলে যাবার উৎসাহ পেল না, পায়ের কাছে বসে তার রাঙাজেঠিমার নরম গোলাপি পাথরে বানানো অদ্ভুত শান্ত মুখের দিকে চেয়ে রইল । তার মনের মধ্যে একটা বিস্ফোরক অনুভূতির সঙ্গে দূরাগত কাগজপোড়া গন্ধও মিশে আছে ।

আগের রবিবারে মিছিলে হেঁটে সরোজিনীর পা ফোলার পর থেকে চিরন্তনী রোজই দিদিমার মাথার কাছে, বুকের কাছে শুয়ে বসে অনেক রাত পর্যন্ত তার সঙ্গে গল্প করে । কথা দিদিমাই বলে, বেশির ভাগ সময় সে শুধু মনোযোগী শ্রোতা । কালও সে ঘুমিয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত দিদিমা গানের মিছিল নিয়ে অনেক কথা বলছিলেন । তাঁর বিশ্বাস বালিসোনার সব মানুষই একদিন এই গানের মিছিলে শামিল হবে । পুরো বাংলাই একদিন বালিসোনার পথে হাঁটবে, বালিসোনার গান গাইবে । সকালে ডাকাডাকিতে চিরন্তনীর ঘুম ভাঙলেও তার পিঠে রাখা সরোজিনীর হাতে জাগার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না ।

ডাক্তার এক মুহূর্ত দেখে বললেন, ‘কষ্ট যা পেয়েছেন- পায়ে, কিন্তু মৃত্যুযন্ত্রণা ওঁকে ছুঁতে পারেনি । ঘুমের মধ্যেই হার্ট ফেল করেছেন! অবনীবাবু চলে যাবার পর হয়তো আর বাঁচতেও চাননি ।’

খবর পেয়ে নিরুদ্দেশ নিরুপমার মা দীপান্বিতা এসে ‘এয়া নি মানষের সয়!’ বলে সরোজিনীর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল ।

তার শেষযাত্রার পুরোভাগে তার বালসেনার দল, তার পিছনে লক্ষ্মীদের আর শিবকৃষ্ণবাবুর স্কুলের ছেলে-মেয়েদের দীর্ঘ মিছিল, তার পিছনে বালিসোনার আবালবৃদ্ধবণিতা । সবার শেষে চৌধুরীরা প্রায় সকলে । হাসপাতালের পাশ দিয়ে মিছিল যাবার সময় ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মীদের অনুরোধে ফুলে-ঢাকা সরোজিনীকে সামনেই বাদামগাছের তলায় নামানো হল । অনেক রোগীও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে । সরোজিনীর মুখটুকু ছাড়া সবটাই ফুলে ছাওয়া, তার ওপরেই হাসপাতালের সবার পুষ্পাঞ্জলি দান শেষ হলে মিছিল আবার নিঃশব্দে এগিয়ে চলল ।

সূর্যাস্তের অনেক আগে লক্ষ্মী-নীলাঞ্জনা বালসেনাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোর করছে, পরীক্ষিৎ কাছে এসে বলল, ‘এদের ঘরে ফেরাবার দায়িত্ব আমাকে দেবে?’

‘মা’র শেষযাত্রায় শেষ অব্দি থাকবে না?’

'আমি সইতে পারছি না লক্ষ্মীদি ।' পরীক্ষিতের গলা বুজে আসে ।

রাতে বাড়ি ফিরে সকালের কাগজপোড়া গন্ধের উৎসের খোঁজ পাওয়া গেল । রাঁধুনি জানাল পর পর তিনদিন রাত জেগে সুষমা বিদ্যালয়ের বচ্ছরকার উৎসবের জন্য বাতাসা আর নকুলদানা বানিয়ে বাকি রাতটুকু সে রান্নাঘরেই শুয়েছে, গতকালই প্রথম নিজের ঘরে গিয়েছিল । ভোরে উনুনে আঁচ দিতে এসে দ্যাখে ভেতরে তিনটে খাতা একদম পুড়ে গেছে, বাকি একটা খাতা তখনও পুড়ছে । জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে আধপোড়া খাতাটা সে শুকোতে দিয়েছে । পরীক্ষিৎ দেখল মলাটে তখনও 'ঋণী সরোজিনী' লেখাটা পড়া যায় । ভেতরের পাতার বেশির ভাগ অংশই পুড়ে কালো হয়ে গেছে । মাথার দিকে না-পোড়া লেখারও কোনও লাইন আস্ত নেই । সম্পূর্ণ দগ্ধ তিনটে খাতার দুটোর কালো হয়ে যাওয়া মলাটের একটায় 'বিরহিনী সরোজিনী', আরেকটায় শুধু 'বালিসোনার' কথাটা কালো পাথরে ছুরির লেখার মতো ফুটে আছে । পরীক্ষিৎ ভাবে রাঙাজ্যাঠাইমা কি তাঁর মৃত্যু আগে থেকেই জানতেন, নাকি এ তাঁর স্বেচ্ছামৃত্যু?

তার আধপোড়া খাতার ভাব-ভাষার ভগ্নাংশগুলি নানাভাবে সাজিয়ে রাতের পর রাত সম্ভাব্য অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করা তার নেশায় দাঁড়িয়ে গেল ।



৩৩

অরণ্য কলেজে ভর্তি হবার বছরে নতুন নতুন বন্ধুর সঙ্গে দুটি জ্যান্ত পুতুলও পেল । নীলাঞ্জনার যমজ ছেলে-দুটি পুতুলের মতো আদরে-খেলায় বড় হতে লাগল । এক দশকেই দুভাই সকলের মুখে মুখে হয়ে উঠল রূপকথার লালকমল আর নীলকমল ।

তাদের দৌরাত্ম্য আগে থেকে কেউ আঁচ করতে পারে না । দুভাই যখন বাড়ির পিছনের বাগানে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা তন্ময় হয়ে কী ভাবে, তারও নাগাল পায় না কেউ । তাদের চার চোখে কখন কী খেলে বেড়ায় শুধু তারাই জানে । কখনও স্বপ্ন, কখনও দুঃখ, কখনও দুষ্টুমি- না ঘুমনো পর্যন্ত ভাবের আনাগোনা চলতেই থাকে । যত দেখে পরীক্ষিতের মন ততই তার নিজের শৈশবে ফিরে যায়, নীলাঞ্জনার মন শংকায় ভরে ওঠে ।

মিতা কিছু দেখেও না, শোনেও না । রেডিওয় চাকরির একটা সময় রোজ ভোরে তাকে গীতাপাঠ করে শোনাতে হত । পুরো ভগ্বদগীতা তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল । সেই স্মৃতি, সেই স্বর সে ফিরে পেয়েছে । সবসময় পায়চারি করতে করতে সুন্দর কণ্ঠস্বরে গীতাপাঠ করাই এখন তার একমাত্র দিনযাপন ।

গত বর্ষাতেও বাদায় দুভাইকে জেলেদের সঙ্গে নৌকো বাইতে দেখা গেছে শুনে মিতা নীলাঞ্জনার কানের কাছে মুখ লাগিয়ে ফিস ফিস করে বলেছিল- 'বাদার কুবাতাস ওদের গায়ে লাগতে দিয়ো না তুমি । ও-বাতাস লাগলে পিঠে পাঁচ ক্ষত নিয়ে ওরা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে গো!'

এখন আর কিছুই বলে না । সারা গায়ে-মাথায় পাঁক মাখা দুভাইকে শক্ত হাতে বাহু ধরে টেনে এনে মইনুদ্দিন যখন বাইরের উঠোনে গীতাপাঠরত বউরানিকে পেয়ে নালিশ করল যে বাবুর বাড়ির এই খোকাবাবুরা আমাদের ঘরের ছেলে-পিলেদের সঙ্গে বাদার পাক ঘেটে মাছ ধরছিল, তখনও মিতা এক মুহূর্ত পায়চারি থামায়নি, গীতাপাঠও বন্ধ করেনি ।

নীলাঞ্জনা তাদের ধরে দীঘিতে চুবিয়ে আনতে গেল। সেখানেও দুই ভাই মায়ের হাত ছাড়িয়ে এপার-ওপার সাঁতরে দীঘি তোলপাড় করতে লাগল।

রাতে পরীক্ষিৎ লেখা থামিয়ে দেওয়ালের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দেখে নীলাঞ্জনা পোশাক পাল্টাতে পাল্টাতে বলল, 'তুমি জন্মান্তর মানো?'

প্রশ্নটা বুঝতে সময় নিয়ে পরীক্ষিৎ বলল, 'মানব কি, ওবিষয়ে কিছু জানিই না।'

'অরণ্য আগের জন্মে কী ছিল, কোথায় ছিল জানি না, এ জন্মে আমার কাছে এসেছে সূর্যাস্তের সময়। হয়তো সেই জন্যই ও সূর্যাস্তের মতো শান্ত।'

'তোমার তা-ই মনে হয়?'

উত্তর না দিয়ে নীলাঞ্জনা বলে গেল, 'এই বিচ্ছু-দুটোকে দ্যাখো, সব সময় কালবৈশাখীর মতো, কোন দিকে কী ভাঙবে-চুরবে, তার ফন্দি আঁটছে। নয়তো ঝড়ের আগের মতো থম মেরে আছে।'

পরীক্ষিৎ লিখতে লিখতে মুখ তুলে, নীলাঞ্জনার কথা মন দিয়ে শুনে বলল, 'প্রত্যেক মানুষই বোধহয় এক-একটা আলাদা ইউনিভার্স।'

'বাচ্চারা বাদরামো করছে, তার মধ্যে আবার ইউনিভার্সের কী দেখলে? তুমি জানো- লক্ষ্মীদিদের কচি-কচি লাউভরা চারটে লাউগাছে বাড়ির ছাদ ঢেকে গিয়েছিল, পরশু দুপুরে বাঁদর-দুটো গিয়ে ছুরি দিয়ে দুটো গাছের গোড়া কেটে সেখানে মুখ লাগিয়ে নাকি জল তেষ্টা মিটিয়েছে! এত জল বেরিয়েছে যে উঠোন কাদা-কাদা হয়ে গেছে। লিওন এসে না পড়লে হয়তো বাকি গাছ দুটোর গোড়াও কাটত। লিওনকে কী বলেছে জানো? লাউগাছের ওরকম শুকনো লাঠির মতো শরীরে এত জল পোরা আছে দেখে তারা অবাক হয়ে গেছে। বাকি দুটোর গোড়া কেটেও উঠোনে ছোট্ট একটা পুকুর করা যায় কি না সেটা দেখারও খুব ইচ্ছে।'

পরীক্ষিৎ ভাবে, তার বাবা কি তার এই দুই ছেলের মধ্যে ফিরে এল! জন্মান্তর সত্যি আছে কিনা সে জানে না। থাকলে ভালো হত।

শ্রাবণ মাসের পঞ্চমীতে ঝাঁপান উৎসবের দিন একদল বেদে-বেদেনী এসে চৌধুরীবাড়ির দরজায় 'কই গো, মা কই?' বলে হাঁক পেড়ে দাঁড়াল। আগের দুবার সরোজিনী এদের তাড়িয়ে দিয়েছিল, এবার সাহস করে তাকেই ডাকল হয়তো।

মনসা পুজো উপলক্ষে বালিসোনায় পাঁচশো বছরের পুরনো এই ঝাঁপান উৎসবে আশপাশের অনেক জেলার মানুষ এসে ভিড় জমায়। কত্তামায়েদের পরিচিত তেমনই কেউ হয়তো এসেছে মনে করে ভণ্ডুলরা কয়েকজন বাইরে আসতে একটা শক্ত পাকানো চেহারার বেদে এগিয়ে এসে বলল, 'তোমাদের বাড়িতে শাখামুটি আর তার বউ চামরকষা বাসা বেঁধেছে।'

এক যুবতী আগ বাড়িয়ে জানাল, 'শাখামুটির ছোবলে যদি বা বাঁচো, চামরকষার এক ছোবলে শরীল নিমেষে নীল হয়ে যাবে। যদি বলো, আমরা ধরে নিয়ে যাই।'

ভণ্ডুল তেড়ে উঠে বলল, 'তোমরা আগেও বার কতক এসেছিলে না? কত্তামা তাড়িয়ে দিয়েছিলেন!'

মেয়েটা পায়ের কাছ থেকে ঝাঁপি খুলে একটা সাপের লেজ ধরে তুলে সাপের মতোই হিসহিস করে বলল, 'এই দ্যাখ চামরকষা। তোদের বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে যাই?' আরেক হাতে আরেকটা সাপ তুলে বলল, 'এই দ্যাখ শাখামুটি।'

নীলাঞ্জনা-পরীক্ষিতের সঙ্গে লালকমল-নীলকমলও বেরিয়ে এসেছে।

শাখামুটির সারা গায়ে কালো-হলুদ ডোরা, চামরকষার গায়ে হালকা সবুজের সঙ্গে সাদা ডোরা।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি সাপখেলা দেখাতে এসেছ?'

'না বাবু, আপনাদের বাড়িতে একজোড়া শাখামুটি-চামরকষা বাসা বেঁধেছে। আমরা ধরে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'বাড়ির কোথায়, তোমরা জানো? কোন ঘরে বলতে পারবে?'

'না বাবু, ঘরে না, বাগানে।'

কালো-হলুদ, সাদা-সুবজ ডোরা দেখে লালকলম-নীলকমল একসঙ্গে 'কী সুন্দর' বলে হাত বাড়াল- 'আমিও ওরকম লেজ ধরে নাচাব।'

নীলাঞ্জনা লাফিয়ে দুজনের সামনে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল- 'খবর্দার না!'

পরীক্ষিৎ তর্জনী তুলে হাতে ধরা সাপ দুটো দেখিয়ে বলল, 'ঝাঁপিতে ঢোকাও। যাও, বাগানের সাপ ধরে নিয়ে চলে যাও।'

একজন প্রবীণ বেদে পরীক্ষিতের সামনে এসে বলল, 'বাড়ির চারপাশ শুঁকে আর কোনও সাপ এখানে আছে কি না আমি বলে দিতে পারি। এখান থেকেই মনে হচ্ছে কাছেই পুকুরপাড়ে একটা তেঁতলে কেউটে সোজা লেজের ওপর ভর দিয়ে উঠে কিছুটা দূরের কাউকে ছোবল মারবার তাল করছে।' আকাশে মুখ তুলে বড় বড় কয়েকটা শ্বাস নিয়ে যোগ করল, 'মনে লাগছে এখানে শঙ্খচূড়ও আছে। দুটোর তো শঙ্খ লেগেছে মনে হচ্ছে। একবার দেখব বাবু?'

শুনে উপস্থিত গ্রামবাসীদের কয়েকজন নতুন গামছা আনতে ঘরমুখো ছুটল। শঙ্খ লাগা সাপের যুগলমূর্তি নতুন গামছায় এসে খেলা করে গেলে সে গামছা নাকি গৃহস্থের সংসারে সৌভাগ্য আনে।

বেদেনী দুহাতের সাপ ঝাঁপিতে পুরতে পুরতে নীলাঞ্জনার উদ্দেশে বলল, 'সাপধরা তো ভালো, মা, ওদেরও আমি শিখিয়ে দিতে পারি।'

'তোমাদের কাজ সেরে চলে যাও! আর কখনও এখানে আসবে না ।' বলে দুই ছেলেকে হাত ধরে টেনে নিয়ে নীলাঞ্জনা ভেতরে চলে গেল ।

ঘরে ঢুকে দুজনকেই পর পর সোফায় ছুঁড়ে দিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'সুন্দর সুন্দর বলে ঝাঁপ দিচ্ছিলি, সুন্দরের মধ্যে কী মারাত্মক বিষ আছে তোরা জানিস? এখনও আমার সারা গা কাঁপছে!'

অরণ্য জেলা-লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে এসে ভারি ভারি বইগুলো টেবিলে নামিয়ে রেখে পুরো ঘটনাটা শুনল, তারপর দুভাইয়ের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'আমার বুদ্ধি আছে, সাহস নেই, তাই অনেক কিছুই করতে পারি না । তোদের সাহস আছে বুদ্ধি নেই, তাই সব কিছুই করতে যাস ।'

পরীক্ষিৎ-নীলাঞ্জনাও তাদের বৃথাই অনেক বোঝাল ।

শনিবার নিঝুম দুপুরে স্কুল থেকে ফিরেই দুভাই গোয়ালে ঢুকে অভ্যেসমতো সরাসরি গোরুর বাঁট থেকে দুধ খেতে গিয়ে থেমে গেল । কালো গোরু চোনা ও গোবর ছেড়েই চলেছে, চোখ দুটো ওল্টানো, চেনা হাম্বার বদলে গলা থেকে অদ্ভুত আওয়াজ বের করছে । সবুজ-সাদাডোরা একটা সাপকে গোয়ালের নর্দমার গর্ত দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে নীলকমল লাফিয়ে গিয়ে সাপটার ল্যাজ ধরে হ্যাঁচকা টানে বের করে এনে মাথাটা দেওয়ালে আছড়ে আছড়ে মেরে ফেলল ।

'মা, মা, দ্যাখো; দাদা, দেখে যাও; বাবা দ্যাখো' বলতে বলতে দুই ভাই তিনজনের খোঁজে খানিক এঘর-ওঘর করল । তাদের না পেয়ে নন্দিনীকে মরা সাপটা দেখাল, তারপর মেঘাবৃতকে দেখাল, অনর্থক মিতার কাছে দেখাতে গেল । তারপর লালকমলের কাঁধে সাপটাকে ঝুলিয়ে ল্যাজটা নিজে ধরে থেকে সবাইকে দেখাতে দেখাতে লক্ষ্মীদের বাড়ির দিকে গেল ।

কাঁধে ঝোলানো অত বড় একটা সাপ দেখে লক্ষ্মী চিরন্তনী দুজনেই আঁতকে উঠল । লিওন পুরো বৃত্তান্ত শুনে জিজ্ঞেস করল, 'গোরুটা বেঁচে আছে, না মরে গেছে?'

'তা তো আমরা দেখিনি । আমরা তো সাপটাকে মারতেই ব্যস্ত ছিলাম ।'

দু-বাড়ির সকলে গোয়ালে গিয়ে দেখল গোরুটা মরে পড়ে আছে । ডান পায়ের খুরের একটু ওপরে যেন খোঁচা লেগে রক্ত শুকিয়ে আছে ।

লালকমলের কাঁধে সাপ, মাথাটা তার বুক অব্দি ঝুলে আছে, পিছনে ল্যাজ ধরে আছে নীলকমল- এই দৃশ্য দেখে অরণ্য মাথা ঘুরে পড়ে গেল, নীলাঞ্জনা আঁতকে উঠে চোখ ঢাকল, পরীক্ষিৎ শুধু ধীরে ধীরে পায়চারি করে চলল ।

সপ্তাহ না ঘুরতে দুই ভাই পরস্পরের হাত ধরে দুহাত দোলাতে দোলাতে অরণ্যসংলগ্ন রেললাইন ধরে সোনা ব্যাঙ, ঘাস ফড়িং, পাখি, প্রজাপতি, গোসাপ, বনবেড়াল খুঁজতে খুঁজতে হেঁটে বেড়াচ্ছিল, দূরে সিগন্যালে থেমে থাকা একটা ট্রেন দেখে ছুটে এসে শেষ

কামরার দুই বাফার দুহাতে জড়িয়ে দুই ভাই ঝুলে পড়ল। একটু পরে হুঁইসেল দিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করলে তাদের মন উত্তেজনায় নাচতে লাগল, আজ অনেক দূরে চলে যাবে তারা।

ট্রেন পূর্ণ গতিতে ছুটছে, বাফারের গোলাকার লোহার ঘসায় পাঁজর টাটাচ্ছে, লালকমল-নীলকমল ভয় পেয়ে বাফার ছেড়ে দিতেই লাইনের পাথরের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

বুকের নানা জায়গায় ছড়ে গিয়ে শার্টে রক্তের ছোপ, দুজনেরই চিবুক ফেটে রক্ত পড়ছে, এই অবস্থায় নিজেরা হেঁটে হাসপাতালে চলে এল।

কোথায় কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে- ডাক্তারের এই প্রশ্নের উত্তরে আগাগোড়া সবটাই তারা খুলে বলল। একজনের কোনও অংশ বাদ পড়লে আরেকজন সেটা পূরণ করে দেয়।

ক্ষত পরিষ্কার করে, ওষুধ লাগিয়ে, ইনজেকশন দিয়ে চিবুকে বড় স্টিকার সেঁটে একজন নার্সকে দিয়ে দুজনকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হল।

পুরো বৃত্তান্ত শুনে নীলাঞ্জনা নিজের কপালে একবার মাত্র করাঘাত করে বলে উঠল, 'পৃথিবীতে তোরা বাঁচতে এসেছিস, না মরতে?'

এক ভাই বলল, 'সূর্য রোজ কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়, দেখতে ইচ্ছে করে, মা।'

আরেক ভাই বলল, 'একটা ভূ-গোলক কিনে দাও না, মা।'

'গ্লোব তো তোদের একটা আছে।'

'ওটা তো ছোট।'

তিন মাস পর একদিন ভোরে উঠে নীলকমল-লালকমলকে জাগিয়ে নীলাঞ্জনা তাদের সাদা হাফপ্যান্ট, সাদা হাফশার্ট, সাদা মোজা, কেডসের নতুন জুতো দিয়ে বলল, 'চানটান করে আধঘন্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নাও। একসঙ্গে জলখাবার খেয়ে তোমরা বাবার সঙ্গে বেরবে।'

দুভাইয়ের মনে ফূর্তি। 'কোথায় যাব মা? বাবা অনেক দূরে নিয়ে যাবে?'

'রেলগাড়িতে চড়তে হবে। সারা দিন সারা রাত রেলগাড়িতে থাকবে। প্রচুর খাবার দিয়ে দিচ্ছি। তিনবার খেতে হবে তো।'

আনন্দে দুভাই পাঁচশো করে স্কিপিং করে ফেলল। বিছানায় কয়েকবার ডিগবাজিও খেল।

যাত্রার পরিকল্পনা, উদ্যোগ, ব্যবস্থা সবই নীলাঞ্জনার। চিঠিপত্রের যোগাযোগ থেকে শুরু করে রেলে খাবার জন্য মুড়ির মোয়া, তিলের খাঁজা, চিঁড়েভাজা, চিনির বাতাসা,

পরোটা, মোহন ভোগ, সন্দেশ ইত্যাদি গুছিয়ে দেওয়া অব্দি সবই সে-ই করেছে। পরীক্ষিতের দায়িত্ব শুধু আদেশ পালন।

নিজের আসন ছেড়ে এক আসনেই দুভাই একসঙ্গে বসেছে। পরীক্ষিৎ বসেছে মুখোমুখি। গম্ভীর মুখে বাইরের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে আছে। দুভাই পরস্পরের গলা জড়িয়ে অবাক দৃষ্টিতে জানলা দিয়ে সব কিছু দেখছে। বড় বড় গাছ, তালগাছের সারি, ফসল ভরা খেত, জলভরা পুকুর-সুদ্দু তাদের পৃথিবীটাও যে অবিরাম পিছনের দিকে চলে যেতে পারে এটা দুজনের কেউই কখনও ভাবতে পারেনি, দেখেও যেন বিশ্বাস হয় না। গাছপালা ঘেরা কতগুলো চালাঘরের ছোট ছোট একেকটা গ্রামও পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে দুজনের চোখে ঘোর লেগে গেল। নীলকমল বাবাকে বলল, 'আমাদের পৃথিবীটা যে ঘোরে আগে তো এরকম দেখতে পাইনি, বাবা। শুধু বইয়ে পড়েছি।'

'একদিন এই পৃথিবীর কথা বলব তোমাদের। জাহাজে করে সমুদ্রে ঘুরতে ঘুরতে যেসব দেশ আমি দেখেছি সেসব দেশের কথা তোমাদের বলব। অনেক রকম দেশ, অনেক রকম মানুষ। গায়ের রং, কথা বলার ভাষা, পরনের জামাকাপড়, ঘরবাড়ি, খাবার-দাবার, গান-বাজনা সব দেশে একরকম নয়। অনেক রকম তাদের আচার-অনুষ্ঠান। এমন দেশেও গেছি, যেখানে তখন সারা রাত আকাশে সূর্য ছিল। কোনও কোনও দেশ কয়েক মাস ধরে বরফে ঢাকা, কোনও দেশ মরুভূমির বালিতে ঢাকা, কোনও দেশ জঙ্গলে ঢাকা, সব বলব তোমাদের।'

লালকমল বাবার কথার মধ্যে ডুবে ছিল, বলল, 'ওইসব দেশে আমরা দুভাই যেতে পারি না? দাদাকেও নিয়ে যেতে পারি না?'

'বড় হও, আরও বুদ্ধি হোক, বিদ্যা হোক, সাহস বাড়ুক, তখন নিশ্চয়ই যাবে।'

রেলগাড়ির দুলুনিতে দুভাই খুশি।

একসময় নীলকমল দূরের পাহাড়শ্রেণী দেখিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'অতবড়ো পাঁচিল কিসের বাবা? অনেকক্ষণ থেকে দেখা যাচ্ছে। খুব লম্বা।

'পাঁচিল নয় রে, ওটা পাহাড়। ওই পাহাড়ের কাছেই যাচ্ছি আমরা।'

'পাহাড়ের ওপারে কি বাঘ সিংহ দৈত্য দানব আছে?' নীলকমল উঠে এসে বাবার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল।

'থাকলে কি তোমরা দৈত্যের সঙ্গে লড়তে যাবে নাকি?'

'অবশ্যই।' একটুও না ভেবে দুভাই কথাটা বলল একসঙ্গে।

'দাদার কথাটা মনে রেখো। আগে বুদ্ধি বাড়াও, বিদ্যা বাড়াও, তারপর সাহস দেখিয়ো।'

'দাদা এল না কেন বাবা?'

টার্মিনাল স্টেশনে ট্রেন থেমেছে, ছেলেদের নিয়ে, জিনিসপত্র নিয়ে নামবার তাড়াহুড়োয় পরীক্ষিৎ নীলকমলের প্রশ্ন এড়িয়ে গেল ।

দুই ভাইকে পাহাড়ের কোলে সৈনিক স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে তার তিনদিন পরে ফিরে আসার সময় দুজনের গালে মাথায় তাদের মায়ের মতো চুমু দিয়ে বলল, 'দাদার তো সামনে বড় পরীক্ষা, পরীক্ষা দিয়েই আসবে, মাও আসবে । পুজোর ছুটিতে আমি এসে তোমাদের বালিসোনায় নিয়ে যাব ।' পিছনে ফিরে চোখের জল আড়াল করে কিছুটা এগিয়েও জল মুছে ফিরে এসে আবার বলল, 'যেভাবে তোমরা সাপ মারো, দীঘি পারাপার করো, দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করার কথা ভাবো, লেখাপড়াটা এখানে সেভাবেই করবে । পুরো মন লাগিয়ে ।'

'অবশ্যই' বলেই নীলকমলের সংযোজন, 'বাবা, জানো, জানো- চৌকিদার বলেছে, এখানে অনেক ভালুক আছে । মহুয়া খেতে আসে । মহুয়া কী, বাবা?'

লালকমলের কৌতূহল, 'পাহাড়ের ওপারে কী আছে, বাবা?'

বিষাদগ্রস্ত, বিপর্যস্ত পিতা আপাতত এই বলে তাদের নিরস্ত করল, 'ভালো করে লেখাপড়া শিখলে নিজেই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, বাবা ।'



৩৪

সবে দিন শুরু হয়েছে, বকুলগাছে ও আশপাশের গাছে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে, পরীক্ষিৎ অনেক রাত অব্দি লিখে ভোরবেলা শুয়েছে, দরজার কড়া নাড়া শুনে নীলাঞ্জনা এগিয়ে গিয়ে দেখল দরোয়ান দরজা খুলে এক তরুণীর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ।

ভদ্র, সুশ্রী চেহারা, লালপাড় সাদা শাড়িতে যেন সুন্দরীই মনে হচ্ছে, নীলাঞ্জনা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কার কাছে এসেছ মা?'

'পরীক্ষিৎ চৌধুরীর সঙ্গে একবার দেখা করব ।'

পরীক্ষিৎ নিজেই উঠে এসেছে । কিছুটা দূর থেকে বলে উঠল, 'তিকান, তুমি?'

'তিকান আমার মা, আমি পরী । মাকে রেলস্টেশনে বেঞ্চে শুইয়ে রেখে তার ইচ্ছেতেই আমি আপনার কাছে এসেছি । তার তো আসবার ক্ষমতা নেই, আমাকেই বাড়ির রাস্তা বুঝিয়ে দিলেন ।'

'নীলাঞ্জনা, ওকে একটু বসাও, আমি তৈরি হয়ে আসছি ।'

'তুমি কিন্তু রাত থেকে এখনও অব্দি ঘুমোওনি ।'

'ঘুমোবার সময় অনেক পাব । ওকে দেখো ।'

হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে তিকানের মেয়ের সঙ্গে স্টেশনে গিয়ে পরীক্ষিৎ প্রথমে তিকানের কপালে হাত রাখল, তারপর নাড়ি দেখল, তারপর তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে শুইয়ে দিল ।

হাসপাতালে রোজই পরীক্ষিৎ তাকে দেখতে যায় । কোনও কোনও দিন নীলাঞ্জনাও সঙ্গে যায় । একদিন মিতাকেও নিয়ে গিয়েছিল । আশ্চর্যের কথা, মিতা একবার দেখেই বলল, 'তুমি কীর্তন ভুলে গেছ?'

মৃদু ও মলিন হেসে তিকান বলল, 'কীর্তনই আমাকে ভুলে গেছে ।'

'পরী তোমার মতোই কীর্তন গায় । মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যেও গায় । ও তো আমার সঙ্গে শোয় ।'

পরীও কয়েকদিন হাসপাতালে তার মাকে দেখে গেছে ।

একদিন হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মা এত অসুস্থ হলেন কী করে? এ তো মনে হয় অনেকদিন ধরে ভুগছে।'

'আমার বাবার জেল হবার পর থেকেই আমাদের অনটন শুরু হয়। অনেকদিনই দুবেলা খাবার জোটেনি। কোথাও কোনও মন্দিরে বা জলসায় কীর্তন থাকলে দুজনে গেয়ে কিছু পেয়েছি, তাই দিয়ে চলেছে কিছুদিন। তারপর আবার যে কে সেই।'

'তোমার মা-বাবা মন্দিরে থাকতেন না?'

'বাবা যতদিন ছিলেন আমরা মন্দিরেই থাকতাম। কোথাও তিন মাস, কোথাও ছ'মাস। মা তো একসময় আখড়ায়ও ছিল। বাবাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবার পর থেকে কোথাও দু-চার দিনের বেশি থাকতে পারি না। যেখানেই যাই, আমাদের মা-মেয়ের ওপর নানাজনের কুনজর পড়বেই। তাদের উৎপাত থেকে বাঁচতে কোথাও থিতু হতে পারিনি।'

বকুলবেদির কাছে পৌঁছে পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশ তোমার বাবাকে ধরল কেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জানাল, 'বাবা নাকি একজন জেলভাঙা বিপ্লবী। জেল থেকে পালিয়ে চেহারা পাল্টিয়ে তখনও নাকি বিপ্লবের কাজই করে বেড়াচ্ছিলেন। একদিন ঘোর বর্ষায় সন্ধের মুখে কাঁধ অব্দি চুল, গলায় কণ্ঠী, কপালে তিলক- মন্দিরে মার কাছে আশ্রয় চান। পরে দুজনে কণ্ঠী বদল করে মন্দিরও বদলে ফেলেন। পুলিশের ধারণা আমার বাবা বোষ্টমের ছদ্মবেশে তার আগেকার বিপ্লবী দলকে সংগঠিত করে বেড়াচ্ছিল।'

'তোমার মা-ই তাকে নিয়ে তোমাকে আমার কাছে আসতে বলেছিলেন?'

'না না, আপনার কাছে না। বালিসোনায় মায়ের বাবার একটা বাড়ি ছিল, রাজনীতির লোকেরা মাকে আর আমার দাদুকে তাড়িয়ে সেখানে উঁচু বাড়ি করছিল। সেই বাড়িতে যদি ছোট একটা ঘরও পাওয়া যায়, সে চেষ্টা করতেই আমরা এখানে আসি। মা একেবারে অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে আপনাকে খবর দিতে বললেন। আচ্ছা, আমার মাকে-দাদুকে যারা বাড়ি ছাড়া করল, সেই লোকগুলোর মন কি বিষাক্ত সিসে দিয়ে তৈরি?'

'তোমার যখন খুব বেশি মন খারাপ হবে, এই বকুলবেদিতে এসে বসো। ওদের কথা আর ভেবো না। লোভের বিষ সিসের চেয়েও মারাত্মক, সেই বিষে মন কালো হয়ে গেলে মানুষের হৃদয় বলে আর কিছু থাকে না রে।'

পরীক্ষিৎ, মিতা, নীলাঞ্জনা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, চিরন্তনী অনেকে মিলে তিকানকে হাসপাতাল থেকে নিতে এসেছে। একটা গাড়িতে মিতা লক্ষ্মী চিরন্তনীর সঙ্গে তিকান; পরী বসেছে অন্যদের সঙ্গে পরীক্ষিতের পাশে, আরেকটা গাড়িতে।

চৌধুরীবাড়িতে সোজা না গিয়ে তিকানের মন জুড়োতে, পরীর মন ভোলাতে কাছে দূরে কয়েকটা ঝুলন দেখানো হল।

বালিসোনার সবচেয়ে বড় ঝুলনযাত্রা হয় রাসমাঠে । ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়, নদী, নৌকো, দোলনা, কলাগাছ, বাঁশগাছ, ঘাসের বুকে গোরুর গাড়ি, গামলার সমুদ্রে আলোজ্বলা জাহাজ, সকলেই মুগ্ধ হয়ে দ্যাখে । এবছর নতুন যোগ হয়েছে পাহাড়ি রাস্তায় দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেন । সরু রেললাইনে তিনকামরার ছোট্ট ট্রেন ব্যাটারিতে চলছে, সামনের কামরার নীচে ব্যাটারি-বাক্স সাঁটা ।

চলন্ত রেলগাড়ি দেখতে ভিড়ও হচ্ছে খুব । এই আশ্চর্য রেলের নির্মাতা বালক মেঘাবৃত । অনেকদিন আগে শুধু স্কুলের সুদীপের মুখে টয় ট্রেনের কথা শুনে একার হাতে লাইন সমেত পুরো ট্রেনটাই বানিয়ে সে বাবার ফটোর পিছনে লুকিয়ে রেখেছিল । এবছর লাইন তৈরি করে এই প্রথম সকলের সামনে তার চলন্ত টয় ট্রেন দেখানো হচ্ছে । মহালয়ার ভোরে সে প্রতিবছর লাইন ছাড়া শুধু ট্রেনটা ফটোর সামনে রেখে বাবাকে ছবিতেই প্রণাম করে ।

তিকানকে পেয়ে মিতার অসাড় মন আস্তে আস্তে সাড় ফিরে পেল । সে নিজের হাতে তিকানকে দুবেলা বড় গ্লাস ভরা দুধ খাইয়ে তার গলার আওয়াজ ফিরিয়ে এনে সারাদিনে যখন তখন কীর্তন ফরমাশ করে । গীতার বদলে তার নতুন নেশা তিকানের গভীর গলায় কীর্তন গান । কীর্তনে ডুবে থেকে আগের চেয়ে তার কথাবার্তাও ক্রমশ স্বাভাবিক হচ্ছে ।

একদিন সরোজিনীর প্রিয় পদ 'না পুড়ায়ো রাধা অঙ্গ, না ভাসায়ো জলে' গাইতে গাইতে কান্নায় তিকানের গলা বুজে এল, মেয়ে পরী এসে মার চোখের জল মুছিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নিজেও কেঁদে ফেলে তাকে শান্ত করল । সে জানে আজ একুশে শ্রাবণ মার সঙ্গে বাবার কণ্ঠীবদল হয়েছিল ।

আজকাল নন্দিনীও কীর্তন শুনতে চলে আসে । তিকানকে কাঁদতে দেখে সেও ফোঁপাতে থাকে ।

মিতা দুলে দুলে দুচোখ বুজে শুনছিল, কান্নার শব্দে চোখ মেলে তিনজনকে কাঁদতে দেখে বলল, 'ভেবো না, মা-মেয়েকে কেঁদে ভাসাবার জন্য এখানে আশ্রয় দিয়েছি । এ বাড়িতে কান্নার অভাব নেই বাছারা । তোমাদের আদর করে ডেকে এনেছি, কীর্তন গেয়ে তার দেনা শোধ করতে হবে । কই, ধরো দেখি 'আমি যোগিনী হইয়ে যাব সেই দেশে যেথায় নিঠুর হরি । মা গাইবে, না মেয়ে গাইবে?'

'মার কাছে আমি! মা-ই গাইবে ।' বলে নিজেই গুনগুন করে উঠল 'দে দে, আমায় সাজায়ে দে গো-'

সকাল দুপুর সন্ধে সবসময় কীর্তন চলতে লাগল । বিশেষ বিশেষ তিথিতে রাতেও কীর্তন শোনা যায় । গানের কোনও কোনও কথায় বা সুরে নন্দিনীর মনের ব্যথা মিশে তার বুকে ঢেউ ওঠে ।

দিবাকরের খুনিদের শাস্তি চেয়ে বছরের পর বছর নন্দিনীর প্রার্থনা বিফলে যাবার পর একদিন গান শুনতে শুনতে তোলপাড় হৃদয়ে সে সকলকে লুকিয়ে একাই রেললাইন পার হয়ে জঙ্গলে গেল। পুরো দুদিন জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মাঝে মাঝেই গলা তুলে বলতে লাগল, 'যারা আমার ঘুমন্ত স্বামীকে আমার পাশ থেকে তুলে এনে খুন করেছে, আমার গর্ভের শিশুসন্তানের জনককে তার সন্তানের মুখ দেখতে দেয়নি, সেই শিশুকে যারা সারা জীবনের জন্য পিতৃহীন করে দিয়েছে, যতদিন না তারা অনুতাপে দগ্ধ হয়ে দয়া মায়া করুণার মর্ম বুঝবে, ততদিন তাদের বেঁচে থাকা যেন যন্ত্রণায় জ্বলে-পুড়ে যায়।' নাট্যাভিনয়ে মুখস্থ পাঠ বলার মতো নন্দিনী জঙ্গলের নানা জায়গায় একই কথা বলে বেড়ায়।

দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরে এক বুড়ি লাঠি ঠুকে ঠুকে নন্দিনীর কাছে এসে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'তুমি কে মা? তুমি এই বনের দেবী?'

'আমি এসেছি আমার স্বামীর খুনিদের খোঁজে। এখানেই কোথাও তাকে পাঁচ গুলিতে শেষ করে ফেলে রেখেছিল।'

বুড়ি যথাসাধ্য কোমর সোজা করে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'জঙ্গলের ওই জল্লাদরাই তো আমার দুই নাতিকে আজ তেরো দিন ঘর থেকে তুলে এনেছে, গ্রামের কচি-কাঁচাদেরও নাকি ওরা টেনিং দিয়ে জল্লাদ বানায়।'

প্রথমে একটা শেয়ালের সুরেলা ডাক, তারপর একসঙ্গে অনেক শেয়ালের হুক্কাহুয়া শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে একদল পুলিশ এসে দুজনকে ঘিরে ফেলে বলল, 'আপনি নন্দিনী চৌধুরী?'

'হ্যাঁ। নন্দিনী বসুচৌধুরী। দিবাকর বসুর খুনিদের খোঁজ পেয়েছেন?'

'আমাদের সঙ্গে আসুন। আপনার বাড়ির সবাই পাগল হয়ে আছেন।'

নন্দিনী ফেরার পথে এদিক-ওদিক শুকনো পচা পাতায় ছাওয়া মাটি যেখানে যেখানে বেরিয়ে আছে সেইসব জায়গায় চোখ বোলাচ্ছে লক্ষ করে একজন অফিসার বললেন, 'কিছু কি আপনার পড়ে গেছে? কিছু খুঁজছেন? খোঁজার মতো সময় নেই কিন্তু। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হবে।'

'এখানে আরও একজনকে পাঁচ গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল ওরা।'

বাড়ি ফিরে বিধ্বস্ত পোশাকেই নন্দিনী সকলের প্রশ্নের একই উত্তর দেয়- 'দিবাকরের খুনিদের অভিশাপ দিয়ে এলাম। গাছ থেকে গাছে যেভাবে হাওয়া বয়ে যায় সেইভাবে সমস্ত জঙ্গলে আমার অভিশাপ ছড়িয়ে দিয়েছি।'

পরের রবিবার থেকে ভোরে উঠে সেও মেঘাবৃতর সঙ্গে তৈরি হয়ে গানের মিছিলে যায়। সরোজিনীর মৃত্যুর পর মিছিল আরও দীর্ঘ হয়েছে। তিকান-পরীর জন্য পরীক্ষিৎ তার একটা নতুন বিষাদগাথা কিছুটা অদল-বদল করে কীর্তনের রূপ দিয়েছে। কথার টানে,

সুরের মায়ায় মিছিলের সেই গান তিকানদের গলা থেকে বালিসোনার অনেকের গলায় বয়ে যায়। মিতাও প্রথমে কীর্তনের টানে এসে পরে নিয়মিত, যত দূর পারে, মিছিলে হাঁটে। লালকমল নীলকমল পুজোর ছুটিতে এসে গাঁটসুদ্দু কয়েকটা বাঁশ কেটে লম্বা লম্বা লাঠি বানিয়ে মহা উৎসাহে ছোটদের রণ-পায়ে হাঁটার নিয়ম শিখিয়ে দেয়। সৈনিক স্কুলের পিছন দিকে আদিবাসী পল্লিতে যেমন দেখেছে সেইমতো রণপার ছোটখাটো একটা মিছিল সাজিয়ে মূল মিছিলের সঙ্গে জুড়ে দেয়। নিদ্দার নাতিও রণ-পা চড়ে গর্বভরে পা ফেলছে।

এরপর থেকে আশপাশের গ্রামের অনেকেই এসে মিছিলে যোগ দিতে এল, কেউ কেউ নিজেদের রণ-পা নিয়েও এসেছে। সরোজিনী পরীক্ষিৎ যে গ্রামে গিয়ে সরস্বতী পুজোর দিন শ্লেট-খড়ি দিয়ে এসেছিল, সেখানকারও কাউকে কাউকে মিছিলে দেখা গেল।

শীতের ভোরের কুয়াশা ফিরে এল। সাদায় ঢাকা সারা পৃথিবী। অদৃশ্য রাস্তায় গানের মিছিলকে কখনও মনে হয় অশরীরী আত্মার গান, কখনও মনে হয় প্রকৃতিরই একটা রূপ। মাঝে মাঝে মিছিলের কেউ কেউ দেখতে পায়- তাদের সামনেই ওই তো সরোজিনী চলেছে, ওই তো অবনীমোহন, ওই চলেছে অম্বরীশ, ওই যাচ্ছে জাহাঙ্গীর, ওই যে শিবকৃষ্ণ, ওই যায় দিবাকর।

মিছিলের জীবিত যাত্রীরা অনেকেই মৃতের উপস্থিতি অনুভব করে। অনেকে বিশ্বাস করে তারা এই মিছিলে আগের মতোই একসঙ্গে চলেছে।

একদিন আরও গাঢ় কুয়াশার ভোরে বাদা-জোড়া টাউনশিপের আকাশচুম্বী কুয়াশা ছিঁড়ে বিলাসবহুল ফ্ল্যাটগুলোর জানলায়, বারান্দায় একে একে আলো জ্বলে উঠল, মিছিলের গান শুনে বাসিন্দারা কুয়াশা-ঢাকা ঝাপসা মিছিলের রহস্য বুঝতে চায়। মিছিলের স্লোগান শুনতে অভ্যস্ত তারা রবিবারের গানের মিছিলের অর্থ বা উদ্দেশ্য ধরতে না পেরে কেউ কেউ অধৈর্য হয়, কেউ কেউ কৌতূহলী হয়।

নির্বাচনের চারদিন আগে বালিসোনার রাস্তায় রাস্তায় ফ্ল্যাগমার্চ শুরু হওয়ায় সবরকম রাজনৈতিক মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। রাসমাঠও আবার আগের মতো আধা-সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে অর্ধেকটা ঢাকা পড়ল।

গানের মিছিল কোনও রাজনৈতিক দলের মিছিল নয়- একথা কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত সরকারি নিষেধ অমান্য করে, পুলিশ ও আধা-সেনাবাহিনীর অনুরোধ ও হুমকি উপেক্ষা করে ছোট আকারে রবিবার গানের মিছিল বেরল। সকালের দৈর্ঘ্যের ঘাটতি বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে এল, মধ্যাহ্নে মিছিলের চেহারা অনেকক্ষণ ধরে টিভিতে দেখিয়ে এটাকে বালিসোনার দীর্ঘতম সংগীতমিছিল আখ্যা দেওয়া হল। সেই সংবাদে একথাও বার বার বলা হতে লাগল যে লাঠি বা গুলি চালানোর অনুমতি না পাওয়ায় পুলিশ বা আধা-সেনাবাহিনী নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিল। মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস বা জলকামান ব্যবহারেও সরকারের সায় মেলেনি।

ভোট গ্রহণের দিন বৃহস্পতিবার বালিসোনা সকাল থেকেই আশ্চর্য শান্ত । বুথে বুথে দীর্ঘ লাইনে সারিবদ্ধ ভোটদাতারা একের পর এক ভোট দিয়ে বেরিয়ে আসছে ।

পাঁচদিন পরে ভোট গণনার দিন ব্যালট বক্সের সিল ভেঙে গণনা শুরুর অল্প পরেই সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখল যে অল্প কিছু ভোট শাসকদলের ও বিরোধী দলের প্রার্থীর চিহ্নে পড়লেও বেশিরভাগ ব্যালট পেপারে সব প্রার্থীর নাম ও প্রতীকচিহ্নের পাশেই সীলমোহর দেওয়া । সব বুথের ভোট গণনার শেষে বাতিল ভোটের সংখ্যা শতকরা বিরানব্বইয়ে পৌঁছল ।

বালিসোনার তিনটি আসনই শূন্য পড়ে থাকায় এই অঞ্চলের ভোট বাতিল করে পুনর্নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে, না ভোট বাতিল নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় পরে এখানে উপনির্বাচনের তারিখ জানানো হবে তাই নিয়ে গোটা রাজ্যের ফলাফল বিশ্লেষণের ফাঁকে ফাঁকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে রাজনীতিবিশেষজ্ঞ নির্বাচন-ভাষ্যকারদের তর্ক-বিতর্ক চলল ।



৩৫

একদিন মিতা, নি. নী, মেঘাবৃত, লিওনার্দোর সঙ্গে বসে পরীক্ষিৎ তিকানের কীর্তন শুনছে, নীলাঞ্জনা ঘরে ঢুকে উত্তেজনা চেপে পরীক্ষিৎকে বলল, 'এখুনি একবার ঘরে আসতে পারবে?'

পরীক্ষিৎ অনিচ্ছাতেও উঠে এল ।

'তিকানের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল?'

প্রশ্নটা বুঝতে সময় নিয়ে ধীরে ধীরে বলল 'যদি হয়ে থাকে, সে দোষ তিকানের নয় । যদি না হয়ে থাকে সে দোষ কিন্তু আমার ।' বলে পরীক্ষিৎ হাসল, 'এতদিন পর, কী ব্যাপার?'

নীলাঞ্জনা একগুচ্ছ হলুদ হয়ে যাওয়া কাগজ দেখিয়ে বলল, 'এগুলো কী?'

তার প্রথম যৌবনের শেষ না হওয়া কবিতার কিছু কিছু অংশ, কয়েকটা কাগজে টুকরো টুকরো গদ্য, একটা লেখার ওপরে তার নাকের রক্ত একফোঁটা শুকিয়ে কালো হয়ে আছে । তখনও অকারণে তার নাক দিয়ে রক্ত পড়ার ব্যামো সম্পূর্ণ সারেনি ।

একটা বিবর্ণ কাগজে স্যাঁতসেঁতে ধেবড়ে যাওয়া কালির লেখা সত্ত্বেও পড়া যাচ্ছে- মহালগ্ন মেঘের মতো উড়ে যাচ্ছে । বৃথা হতে দেব কি দেব না বুঝতে পারি না । যদি তাকে হারাই সারাজীবন দুঃখ পাব, যদি তাকে পাই, তারপর কী, আমি জানি না । কিন্তু তিকানের জ্যোৎস্নামাখা চোখের জল ভুলব কী করে ।

নীলাঞ্জনা একভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে দেখে পরীক্ষিৎ বলল, 'এসব তুমি পেলে কোথায়? আমার তো মনেই ছিল না । কবিতাগুলোর কোনওটাই তো আর লিখতে পারিনি ।'

'আমি ভাবতাম তুমি একা, একেবারে নিঃসঙ্গ ।'

'সে তো এখনও ।'

সেকথা না ধরে নীলাঞ্জনা প্রশ্ন করল, 'পরী কি তোমারই মেয়ে?'

পরীক্ষিৎ মুখে মৃদু হাসি নিয়ে বলল, 'তোমার কী মনে হয়?'

‘তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই ।’

‘আমি না বললে তুমি নিজে বুঝবে না? বলা-না-বলায় সত্যিটা কি বদলে যায়? তাছাড়া, নীলাঞ্জনা, আমাদের কিন্তু এখন ঈর্ষাকাতর হবার বয়েস না ।’

‘তিকানরা কি এখন থেকে এখানেই থাকবে?’

‘সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না । ওদের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে । বালিসোনায় নতুন বাড়ির কয়েকটা ফ্ল্যাটই তো ওদের পাওনা । দেখা যাক কতদূর কী হয় । তবে মিতা ওদের ছাড়তে চাইবে কিনা জানি না ।’

কথার মধ্যেও তার কান-মন তিকানের গানের দিকে বার বার চলে যাচ্ছে দেখে নীলাঞ্জনা ব্যথিত ও অধৈর্য হয়ে বলল, ‘যাও, যাও, তিকানের গান বয়ে যাচ্ছে, তুমি যাও!’

জন্মাষ্টমীর দিন মিতার চাপে মা-মেয়েকে সারা রাত কীর্তন গাইতে হল । মাঝে একবার গলা বসে যাওয়ায় তিকান বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ভোরের দিকে নতুন পদ ধরল । আলো ফোটা পর্যন্ত শুনে পরীক্ষিৎ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে । পথে মানুষ নেই, শুধু লরির সারি । বালি রড পাথরকুচি বোঝাই করে ভোরের হাওয়ায় বিশ্রী শব্দ তুলে চলেছে ।

মন্থরোর মা-র নানা যেদিকটায় জঙ্গল কেটে বসতি পত্তন করে গেছে, তার সামনের অংশে বালি আর পাথরকুচির পাহাড় দেখে পরীক্ষিৎ দাঁড়াল । সারি সারি মজুররা হাতের পলিথিনের প্যাকেটের চুল্লুতে নেড়েবিস্কুট ভিজিয়ে সকালের চা-পান সেরে নিচ্ছে । সূর্য গোল হয়ে দেখা দিলেই তাদের দিনের কাজ শুরু হবে ।

চোখে ঘুম, শরীরে অবসাদ নিয়ে পরীক্ষিৎ ফেরার পথে রাস্তা সংক্ষেপ করতে রেললাইন ধরল । স্পষ্ট দেখল, তার পাশে পাশে অম্বরীশ হেঁটে যাচ্ছে ।

‘ঘরবাড়ির তলায় চাপা পড়ে সব মাটি মরে গেল রে! মাটি আর আকাশ ঢাকা পড়লে আর বেশি দিন বাঁচে না । মানুষের বুকের মানুষটাও মরে যায় ।’ বলে অম্বরীশ যেন এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস জোগাতে পরীক্ষিতের পিঠে বিরাট একটা থাবড়া মেরে তাকে লাইনের পাশে ফেলে দিয়ে চলে গেল ।

অবনীমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর রীতি অনুযায়ী পরীক্ষিৎ প্রতিবছর ফাল্গুনের গোড়ায় বালিসোনার মানুষকে বসন্তের প্রতিষেধক তিন সপ্তাহের তিন ডোজ মেলাড্রিনাম-২০০ বিলি করে । এবছর ওষুধের মোড়ক খুলে সবাই দেখল মোড়কের একপিঠে ‘মাটি ও আকাশ ঢাকা পড়লে মরে যায়’, আরেক পিঠে ‘মুমূর্ষুকে বাঁচানোই মানুষের ধর্ম’ কথাগুলো ছাপানো রয়েছে ।

গানের মিছিলেও পরীক্ষিতের নতুন নতুন বিষাদগাথার অংশ-বিশেষের সঙ্গে এই কথাটাও তুলে ধরা হল । বিষাদগাথা সংবাদপত্রে প্রকাশের পরদিনই পোস্টার হয়ে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে । কোনও কোনও পোস্টার গোটা রাজ্যের দেওয়ালে-দেওয়ালে সাঁটা

দেখতে পাওয়া যায় । 'মাটি ও আকাশ' আর 'মুমূর্ষুকে বাঁচানো' এভাবেই শহরে, গ্রামে, জেলায়-জেলায় ক্রমশ দেওয়াল থেকে তরুণদের মুখে মুখে ঘুরতে লাগল ।

শনিবার ভোরে সদর দরজায় জোর কড়ানাড়ার শব্দে পরীক্ষিতের ঘুম ভেঙে গেল । জাহাঙ্গীর মারা যায়নি ভেবে তার মন নানা দুর্যোগের মধ্যেও ভরসা পেল । দারোয়ানেরও আগে গিয়ে সে দরজা খুলে দিল । সামনে বারোজন সশস্ত্র পুলিশ । প্রথম তিন অফিসারের একজন বললেন, 'আপনাকে আমাদের সঙ্গে হেডকোয়াটার্সে যেতে হবে । চলুন ।'

'এভাবে গেঞ্জি পরে যেতে পারব না, জামা গায়ে দিয়ে আসছি ।'

'পাঁচ মিনিট সময় দিলাম । প্লিজ ডোন্ট ট্রাই টু বিফুল আস ।'

নীলাঞ্জনা, অরণ্য, মিতা, তিকান- সকলেই দরজা আগলে রাখা অফিসারদের কাছে জানতে চাইল, পরীক্ষিৎকে এভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন? কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী?'

'আজই কোর্টে প্রোডিউস করা হবে, সেখানে সব জানতে পারবেন ।'

সরকারপক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হল । বালিসোনা সহ পার্শ্ববর্তী আরও কয়েকটি জেলায় এবার একসঙ্গে সব ক'টি প্রতীকচিহ্নে ছাপ মেরে যেভাবে নিঃশব্দে ভোট পণ্ড করা হয়েছে তার পিছনে পরীক্ষিতেরই মাথা আছে বলে পারিপার্শ্বিক প্রমাণ মিলেছে । ন'বছর আগে রাসমাঠে আধা-সেনাবাহিনীর ওপর সশস্ত্র হামলার পিছনেও পরীক্ষিতের সক্রিয় সহযোগিতা ছিল । রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বৃহত্তর যুদ্ধ ঘোষণার জন্য গানের মিছিলের মাধ্যমে সে একটা বিরাট বাহিনী গড়ে তোলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে । এরই দিদি লক্ষ্মীপ্রতিমার গ্রিন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও পরীক্ষিৎ আলাদা ট্রেনিং স্কিম চালু করেছে । স্কুলের স্টুডেন্টদের সাঁতার, জিমনাস্টিক, ক্যারাটে, আর্চারি, হর্স রাইডিং শেখানো হচ্ছে । তাদের প্রতিষ্ঠিত মঙ্গলমঞ্চ অনেকদিন ধরেই সরকারি প্রশাসনের সমান্তরালে নিজেদের বেআইনি বিধিবিধান চালু করার চেষ্টা করছে । সম্প্রতি বালিসোনায় শতকরা আশি ভাগ জমিতে নির্মাণ নিষিদ্ধ করার গোপন ষড়যন্ত্রেও সে লিপ্ত । পরীক্ষিৎ চার বছর এগারো মাস বিদেশে থাকার সময় স্পেনের গ্রানাডা শহরে ও আলমেরিয়া বন্দরে গিয়েছিল । সেখানে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করে শাসক উচ্ছেদের অঞ্চলভিত্তিক লড়াইয়ের রীতি-নীতি বিষয়ে তাদের পরামর্শ নিয়েছে । অতএব মহামান্য আদালতের কাছে পুলিশের আবেদন, অভিযোগের পক্ষে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ উদ্ধারের কাজে সহায়তার জন্য পরীক্ষিৎকে চোদ্দ দিন পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হোক । আদালত পুলিশের প্রার্থনা মঞ্জুর করল ।

সারা রাত গোয়েন্দাদের জেরার উত্তরে পরীক্ষিৎ জানাল- রাসমাঠে আধাসেনা-জঙ্গলসন্ত্রাসীদের সংঘর্ষ চোখে দেখার আগে সন্ত্রাসীদের সে জানতই না, ভোট পণ্ড করতে সে কখনও কাউকেই বলেনি, যা করেছে মানুষ নিজের বিবেচনায় করেছে, গানের মিছিল

মানুষের মনে দয়ামায়া করুণার বীজ ছড়ানোর সংগীত-উৎসব ছাড়া অন্য কিছু নয়, সে চারবছর এগারো মাস বিদেশে ছিল, শুধু গ্রানাডা ও আলমেরিয়াই নয়, আন্দালুসিয়ার কর্ডোবা-গ্রানাডা ছাড়াও স্পেনের আরও অনেক জায়গায় সে ঘুরেছে, রাশিয়ার কির্কিনেস বন্দর থেকে জাহাজে বিশ্বের উত্তরতম শহর হ্যামারফেস্ট হয়ে নরওয়ের মধ্যযুগের রাজধানী বার্জেন পর্যন্ত বহু বন্দরশহরে সে নেমেছে, কোথাও কোনও সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে তার কখনও সাক্ষাৎ হয়নি । লক্ষ্মীদির স্কুলে মিলিটারি ট্রেনিং না, প্রকৃত মানুষ গড়ার বিশেষ প্রশিক্ষণসূচি তৈরিতে লক্ষ্মী-লিওনার্দোর সঙ্গে সেও মাথা ঘামিয়েছে মাত্র । তবে, আশি ভাগ জমি খালি রাখার কথাটা অবশ্য একশো ভাগ সত্যি । বালিসোনার কোথাও কোনও ঘরবাড়ি, দোকান-বাজার নির্মাণ করতে হলে পুরো জমির শতকরা আশি ভাগ খালি রাখার স্বপ্ন তো সে তার লেখাতেও বলেছে । কিন্তু মানুষের প্রতি এ তার অনুরোধ ও প্রার্থনা । সশস্ত্র আন্দোলনের আহ্বান নয় ।

চারদিন ধরে পরীক্ষিতের একই কথা শুনতে শুনতে গোয়েন্দা অফিসাররা কৌশল বদলে সারা রাত তার চোখের সামনে এক হাজার ওয়াটের দুটো ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে রেখে তার বলা না-বলা কথা ধরে-ধরে অর্থহীন অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেল । পাঁচ-ছ ফুটের মধ্যেই ওই তীব্র আলো জ্বলে ওঠা মাত্রই তার গাল ও কপাল আগুনের তাপে ঝলসে যায় । চোখে কিছুই দেখতে পায় না ।

গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টা পর, রবিবার ভোরে গানের মিছিল থেকে গান ও গর্জন শুনে বাদাজোড়া নতুন নগরের বহুতল বাড়ির ফ্ল্যাটগুলোর জানলায় বারান্দায় আলো জ্বলে উঠল । পুরনো বালিসোনার মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে । আকাশের যে-জায়গাটা জুড়ে আগে ক্রেনের নড়াচড়া ছিল ঠিক সেখানকার বহুতল বাড়ির আলোকিত ব্যালকনির সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র অনর্গল কথা বলে তার বনবাস যাপন করে চলেছে । আজও সে কথা বলায় মগ্ন ছিল, পিছনের রাস্তায় ভোরের সগর্জন বানরসেনার মিছিল দেখে সেও মিছিলের সামনে গিয়ে একবার বাঁহাত একবার ডানহাত তুলে-বাড়িয়ে তার বানরসেনা পরিচালনা করতে লাগল । তার ফূর্তির কারণ ক্রেনের শূন্য জায়গায় আলোর মালায় সজ্জিত লংকাপুরী আক্রমণ করে এবার তার সীতাকে উদ্ধার করা যাবে । সারা রাত তর্জনী তুলে রাবণকে শাসাতে শাসাতে তার হাত ও মুখ ব্যথা হয়ে গেছে ।

মিছিল এবার পুরো রাস্তা জুড়ে চলেছে, পাশাপাশি আটজনকে এভাবে আগে কখনও দেখা যায়নি । দৈর্ঘ্যেও এই মিছিল আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে । গান ছাপিয়ে এরকম গর্জনও আগে কেউ শোনেনি । এক পুলিশ অফিসার ও দুজন কনস্টেবল লাঠি উঁচিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে মিছিলের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার সময় কেউ কেউ সেটাকে মিছিলের ওপর পুলিশের লাঠি চার্জ ভাবলেও মিছিল নির্ভয়ে একইরকম উদ্দীপনায় এগোতে লাগল ।

পরের রবিবার মিছিলের দৈর্ঘ্য আরও বাড়ল। পরীক্ষিতের মুক্তির দাবিতে লেখক শিল্পী গায়ক অধ্যাপক অভিনেতারাও পথে নেমে এসেছেন । ছুটির দিনের সকালের চা-জলখাবারের উদ্যোগ না করে মেয়েরাও ঘর ছেড়ে মিছিলে পা মিলিয়েছে।

গ্রেপ্তারের তৃতীয় রবিবার ভোর থেকে বালিসোনার প্রধান প্রধান রাস্তায় ১৪৪ ধারা জারি করা হল। শেষ রাত থেকেই পুলিশের জীপ থেকে মাইকে বারবার অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকার ঘোষণা করা হতে লাগল, সকলের বোঝার জন্য এ-ও বলা হল- কোথাও একসঙ্গে পাঁচজনের বেশি লোক জড়ো হবেন না, হলেই পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করবে।

ঘোষণা শুনেও অনেকে এল, অনেকে এল না। অধিকাংশ মানুষ ঘোষণা না শুনে চলে এসেছে। মেয়েরা আজ সংখ্যায় আরও বেশি। কেউ কেউ শিশু-কোলেই এসেছে। টিভিতে খবরের কাগজে খবর দেখেও বহু লোক ট্রেন থেকে নেমে মিছিলে পা মেলাচ্ছে। বাস-রাস্তার দুধারে যেখানে মরুভূমির মতো আদিগন্ত শুকনো জমি সেইখানে মিছিলের পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট পুলিশবাহিনী। মিছিলও দাঁড়িয়ে গেছে। অনেকে রাস্তায় বসে পড়েছে। মাইক হাতে পুলিশ প্রথমে ১৪৪ ধারার কথা জানিয়ে এই জনসমাবেশ বেআইনি ঘোষণা করে সকলকে শান্তিপূর্ণভাবে বাড়ি ফিরে যেতে বলল। একজনও পুলিশের কথায় কান দিচ্ছে না দেখে, ঘড়ি ধরে সময় বেঁধে দেওয়া হল। তার মধ্যে রাস্তা ফাঁকা না করলে সকলকেই গ্রেপ্তার করা হবে। এজন্য সারি সারি পুলিশ-ভ্যানও তৈরি রাখা হয়েছে।

ঊনত্রিশে আগস্ট সকাল ন'টা পঁচিশে পুলিশবাহিনী আবালবৃদ্ধবণিতা নির্বিচারে মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ করল। যাদের পারল তাদের টেনে হিঁচড়ে ভ্যানে তুলল। অনেক কবি-শিল্পী অধ্যাপক ও বয়স্ক মানুষ নিজেরাই এগিয়ে এসে ঠেলাঠেলি করে ভ্যানে উঠে গেলেন।

পরদিন তিরিশে আগস্ট সকালে স্কুল-কলেজ দোকান-বাজার অফিস আদালত বন্ধ করে রাস্তায় মানুষের ঢল নামল। মিছিল থেকে গানের বদলে সেদিন শুধু আকাশ কাঁপানো গর্জন উঠতে থাকল। বিকেল তিনটে সতের মিনিটে শুরু হয়ে পুরো তিনঘন্টা ধরে পুলিশের গুলিবর্ষণের উত্তরে মিছিল থেকেও গুলি ও গ্রেনেডের যুদ্ধ চলল। রিভলবারের গুলি ছাড়াও গামছায় মুখ ঢাকা চারজনের প্রত্যেকের হাতে ছোট আকারের পাঁচনলা থেকে একসঙ্গে পাঁচগুলি ছুটে গিয়ে একেকবারে পাশাপাশি তিন-চারজন পুলিশকে এফোঁড়-ওফোঁড় করতেও দেখা গেল। দুটি কিশোরের ক্ষিপ্র ও লক্ষ্যভেদী গ্রেনেড নিক্ষেপ যে দেখল সে-ই অবাক হল। মিতা, নীলাঞ্জনা, নন্দিনী, তিকান, লক্ষ্মী, চিরন্তনী, লিওন ছাড়া মিছিলের আর কেউ তাদের চেনে না। এমনকি পরীও পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে সেরে না ওঠা পর্যন্ত তাদের চিনত না। সন্ধের অন্ধকারে পুলিশের হতাহতের সঙ্গে মিছিলের নিহত ও গুরুতর আহতদের দুটো আলাদা কালো

ভ্যানে তুলে নেবার আগেই জ্ঞানহীন পরীকে নিয়ে লিওন লক্ষ্মী নীলাঞ্জনা ও তিকান হাসপাতালে চলে এল। দ্রুত অপারেশন করে বাহু থেকে তার গুলি বের করে দেবার তিনঘন্টা পর পরী যন্ত্রণায় চোখ মেলে নীলাঞ্জনা ও তিকানের সঙ্গে লালকমল-নীলকমলকে দেখে ক্ষীণ গলায় বলল, 'ওরা কে মা? কাল মিছিলেও দুজনকে দেখেছি।'

'কাল নয়, আজই মিছিলে দেখেছিস। ওরা লালকমল-নীলকমল, দুভাই, নীলাঞ্জনার ছেলে। কাল তোকে বাড়ি নিয়ে যাব।'

'কোন বাড়ি? নদীয়ায় নদীর ধারের বাড়ি? নাকি এখানে দাদুর বাড়ি? নাকি মিতাদিদিমার বাড়ি? আমরা কোথায় যাব মা?'

লালকমল-নীলকমল এতক্ষণ সব দেখছিল আর শুনছিল। এবার লালকমল বলল, 'আমাদের বাড়িতেই নিয়ে যাব।' নীলকমল ধরতাই দেয়, 'ঘোড়ায় চড়ে যেতে চাও? আমরা তার ব্যবস্থাও করতে পারি।' লালকমল বিশদ করে দেয়, 'স্টেশনের ওধারে জঙ্গলে ঢাকা একটা গোরস্থান আছে, সেখানে সাদা ধপধপে দাড়িওলা এক বুড়ো মুসলমানের খুব সুন্দর একটা ঘোড়া আছে। ছোটবেলায় আমরা দুভাই সেই ঘোড়ায় চড়ে অনেকবার জঙ্গলে আছাড় খেয়েছি।' এবার নীলকমল- 'যদি চড়ো, খানিকক্ষণের জন্য চেয়ে আনতে পারি। আমরা চাইলেই দেবে। আমাদের ও বলে লব-কুশ।'

পরী ক্ষীণ স্বরেই বলল, 'তোমাদের ছোটবেলায়- সেটা কবে? তোমরা তো এখনও ছোটই।'

'আগে ছিলাম। এখন আমরা বড় হয়েছি। পনেরো শেষ করে ষোলয় পড়েছি আমরা।'

'খুব হয়েছে, এখন বাড়ি চ' তো। আগে তো কখনও এরকম স্কুল থেকে একা চলে আসতি না?'

'মা, তুমি কেন ভুলে যাও, পাহাড়ের দেশে আমরা অনেক কিছু শিখেছি। পাহাড়ে চড়তে শিখেছি, তীরধনুক দিয়ে খরগোশ, সাপ, বনবেড়াল শিকার করতে শিখেছি। গুলতি দিয়ে পাখির ছানা খেতে আসা ঈগল তাড়াতে পারি। মহুয়া খেতে শিখেছি, আদিবাসীদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে নাচতে পারি, পাহাড়ি নদী হেঁটে পার হতে পারি, ঝরনার মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারি।' দুভাই পালা করে তাদের একেকটা সিদ্ধির কথা বলে যায়।

'স্কুলে এইসবই শেখায় বুঝি?'

'না, না, স্কুলের বাইরে শিখি এসব। স্কুলে জানতে পারলে কড়া শাস্তি দেবে।'

'তাই বলে মহুয়া খাবি? ওসব খাই আমরা?'

'খেতে খারাপ না মা। ছোটবেলায় একবার বিজয়া দশমীর দিন দারোয়ানের ঘরে সিদ্ধি খেয়েছিলাম, মিষ্টি-মিষ্টি, সেরকম খেতে। আমরা সাঁওতালদের সঙ্গে মোটে দুদিন খেয়েছি।'

পরী প্রথম থেকে দুভাইয়ের মুখের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে তাদের অদ্ভুত সব বাহাদুরির কথা শুনছিল, কিছুক্ষণ পর অ্যানাসথেসিয়ার রেশ পুরোপুরি কেটে যেতে যন্ত্রণায় তার মুখ বেঁকে গেল, শেষদিকে ওদের কথায় আর মন দিতে পারল না। ব্যথা কমার বড় ট্যাবলেট খেয়ে তার আবার ঝিমুনি এল।

তাদের বাবাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে খবর পেয়ে দুভাই পাহাড়ের খাঁজে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে থাকা পলিথিনের চাদরে মোড়া পিসবোর্ডের বড় বড় বাক্সভরা গ্রেনেড থেকে লুকিয়ে বেশ কয়েকটা নিয়ে বালিসোনা এসেছিল। মালগাড়ি থেকে পাহাড়ের বন্দুকবাজদের লুট করা সব জিনিস উদ্ধার হলেও পুলিশ এই গ্রেনেডের বাক্সগুলোর সন্ধান পায়নি শুনে অনেকদিন ধরে লালকমল- নীলকমল পাহাড়ে জঙ্গলে তন্ন তন্ন করে খুঁজে শেষ পর্যন্ত গ্রেনেডের হদিশ পেয়েছে।

বাবাকে পুলিশ লোহার গরাদ দেওয়া ঘরে আটকে রেখেছে শুনে দুভাই মাকে বলল, ‘গরাদ ভেঙে বাবাকে আমরা দুজনে বের করে আনব মা?’

‘ওরকম করা যায় না। এসব কথা আর কখনও মুখেও আনিসনি।’

আদালতের জামিন পেয়ে পরীক্ষিৎ বাড়ি ফিরে দিনের বেলা গাঢ় কালো চশমা পরে থাকে। রাতে পারতপক্ষে আলো জ্বালানো হয় না। জ্বালালে রাতেও তাকে রোদচশমা পরে নিতে হয়। আলো তার চোখে সয় না।

রবিবারের সংগীতমিছিল চলতেই থাকে। এরপর প্রতিবছর ঊনত্রিশে আগস্ট, তিরিশে আগস্ট বালিসোনার শোকদিবস হিসেবে পরপর দুদিনই মিছিল বেরবে ঠিক হল। একদিন মৌন মিছিল, আরেক দিন গানের।



৩৬

স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়ে লালকমল-নীলকমল বাড়ি ফিরে এল । পরীক্ষার ফল বেরলে বড় শহরে কলেজে ভর্তি হবে । তার আগে দুজনে দিনের পর দিন বালিসোনার এপাড়া-ওপাড়া এগ্রাম-ওগ্রাম, বনজঙ্গল, খালবিল, পোড়োজমি, জলাভূমি ঘুরে ঘুরে জরিপ করে শেষ পর্যন্ত তাদের স্কুলের দেশের মতো পাহাড় বানানোর বাসনা ত্যাগ করল । স্কুলের দিনগুলোতে পাহাড়ের কোলে, ওপরের জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে দুভাই কতদিন বালিসোনায় এরকম একটা দীর্ঘ পাহাড়ের স্বপ্ন দেখেছে । পাহাড়ের পিছনে রোজ সূর্য ডুবে গিয়েও সারা পশ্চিম আকাশ অদ্ভুতভাবে রাঙিয়ে দেয়, দুভাই ভেবেছিল বালিসোনায়ও ওরকম আকাশ হবে । তার বদলে বাদা জুড়ে বিরাট একটা নতুন শহরে আকাশ ঢাকা পড়ে গেছে, সারি সারি বহুতল বাড়ির আড়ালে অস্তগামী সূর্য তার রঙের পাপড়ি মেলতে পারে না ।

মিতা দুই ভাইকে ঘরে ডেকে নিয়ে তাদের কাছে পাহাড়ের গল্প শোনে । পরীকে শোনায় । লালকমল সেখানকার সূর্যাস্ত আর এখানকার সূর্যাস্তের মধ্যে তুলনা করে একদিন বলল, ‘এইসব আকাশ ফুঁড়ে ওঠা বাড়ি কী করে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় বলো তো? দিয়ে আবার এখানে ঘাস-মাটি ভরিয়ে দেওয়া যায় না?’

হুবহু অম্বরীশের মন । মিতা আর ভয় পায় না । তার স্বামীর স্বপ্নের কথা মনে করে বলল, ‘ঘাস মাটির তলায় নদীও হয়তো আবার খুঁজে পাওয়া যায় ।’

একা পরীর সঙ্গেও দুভাইয়ের অনেক কথা হয় । কখনও লালকমল-নীলকমল একসঙ্গে আসে, কখনও আলাদা । তখন বাইরে থেকে মিতার সঙ্গে ফিরে এসে তিকান যদি কীর্তন গাইতে শুরু করে, দুভাই-ই কিছুটা শুনে উঠে পড়ে । কীর্তন তাদের ভালো লাগে না । কিন্তু পরী একলা যদি তাদের জন্য গায় তাহলে তারা চুপ করে বসে শোনে । পরী গাইতে গাইতে একবারও চোখ খোলে না বলে সে জানতে পারে না লালকমল-নীলকমল গান শোনার থেকে বেশি তার মুখের দিকে চেয়ে আছে ।

রাজধানীর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা শেষ না করে অরণ্য ফিরে এল । সারা দিন একরকম, সন্ধে হলে কেমন ঢুলুঢুলু চোখে বসে বসে ঝিমোয় । কেউ কিছু না বললে সে নিজে থেকে কথা বলে না । নীলাঞ্জনা সন্দেহবশে অরণ্যর জিনিসপত্র খোঁজাখুঁজি করতে করতে ম্যাগ ফস ১২X লেখা একটা শিশি দেখতে পায় । ভেতরে ম্যাগ ফসের বড়ির বদলে সাদা পাউডার । শিশির বেশিটাই খালি ।

প্রদীপ অনেকদিনই দিল্লির পাট তুলে দিয়ে বালিসোনায় ফিরে দিনরাত ইংরিজিতে কী একটা বই লিখছে । সরোজিনীর মৃত্যুর পর থেকে শুধু সংগীতমিছিল নয়, বালিসোনার সব কিছু থেকেই সে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়েছে । নিতান্ত প্রয়োজন না হলে সে কারও সঙ্গেই আর আগের মতো কথা বলে না । কেউ এসে কাচার জন্য জামাকাপড় চাইলে বের করে দেয় । খাবার দিয়ে গেলে খেয়ে নেয় । কথা বিশেষ না বললেও কখনও কখনও তাকে কথায় পায় । তখন একবার শুরু করলে আর থামতে চায় না । মাঝেমাঝে অসংলগ্ন কথাও বলে ।

একদিন দুপুরে অরণ্য কিছু টাকা চাইতে এসে জিজ্ঞেস করল, 'সারা দিন আপনি কী লেখেন ছোটদাদু?'

অরণ্য তাদের বড়দাদুকে কোনওদিন দেখেনি, তার ছেলেকেই ছোটদাদু বলে ডাকে ।

'একটা বই, আস্ত একটা বই লিখছি ।'

'কী নিয়ে লিখছেন?'

'আমার অটোবায়োগ্রাফি লিখছি । আসলে কী যেন একটা লিখতে চাই, হয়তো সুভাষচন্দ্র বসুর সত্যিকার জীবনী, অথবা হয়তো বালিসোনার ইতিহাস, কিংবা তেইশবিঘা-আমবাগানের আত্মকথা । বিষয়ের খেই হারিয়ে এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে চলে যাচ্ছি রে । খুব ইচ্ছে করে মন্থরোর মার জীবনকথা লিখি । কোনওদিন হয়তো কপিখেতের যুদ্ধও লিখব । কিংবা আমার ঠাকুরদার শেষজীবন । টাকা নিয়ে তুই কী করিস?'

'এমনিই । আপনার অসুবিধা থাকলে, থাক ।'

'না না, অসুবিধা কিসের? সারাজীবন তো শুধু আয়ই করেছি । বড় খরচ বলতে তো বই কেনা ।' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কী ভেবে, আবার বলল, 'বই পড়ত বটে রাঙাকাকিমা । ওরকম বিদূষী নারী বালিসোনায় আর কখনও হবে কি না জানি না । অবশ্য চিরন্তনীর কথা বলতে পারব না, ওর একটা বই সম্প্রতি ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে একসঙ্গে পাবলিশড হয়েছে শুনলাম । আমি এখনও পড়িনি বা দেখিনি । চিরন্তনী আমাকে বলেছিল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় দারিদ্র্যের মূল কারণ নিয়ে সে গভীরভাবে ভাবছে । হয়তো ওই বিষয়েই সে লিখেছে । হয়তো নাড়া দেবার মতো মৌলিক কোনও কথা সে

বলতে পেরেছে। মুশকিল কী জানো, রাঙাকাকির কথা আমি ভুলতে পারছি না। ওঁর মনটা রবীন্দ্রনাথের যুগের মন। খানিকটা পেয়েছে পরীক্ষিৎ। ও আর পাওয়া যাবে না।'

সন্ধেবেলা অরণ্য ঝিমধরা চেহারায় ঢুলুঢুলু চোখে বকুলবেদিতে বসতে গিয়ে দ্যাখে পরী অন্ধকারে লুকিয়ে বসে কাঁদছে। অরণ্যকে দেখে সে উঠে দাঁড়ায়। অরণ্য আরও একটু জায়গা ছেড়ে দিয়ে বলল, 'তুমি আমাদের পরী না? তুমি কাঁদছ কেন? তুমি এখানে বসলে আমার কোনও অসুবিধে হবে না। তোমার কিসের দুঃখ? আমার বাবাকে গিয়ে বলো, বাবা সকলের দুঃখ নিয়েই ভাবেন।'

পরী হাউহাউ করে কেঁদে উঠে আরও বেশি অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

তিনদিন পর মিতা ও তিকান পরীক্ষিতের ছাড়া পাওয়ার মানতের ঢিল খুলতে বিশালাক্ষীতলায় যাওয়ার সুযোগে দুপুরবেলা পরীকে একা পেয়ে লালকমল কী একটা বলতে গিয়েও কথা পাল্টে নিয়ে বলল, 'তোমার এ কী চেহারা হচ্ছে দিন দিন, রাতে ঘুমোও না?'

এই দুটি ছেলের ওপর পরীর অগাধ আস্থা, তার জন্য এরা করতে পারে না এমন কাজ নেই। তেমনই কোনও ভরসার কথা ভেবে বিষণ্ণ দুচোখ লালকমলের চোখের ওপর রেখে মৃদু স্বরে পরী বলল, 'সাত মাস পরে আমি মা হতে যাচ্ছি। তার আগে আমি আত্মঘাতী হব।'

'সে কী! কী করে তুমি বুঝলে তুমি মা হতে যাচ্ছ?'

'সব মেয়ে যেভাবে বোঝে।'

'তুমি মা হলে, এর বাবা কে?'

'তোমরা জানো না? তোমরাই তো তার কাছে শ্রীচৈতন্যের নিজের হাতে লেখা চিঠি আছে বিশ্বাস করে যখন যা চেয়েছে দিয়েছ। সে-চিঠি তোমাদের দেখাবে বলেছিল না? দেখাতে পেরেছে?'

'তোমার সেই টিচার?'

'নদীয়ায় আমার বাবার কাছে আসত, ভালো ছাত্র ছিল। খুঁজে খুঁজে ঠিক চলে এসেছে।'

'কণ্ঠীবদল না কী যেন বলো, তোমাদের কি তাই হয়েছে?'

'সামনের অঘ্রাণে বিয়ে হবে বলেছিল।'

'তাহলে এখনই বাবা হল কী করে?'

'তোমরা বুঝবে না।'

'কাল ও এলেই আমাদের খবর দেবে। হাত-পা বেঁধে ওকে দীঘিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসব।'

'তিন মাস হয়ে গেল আর আসে না, তোমরা জানো না?' বলেই মুখে হাত চাপা দিয়ে বমি আটকে দৌড়ে বাথরুমে যেতে গিয়ে মিতার সঙ্গে ধাক্কা লাগতে লাগতেও সে সামলে নিল । মিতা ভাবল ঘরে দুজনে হয়তো হাত ধরাধরি করে বসে ছিল, তাদের পায়ের শব্দে একজন লজ্জায় পালাল । দুই ভাইয়ের সঙ্গে পরীর গভীর বন্ধুত্ব । দেখে তিকান অসন্তুষ্ট হয়, মিতার ভারি ভালো লাগে ।

সেদিন রাতে আরেকবার বমি করতে উঠে সে তিকানের কাছে ধরা পড়ে গেল ।

পরদিনই ভোরে তিকান এই দ্বিতীয়বার সকলের অগোচরে বালিসোনা ছেড়ে চলে গেল । প্রথমবার বাবাকে নিয়ে, এবার মেয়েকে নিয়ে ।

দুজনে সত্যিই চলে গেছে আবিষ্কার করে মিতার বুক শূন্য হয়ে গেল । তার মনে হয় তার বড় একটা সম্পদ তার ঘুমের ঘোরে কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে । এক রাতেই তার জীবনের আরও একটা আশ্রয় যেন চুরমার হয়ে গেল ।

বেলায় বাড়িময় শোরগোল উঠল । সকলেই বেকুব বনে গেছে । কাউকে কিছু না বলে, কোনও হদিশ না রেখে এভাবে হঠাৎ গৃহত্যাগের কারণ কেউ ভেবে পেল না । যত ভাবে তত অবাক হয় । ক্রমশ মা ও মেয়েকে চৌধুরী বাড়ির অধিকাংশ সদস্যেরই ভারি রহস্যময় মনে হয় ।

এরপর তিকানদের সে বাঁচাবে কী করে, মিতার বুকের শূন্যস্থান ভরবে কী দিয়ে পরীক্ষিৎ ভেবে পায় না ।

লালকমল-নীলকমল সকলের নজর এড়িয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে অনেক দূরে রেললাইনের ধারে পৌঁছেই দুজনে একসঙ্গে বুক উজার করে কেঁদে উঠল । অনেকক্ষণ কান্নার পর নীলকমল জিজ্ঞেস করল, 'ওর বাবা কে, কিছু বলে গেছে?'

'পরীর প্রাইভেটে পরীক্ষার সেই টিচার ।'

'পরী চলে গেল কেন? পরীকে না দেখলে আমরা বাঁচব না । চল, ওকে খুঁজে বের করি । বলেছিল আত্মঘাতী হবে । আমরা হতে দেব না । বাচ্চাটাকেও বাঁচাতে হবে । আমরা দুজনে ওকে বড় করে তুলব ।'

'আসলে আমাদের ভুলটা কোথায় হয়েছে জানিস?'

'কোথায়?'

'যখনই আমরা জানলাম, তখনই আমাদের দুজনের ওকে বিয়ে করে ফেলা উচিত ছিল ।'

'দুজন ছেলে একটা মেয়েকে কি বিয়ে করতে পারে?'

'পারে না? চল, ছোটদাদুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি । ছোটদাদু অনেক কিছু জানে ।'

দুজনকে ঘরে ঢুকতে দেখে প্রদীপ চশমা কপালে ঠেলে ওদের মুখ দেখতে দেখতে বলল, 'তোমরা কারা?'

'আমরা লালকমল আর নীলকমল । পরীক্ষিৎ চৌধুরীর ছেলে । আচ্ছা, দুটো ছেলে একটা মেয়েকে বিয়ে করতে পারে?'

'মেয়েটা রাজি হবে কেন?'

'হবে ।'

'ছেলেদুটোই বা রাজি হবে কেন?'

'হবে ।'

'দেশের আইন রাজি হবে না ।'

'যমজ ছেলে হলেও না?'

'ওরে, আমি একটা-ছেলে হয়েও একজন মেয়েকে বিয়ে করতে পারলাম না, তোরা চাস দুজনে একটা মেয়েকে বিয়ে করতে! বেশ, তাই কর গিয়ে, এখন আমাকে লিখতে দে ।'

সারা রাত পরিকল্পনা করে, সামান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ভোর হবার অনেক আগেই লালকমল আর নীলকমল পলাতকা পরীদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল ।

সাত মাস পরই পরীর পেট কাটা হবে কল্পনা করে ভয়ে তাদের বুক শুকিয়ে গেছে ।



৩৭

একটা কংকালের মুখ মানুষের চামড়া দিয়ে টান টান করে ঢেকে দিলে যেমন দেখায় রুদ্র ঝম্পটির মুখের চেহারা তেমনই হয়েছে । দিনে রাতে দু-পাঁচ মিনিটের জন্যও সে শুতে পারে না, সব সময় বসে থেকে মুখ হা করে শুধু হাঁপায় । চোখ দুটো তখন ঠেলে বেরিয়ে আসে, বাড়ির লোক সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ভয়ে দমবন্ধ করে ভাবে, এই বুঝি চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসবে ।

হাঁপানির টান কমলে পিঠের কাছে উঁচু বালিশের স্তূপে হেলান দিয়ে বসে বসেই যতটা পারে জিরিয়ে নেয় ।

বড় বড় ডাক্তারবাবুরাও তাকে কোনও আরাম দিতে পারেনি । তার শ্বাসনালীর ভেতরে আটকে থাকা খাসির নলীর হাড়ের টুকরো শুধু ওষুধ দিয়ে বের করা অসম্ভব বলে সবাই রায় দিয়েছে । একমাত্র উপায় জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন । আগে একবার তার গলায় অপারেশন হয়ে গেছে, তারপর নতুন করে আবার অপারেশন করাতে সে নিজে ও তার বাড়ির লোক রাজি নয় । সতেরো বছর ধরে বুক ভরে একটু বাতাস নেবার যন্ত্রণাদায়ক চেষ্টা নিয়ে সে এখনও বেঁচে আছে । তার দলের ছেলেরা, প্রবীণ রাজনৈতিক সহকর্মীরা, প্রতিবেশীরা যে যখনই তাকে দেখতে আসে সে শুধু তার দুর্বল কাঁপা কাঁপা হাত জোড় করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে তাদের দিকে চেয়ে থাকে । শুধু তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে । গলার ক্যান্সার অপারেশনের পর থেকে সে আর কথা বলতে পারে না ।

সকলের কাছে তার নির্বাক ক্ষমা প্রার্থনার কথা এতদিনে বালিসোনার অনেকেই শুনেছে । তাদের মধ্যেও কেউ কেউ তাকে দেখতে আসে । তাদের কাছেও ঝম্পটি জোড় হাতে ক্ষমা চায় ।

চৌধুরীবাড়ির সেজোছেলে বৃদ্ধ বয়েসেও একদিন রাত করে ঝম্পটির কাছে এসে ব্যক্তিগত একটা কাজে তার সাহায্য চাইল । তার অনেকদিনের ইচ্ছে, সামান্য কয়েকটা পারিবারিক কবরস্থান ছেড়ে রাসমাঠ তার বন্ধু-প্রমোটার হরেন ভদ্রের হাতে তুলে দেয় । তার সঙ্গে পার্টনারশিপে ওখানে জেলার সবচেয়ে বড় পাঁচতলা শপিং মল হবে । দীঘির

পাড় ধরে অনাবাসী ভারতীয়দের জন্য বিলাসবহুল বাংলো হবে। বালিসোনার একটা বড় সম্পদ দূর সাগরের দখনো-হাওয়ার কথা এখন মার্কিন প্রবাসী বাঙালিরাও জানে।

মেজদা বা লক্ষ্মী-সরস্বতী খুব একটা বাধা হবে বলে মনে হয় না, তারা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাবে। আধপাগলা প্রদীপকেও সে সামলে নেবে। সমস্যা পরীক্ষিৎকে নিয়ে। তাকে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না। 'তোমার ছেলেদের তুমি যদি একটু বলে দাও- বাদায় টাউনশিপের ব্যাপারে যেমন বলে দিয়েছিলে আর কী-'

কথা শেষ হবার আগেই ঝম্পটি সারা মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে জোড় হাতে তার অক্ষমতা জানাল।

এক বুধবার বিকেলের দিকে চিরন্তনী এল। রুদ্র ঝম্পটির কথা সে অনেক শুনেছে, কখনও চোখে দেখেনি। এত বেশি অসুস্থ দেখে ধীর স্বরে বলল, 'নমস্কার। আমি অবনীমোহন চৌধুরীর বড় মেয়ে লক্ষ্মীপ্রতিমার মেয়ে চিরন্তনী। এই শনিবার আমাদের মঙ্গলমঞ্চের সভা হবে। সেখানে আপনি কি আপনার অনুতাপ নিয়ে কোনও বিবৃতি দিতে চান? আপনি লিখে দিলে আমরা সেটা মঞ্চ থেকে পড়ে শোনাতে পারি।'

চৌধুরীবাড়ির কেউ তাকে দেখতে আসবে চোখে দেখেও তার বিশ্বাস হয় না। চিরন্তনী ঘরে ঢোকার মুহূর্ত থেকে ঝম্পটি সেই যে হাত জোড় করেছে, তারপর একবারও আর নামায়নি। তার চোখ দিয়ে এত জল ঝরছে যে এই প্রস্তাবে তার হ্যাঁ-না কিছুই বোঝা গেল না।

শনিবার অনুষ্ঠান শুরুর আগে পর্যন্ত মঞ্চ-সজ্জার কাজ চলল। সাদা কাপড়ের গায়ে বড় বড় করে লেখা- জগৎ সুন্দর হয় মানুষের গুণে, সমাজ সুখের হয় মানুষের দানে।

চিরন্তনী সকলকে নমস্কার জানিয়ে শুরু করল- মঙ্গলমঞ্চ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও আদর্শের কথা আপনারা জানেন। সেই প্রয়োজন আজ আরও বড় হয়ে উঠেছে। বর্ষার জল পেয়ে আগাছার মতো, লোভের জল পেয়ে দুর্নীতি, দুঃশাসন, স্বার্থসর্বস্বতা সমাজের সব স্তরে হু হু করে বেড়ে চলেছে। এর বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ না, বিকল্প মূল্যবোধও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সে জন্য শুধু মঙ্গলমঞ্চ নয়, সংগীত-মিছিল থেকেও আমাদের কর্মীদল গড়তে হবে। তারা প্রত্যেকে বালিসোনার ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষের সুখ-দুঃখ শুনে দেখে বিচার করে তাদের মূল সমস্যার শ্রেণী বিন্যাস করবে।

যারা গান শোনার আশায় সভায় এসেছিল, তারা চিরন্তনীর বক্তৃতা শেষ হতেই উঠে পড়তে লাগল। তখনই সে পরীক্ষিৎকে হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, 'তুমি বলো মামা, সবাই তোমার কথা শুনতে চায়।'

পরীক্ষিৎ নিস্পৃহভাবে বলে, 'আমি কী বলব? এবার নতুনরা কথা বলবে। চিরন্তনী কথা বলবে। মাটি ও আকাশ যথাসাধ্য মুক্ত রাখা কীভাবে সম্ভব আমি ভেবে পাই না। মানুষের দুঃখ কষ্ট কমাতে না পারলে সে সবই বৃথা।' এ-ব্যাপারে প্রত্যেকের ভূমিকা

সম্পর্কে পরীক্ষিতের বিশদ আলোচনার মাঝখানে ‘বল হরি, হরি বোল’ শুনে কেউ কেউ কৌতূহলে এগিয়ে গিয়ে দেখে একজন অস্থিচর্মসার বৃদ্ধের শবদেহ-কাঁধে জনা কুড়ি-পঁচিশ ছেলে শ্মশানে চলেছে। বল হরি হরি বোলের পাশাপাশি ‘কমরেড রুদ্র ঝম্পটি অমর রহে’ শ্লোগানও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে।

মঞ্চের শ্রোতাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, ‘অ্যাদ্দিন পুলিশের খাতায় ফেরার ছিল, এবার জীবনের খাতায় ফেরার হয়ে গেল।’

শবযাত্রীদের কোলাহলে পরীক্ষিৎ কথা থামিয়ে দিয়েছিল, বহু কণ্ঠে ‘আপনি বলুন, আপনি বলুন’ শুনে সে দ্বিধা নিয়েই আবার তার বক্তৃতা শুরু করল। চোখে কালো চশমা থাকায় সে শ্রোতাদের মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না।

‘আমার ঠাকুর্দা বৃথাই চেয়েছিলেন বালিসোনার মানুষ তাঁর সমাধি মাড়িয়ে আমাদের রাসমাঠে আসবে। আমার বাবা বৃথাই চেয়েছিলেন লুপ্ত নদী খুঁড়ে বালি থেকে সোনা বের করে বালিসোনাকে দেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ গ্রাম করে তুলবেন। আমার রাঙাজেঠিমা গান দিয়ে, মান দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে মানুষকে একত্র করার লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছেন। আমার রাঙাজেঠু অবনীমোহন মানুষের আরোগ্যের জন্য তপস্যা করে গেছেন। আসল কথা, মানুষকে সারাজীবন লড়াই করে যেতে হবে তার চারপাশের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে। প্রত্যেকের জীবনে জয়ী হবার ওই একটাই পথ। কে কোন পথে এগোবেন সেটা তাঁকেই বুঝতে হবে। জানি না, হয়তো মানুষের পায়ে পায়ে তৈরি হওয়া পথই আসল পথ। হয়তো এই পথেই এখন আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। মানুষের ওপর সবরকম অন্যায় অবিচার বঞ্চনা লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে মানুষের মনেই ধিক্কার জাগাতে হবে। অন্যায়কারীকে দেখে আকাশ-বাতাসও যেন ছি ছি করে ওঠে।’

সুষমা বিদ্যালয়ের উঁচু ক্লাসের একদল ছাত্রী স্কুল ফেরত বাসস্টপে দাঁড়িয়ে বাসের অপেক্ষা করতে করতে শবযাত্রীদের ‘বল হরি হরি বোল’ শুনে যে যার কপালে হাত ঠেকাল, কেউ কেউ মুখ ফিরিয়ে রাখল, দুজন একেবারে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

শ্মশানযাত্রীরা হরিধ্বনি দিতে দিতেই দেখল, উল্টো দিক থেকে একটা ভ্যানরিকশায় হাতে হাতকড়া দিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে নিদ্দাকে নিয়ে দুজন বন্দুকধারী পুলিশ আসছে। ভ্যানের মাঝখানে চটে মোড়া একটা মৃতদেহ বা ওইরকম কিছু। ‘ও বাবা, তোরে কোথায় নিয়ে চলল রে, ও বাবা, আমায় কার হাতে দিয়ে গেলি রে!’ বলতে বলতে মাঝবয়েসী একটা মেয়েছেলেকেও আলুথালু বেশে ভ্যানের পিছন পিছন দৌড়োতে দেখা গেল।

ভোররাতে সাতশিমুলতলার জঙ্গলে পুলিশ চটের লম্বাটে বস্তা খুলে দেখেছে ভেতরে একটা আস্ত নরকংকাল, মৃতদেহ সাজিয়ে পাচারের চেষ্টা করছিল। সঙ্গে আরও দুজন লোক ছিল, তারা কঙ্কাল কেনা-বেচার দালাল। তারা নিদ্দার চোখ এড়িয়ে দুজন পুলিশের হাতে টাকা গুঁজে দিতে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নিদ্দার কাজ খুন করা দেহের

গতিবিধি আন্দাজ করা, বালিসোনায় খুন-খারাপির কমতি নেই, খুন করে গোপনে কে কোথায় দেহ পুঁতে দেয় তার খোঁজ পাওয়াটাই আসল । তারপর সুযোগ মতো কবর খুঁড়ে কংকাল বের করে দালালদের হাতে তুলে দেওয়া । দালালারা আগাম বার্তা পেয়ে কংকাল বের করবার জায়গায় চলে আসে । কংকাল খোঁড়ায় নিদ্দার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা, সাদা চুল-দাড়ি নিয়ে টান-টান শরীর কোমর থেকে ঝুঁকিয়ে সে এখনও একইরকম নৈপুণ্যের সঙ্গে মাটি থেকে কংকাল বের করে আনতে পারে । সারা জীবন অনেকরকম ব্যবসাই সে করেছে, কোনওটার আয়েই তার হা-মুখ সংসার টানতে না পেরে বুড়োবয়সে কংকাল খোঁড়ার ব্যবসা ধরেছে । তার বউয়ের দুচোখে পুরু ছানি, মাথাটা সবসময় কেষ্টনগরের পুতুলের মতো এপাশ-ওপাশ দোলে । এদিকে তিন ছেলের দুজন পোলিওয় পঙ্গু, একটা নিষ্কর্মা, পাঁচ মেয়েকে কে যে কখন কোত্থেকে এসে কালীঘাটে বিয়ে করবে বা দিল্লিতে চাকরি দেবে বলে নিয়ে চলে গেছে নিদ্দা জানে না । শুধু তার বড় মেয়ে গত পৌষসংক্রান্তির দিনে তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের কাছে ফিরে এসেছে । মেয়েটা বরাবরই বোকা, 'পোষ সংকান্তি' না কাটিয়ে কেউ কি তার ঠাঁই ছেড়ে বেরয়? মেয়েটাকে কাঁদতে কাঁদতে দূর থেকে ছুটে আসতে দেখে নিদ্দা হাতকড়া পড়া দুহাত তুলে চোখের জল মোছে ।

ঝম্পটিবাবুর শবযাত্রীরা তাকে দেখতে দেখতে চলে গেল, কেউ একবারও থামল না ।

কনস্টেবল দুজন ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কী একটা পরামর্শ করে ভ্যান থামাল, নিদ্দাকে বলল, 'তোর মেয়েটা তোর পিছু ছাড়বে না, ছুটতে ছুটতেই বেদমে মরে যাবে । ওকে তুলে নে ।'

ভ্যানে উঠে বিলাপের চেয়ে তার কান্নাই বেড়ে গেল ।

নিদ্দা ধমক দিয়ে বলল, 'এবার ক্ষান্তি দে যামিনী!'

কান্নার মধ্যেই একবার এ-সেপাইয়ের, একবার ও-সেপাইয়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ে গলা চিরে যামিনী কাঁকুতি-মিনতি করে, 'আমার বাবারে ছেড়ে দেন গো ছায়েব । বাবারে আমার ছেড়ে দেন ।'

'থানায় চ, দেখি কী করা যায় ।' বলে এক সেপাই আরেক সেপাইয়ের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকায় ।

থানায় ঢুকে 'জেবনের পিদিম ঝ্যানো নিবু-নিবু করছে, মা রে ।' বলতে বলতে নিদ্দা মেঝেতে বসে পড়ল ।

দুজন কনস্টেবলের একজন যামিনীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'বড়বাবু এলে তার সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে দেখি তোর বাবাকে তোর সঙ্গেই ফেরত পাঠানো যায় কিনা । ততক্ষণ তুই গাছের ছায়ায় গিয়ে বোস ।'

দ্বিতীয় কনস্টেবলকে কিছু বলতে হল না, সে যামিনীকে নিয়ে পুলিশ-ব্যারাকের ছাদে যেখানে কদমগাছের ঘন ডালপালা ঝুঁকে আছে, সেখানটায় গিয়ে বলল, 'বড়বাবু না আসা অব্দি এখানে বসে থাক । এলে তোকে খবর পাঠাব, তখন বাবাকে নিয়ে ঘরে ফিরবি ।'

একটু পরে মাটির ভাঁড়ে চা আর একটা আস্ত পাউরুটি দিয়ে গেল একজন । যামিনী অনেকটা ভরসা পেয়ে চা-রুটি খেয়ে কমদগাছের ছায়ায় হঠাৎই ঢুলে পড়ে গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল ।

ভোরবেলা চোখে রোদ লেগে ঘুম ভেঙে গিয়ে সে দেখল গায়ে তার শাড়ি নেই, বেলাউজ পাশে পড়ে আছে, বুক ক্ষতবিক্ষত । উঠে বসতে গিয়ে তার সারা শরীর ব্যথায় টাঁটিয়ে উঠল, শরীরের তলায় চাপ চাপ রক্ত । এতক্ষণে যামিনী শরীরের যন্ত্রণা ভুলে চিলচিৎকারে কেঁদে উঠল ।

চারজন সেপাই ছাদে উঠে এল । তাদের একজন হুংকার দিয়ে বলল, 'চোপ! একদম চেঁচাবি না!' আরেকজন হাঁটু গেড়ে বসে বলল, 'খবরদার, কাউকে কিছু বলবি না । বললে খুন করে ফেলব । যাকে বলবি তার মাথাও গুঁড়িয়ে দেব!'

যামিনী তার বাবার কথা জিজ্ঞেস করতে চাইল, ঠোঁট নড়লেও মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরল না ।

একজন নরম মনের সেপাই তার ভয়ার্ত চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'তোর বাপ আদালতে চালান গেছে, সেখানকার কাজ মিটিয়ে আজ নিশ্চয়ই ঘরে ফিরবে । তুইও ঘরে যা । রিকশা ভাড়াটা রাখ ।' বলে দুটাকার একটা নোট তার গায়ে ফেলে দিল ।

দুপুরে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিদ্দা মাথা ঘুরে পড়ে গেল । সন্ন্যাস রোগে তার মৃত্যুর খবর বাইরে চাউর হওয়ার পর, স্বভাবকবির দেশ বালিসোনার কেউ একজন ছড়া বানাল- 'মুখোমুখি যদি হয় দুই শবদেহ/দুইয়ে মিলে সাথী চায় আরও এক দেহ ।' তা থেকেই পরে বালিসোনাবাসীদের মুখে মুখে নতুন প্রবাদের জন্ম হবে: মুখোমুখি শবদেহ, সাথী হবে আর কেহ ।



৩৮

বাজ পড়বার আগে ছুটন্ত বিদ্যুৎসর্পের মতো অধিকাংশ ফ্ল্যাটের দেওয়ালে ফাটল ধরেছে দেখে সাউথ উইন্ডের বাসিন্দারা বিরক্ত । ওপরের তলাগুলিতে বেশি ফাটল । ঝড়-বৃষ্টিতে তো কথাই নেই, শুকনো দিনেও যখন ঝম ঝম শব্দে রেলগাড়ি যায় তখন বিল্ডিংয়ের বড় বড় ফাটল কাঁপে । বালিসোনায় ডেভেলপার্স সংস্থার স্থানীয় অফিসে অভিযোগ জানালে প্রতিবারই এক মহিলা তাদের লিখিত অভিযোগ পেনাঙের হেড অফিসে ফ্যাক্স করে দেয় । কোনও উত্তর আসে না, কেউ দেখতেও আসে না, ফাটল ময়ালের হায়ের মতো দিনে দিনে বাড়তে থাকে ।

দেওয়ালির রাতে আকাশ জ্বালিয়ে বাজি পুড়িয়ে, বাতাস কাঁপিয়ে পটকা ফাটিয়ে, তৃপ্তিসহকারে পান-ভোজন শেষ করে অনেক রাতে সবাই ঘুমে অচেতন, সেই ফাঁকে ওপরের দুটি তলা তিপান্নটি ঝুলবারান্দা সমেত হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ।

পরদিন ভোর থেকে সারা দিন ধরে নিহত ও আহতদের উদ্ধারকাজ চালিয়েও হতাহতের সঠিক সংখ্যা বোঝা গেল না । সারি-সারি শবদেহ ঘিরে ভিড়, ভিড়ের কাছেই দ্রুত নতুন সারি সাজানো হচ্ছে । পুলিশবাহিনী দিশেহারা । অ্যাম্বুলেন্সে গাদাগাদি করে হাসপাতালে পাঠানো মারাত্মক জখম নারী পুরুষ শিশুর সংখ্যা লিখতে ব্যস্ত পুলিশ জানাল, রাজধানী শহর থেকে বড় উদ্ধারকারী দল আসছে । তারা এসে ভগ্নস্তূপের নীচে সন্ধান না করা পর্যন্ত পুলিশ ভীত সন্ত্রস্ত ক্রুদ্ধ আবাসিকদের ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করল ।

বালিসোনার আদিবাসী বৃদ্ধরা যে যার ভিটেয় বসে বলাবলি করতে লাগল, নদী আকাশ চায়, বাতাস চায়, দুই তীরে তার বৃক্ষশিকড়বন্ধন চাই, বুকের ওপর ঘরবাড়ির এত জঞ্জালভার সে সইবে কেন!

ভোরবেলা পরীক্ষিতের ঘুম ভাঙিয়ে নীলাঞ্জনা উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ গো, আমাদের লালকমল-নীলকমল ফিরে আসেনি তো?’

প্রশ্নটা বুঝতে পরীক্ষিতের সময় লাগল । ঘুম ভাঙা চোখে কিছুক্ষণ নীলাঞ্জনার দিকে চেয়ে থেকে বলল, ‘ফিরেছে? কই, জানি না তো! আমি তো ওদের ফেরার আশা নিয়েই

বেঁচে আছি। হঠাৎ তোমার একথা মনে হল কেন?'

'কাল রাতে সাউথ উইন্ড ভেঙে পড়েছে, বহু লোক মারা গেছে। এর পিছনে লাল-নীলের হাত নেই তো?'

পরীক্ষিৎ ভাবে, মাটি আর আকাশ ঢাকা পড়লে বাবার কষ্ট হয়। নদীটা খুঁড়ে বের করে বাঁচাতে চেয়েছিল, পারেনি। সেই নদীর বুকের ওপর আস্ত একটা বিদেশি শহর বসিয়ে দেওয়া বাবা সহ্য করবে কী করে! নীলাঞ্জনা ভীত মুখে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে পরীক্ষিৎ তার প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'লালু-নীলুর এখনও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সাউথ উইন্ড ধ্বংসে বাবার হাত আছে মনে হয়। বাবার দীর্ঘশ্বাসে ঝড়ও উঠতে পারে।'

'কী! কী বলছ তুমি? তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?'

'আমার বাবা তার স্বপ্নের জন্য অনন্তকাল যুদ্ধ চালাতে পারে।'

'তুমিও কি মিতামায়ের মতো হয়ে যাচ্ছ? বাবা আজ কত বছর নেই, তুমি ভুলে গেছ?'

'বাবার সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। মাঝে মাঝে কথাও হয়।'

'পরীক্ষিৎ, তুমি প্রকৃতিস্থ হও। তোমাকেও কি শেষে সারা দিন শুধু তিকানের কীর্তন শোনাতে হবে?'

'তিকানকে কি তুমি কিছু বলেছিলে?'

'আমাকে এত ছোট ভাবলে? আমিই চলে যাবার কথা ভেবেছিলাম।'

পরীক্ষিৎ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার শুয়ে পড়ল।

'এখন উঠবে না? লাল-নীলের খবর নিয়ে দেখলে হত না!' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলল, 'সন্তানভাগ্য সকলের ভালো হয় না, জানো?'

দু-ভাই নিরুদ্দেশ, অরণ্য কতদিন বাড়ি থেকে দূরে, 'শুশ্রূষা'য় তার নেশা ছাড়ানোর চিকিৎসা চলছে। অরণ্যর কথা ভেবে নীলাঞ্জনা এবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সন্তানভাগ্যের কথাটা আরও একবার বলল।

পরীক্ষিৎ রাতের বেশিটাই সরোজিনীর লাইব্রেরিতে বসে লেখে। দোতলায় প্রদীপের ঘরেও সারা রাত আলো জ্বলে। সে মাঝে মাঝে পরীক্ষিতের কাছে অদ্ভুত অদ্ভুত বই চাইতে আসে। না পেলে বিরক্ত হয়। তার সমস্যার কথাও পরীক্ষিৎকে বলে। বালিসোনার ইতিহাস লিখতে লিখতে কখন সে রাজধানীর ইতিহাস লেখায় ঢুকে যায়, কখন আবার তার জীবনকাহিনীতে মন্থরোর মা এসে পড়ে, সেই জট সে আর ছাড়াতে পারে না। সে বিড় বিড় করে বলতে থাকে, 'বিশ্বজুড়ে সবুজ ধংসে মানুষের প্রাণবায়ুর উৎস শুকিয়ে যাচ্ছে, কত কীটপতঙ্গ পশুপাখি শেষ হয়ে যাচ্ছে, ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। জেগে গিয়ে লিখতে লিখতে আবার দুঃস্বপ্নে ডুবে যাই। মাইনাস গাছপালা প্লাস দুঃস্বপ্ন- ইকোয়াল টু দ্রুতবর্ধমান দুঃস্বপ্ন।'

একদিন হঠাৎ পরীক্ষিতের কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, 'আনন্দমোহন তোকে আর আমাকে খুন করতে পারে । রাসমাঠে ও একটা বিরাট শপিংমল বানাতে চায় । সঙ্গে নব্য ধনীদের জন্য বড় বড় বাংলো । আমি বলেছি আমি বেঁচে থাকতে একাজ করতে দেব না । তাই আমাকে খুনের ফন্দি আঁটছে । তোকেও ও খুন করবে । খুব সাবধানে থাকিস, বাবা । ওকে ছুরি-হাতে দেখলেও ভয় পাসনি, ভয় পেলে শরীরের এনার্জি চলে যায় । কথা বন্ধ হয়ে যায় ।'

একদিন ঘোর বর্ষারাতে সে পরীক্ষিৎকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল । বিরাট ঘরটার অর্ধেক জুড়ে বুনো গাছের জঙ্গল, যেখানে যা পায়, শেকড়-সুদ্ধু তুলে এনে টবে পোঁতে । বড় বড় জানলার চওড়া পটিতে তিল, তুলসি, নয়নতারার ঝাড় । ছোট মাপের রাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়াও বাইরের দিকে মাথা হেলিয়ে রেখেছে । পশ্চিমের জানলায় লজ্জাবতী লতার সারি পাতা বুজিয়ে ঘুমিয়ে আছে । পরীক্ষিৎকে ঝোঁপঝাড় বাঁচিয়ে ঘরের অন্য প্রান্তে নিয়ে গিয়ে ঠোঁটে আঙুল রেখে প্রদীপ বিছানার দিকে ইঙ্গিত করল । পাটভাঙা সাদা চাদরে লাল, কালো, হলদে, খয়েরি, সবুজ, বেগুনি রঙের বড় বড় ছোপ । একেকটা ছোপের নীচে একেকটা শব্দ লেখা । কোনওটার নীচে লেখা হিংসা, কোনওটার নীচে প্রতিহিংসা, কোথাও ক্ষুধা, কোথাও প্রেম, কোথাও দাবদাহ, কোথাও দখিনাবাতাস, কোথাও জ্ঞানতৃষ্ণা, কোথাও জ্ঞানদাহ, কোথাও উচ্চাশা, কোথাও ফ্যাশন । এইরকম আরও অনেক শব্দ রঙিন বিছানা জুড়ে লিখে রেখেছে ।

'নিউ জেনারেশনের মনের মানচিত্র তৈরি করছি আমি । তাদের মানসিকতার লসাগু গসাগু বের করা দরকার ।' কথাটা বলে তার মানচিত্রের ওপরেই সে শুয়ে পড়ে তখনই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ফোঁপাতে লাগল ।

পরীক্ষিৎ নিজের ঘরে যাবার পথে দেখল অত রাতেও ভণ্ডুলের সঙ্গে চারজন যুবক বাড়ির ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে আছে । দুজন মহিলাও আছেন, একজনকে অনেকেই আজকাল নামে চেনে । পরীক্ষিৎও খবরের কাগজে প্রকৃত গণতন্ত্রের পক্ষে তাঁর অনেকগুলো প্রবন্ধ পড়েছে ।

ছেলেরা পরিচিত কয়েকজন কবি লেখক শিল্পীর স্বাক্ষর করা একটা ছাপানো কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে পরীক্ষিৎকে বলল, 'আপনি তো স্যার ক্ষমতাসীন দলের অনেক অন্যায়ের বিরুদ্ধে লিখেছেন, এবার শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে আপনার সমর্থন চাইতে এসেছি আমরা । কাগজটায় শুধু আপনার একটা সই দিলেই হবে ।'

দেশবাসীর উদ্দেশে ছাপানো আবেদন পড়ে পরীক্ষিৎ বলল, 'দুর্জন দুরাচারী ক্ষমতাসীন যে-কোনও দলের বিরুদ্ধে আমাকে পাবে । কারও পক্ষে আমাকে পাওয়া যাবে না । পক্ষসমর্থনের যুগ এটা নয় ।'

প্রবন্ধলেখক তরুণী এগিয়ে এসে বলল, ‘সত্যকে সমর্থনের যুগ নয় বললেন, তবে কি এটা মিথ্যাচার সমর্থনের যুগ? আপনার স্বাধীন মতটা শুনতে পেলে ভালো হয় ।’

‘সত্যকে সমর্থন করা না-করার কথা কি বলেছি? কথাটা ছিল পক্ষসমর্থন নিয়ে ।’

‘বেশ । স্যার আপনার মতে যুগটা তাহলে নিরপেক্ষতার?’

একটি ছেলের এই প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষিৎ নিস্পৃহ স্বরে বলল, ‘দেশকে যারা ভালোবাসে, তাদের এখন যুগশুদ্ধির কথা ভাবতে হবে ।’

পরদিন বিকেলে পরীক্ষিতের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বেখেয়ালে মন্থরোর মায়ের কবরের কাছে পৌঁছে প্রদীপ দাঁড়িয়ে পড়ল । সেও মন্থরোর মাকে মাটি দিয়েছিল, অথচ কবরটাই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না । হঠাৎ পরীক্ষিতের দিকে চেয়ে বলল, ‘মন্থরোর মা’র মুখের সঙ্গে আমার মুখের কোনও মিল দেখতে পাও তুমি?’ পরীক্ষিৎকে ‘তুই’ বলে, মনে পড়ল না ।

‘আমি তো মন্থরোর মাকে দেখিনি ।’

‘আমার চিবুক কি মন্থরোর চিবুকের মতো মনে হয় তোমার?’

‘মন্থরোর কথা আমি শুধু শুনেছি, দেখিনি কখনও ।’

দুটো ঋতু কেটে যাবার পর থেকেই পরীক্ষিতের কাঁধ না ধরে প্রদীপ হাঁটতে পারে না । পরীক্ষিৎ তাকে ধরে ধরে বালিসোনার অবশিষ্ট গাছপালা ঝোপঝাড়ের কাছে নিয়ে যায় ।

পরের বছর প্রদীপ বালিসোনায় বৃক্ষসুমারি শুরু করল । আগামী কয়েক বছরে কোথায় কত গাছ না লাগালেই নয়, তার একটা ধারণা পাবার জন্য বৃক্ষসুমারি করা দরকার । পরীক্ষিৎকেও একাজে নিয়মিত সাহায্য করতে হয় । পরীক্ষিতের নিজেরও আগ্রহ কম নয় । আবার কিছু গাছ লাগাবার একটা সম্ভাবনা তাকে আকর্ষণ করে ।

সাউথ উইন্ডের আকাশচুম্বী আবাসনকে পুরসভার পক্ষ থেকে ভেঙে ফেলার নোটিস দেওয়া হয়েছে । স্থানীয় অফিসের মহিলা সে নোটিস পেনাঙে হেড অফিসে ফ্যাক্স করে দিল । আদালতের নোটিসও ফ্যাক্স মারফৎ পেনাঙে পাঠানো হল ।

পুরসভার শাসানির চেয়েও বেশি প্রাণের ভয়ে আবাসিকরা প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করেও ফ্ল্যাট খালি করতে লাগল । এইসময় থেকে বালিসোনায় বাড়ি ভাড়া নেওয়ার ব্যাপক প্রবণতা দেখা গেল । সুযোগ বুঝে বেশিরভাগ বাড়িওলা চড়া ভাড়া হেঁকে বসল ।

সংস্থার দুজন ডিরেক্টর হেড অফিস থেকে বিমানে উড়ে এসে বাড়ি ভাঙতে রাজি না হলেও আদালতে হাজিরা দিয়ে অ্যাডভোকেটের মাধ্যমে জানাল, তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ । নকশায়, নির্মাণে, মালমশলায় কোথাও কোনও ত্রুটি নেই । বাড়ি ভেঙে পড়ার একমাত্র কারণ অধিকাংশ ফ্ল্যাট ওনার্স মেঝের সেরামিক টাইলস তুলে ফেলে পুরো ফ্ল্যাটেই মার্বেল বসিয়েছে । অত বেশি বাড়তি লোড নিতে না পারায় বিল্ডিং কোলাপ্স করে । নিহত বা আহতদের জন্য কোনওরকম ক্ষতিপূরণ দিতেও তাই তারা বাধ্য নয় ।

অভিযুক্তদের আইনজীবী ও সরকার পক্ষের আইনজীবীদের সওয়াল-জবাব শুনে বিচারক বিদেশি দুজন ডিরেক্টরকে চোদ্দ দিনের জেল হেপাজতের আদেশ দিলেন ।

আদালতের বাইরে বিক্ষুব্ধ জনতার নিশ্ছিদ্র ভিড় কেটে আসামীদের পুলিশের গাড়িতে তুলতে ঘর্মাক্ত পুলিশবাহিনীর একজনের কোমরের বেল্ট ছিঁড়ে গেল । টুপি হারা দুজনের কাদামাখা পদপিষ্ট টুপি দিনের শেষে কুড়িয়ে পেয়ে আদালত চত্বরেই এক পাগল গায়ক থানায় জমা দিয়েই পালিয়েছে ।

তেইশ বছর ধরে মামলা চলার পর আদালতের রায়ে পেনাঙের ডিরেক্টররা প্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস হয়ে গেল । বিচারক স্থানীয় কন্ট্রাকটরদের ছ'মাসের জেল ও সাতাত্তর হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছ'মাস কারাবাসের আদেশ দিলেন । উচ্চ আদালতেও এই রায় বহাল রইল । পুরসভার আলাদা একটা মামলায় বিদেশি সংস্থাকে বিপজ্জনক বিল্ডিং ভেঙে ফেলবার খরচ হিসেবে পুরসভাকে আট লক্ষ টাকা দেবার আদেশ দেওয়া হল ।



৩৯

রবিবারের গানের মিছিলে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় ক্রমেই বেড়ে চলল। কিশোর কণ্ঠের মায়াভরা উচ্চারণে 'গান দিয়ে প্রাণ বাঁচাব' ভালো করে শুনতে রাস্তার পাশের বাড়িগুলোর ছাদে বারান্দায় গৃহবাসীরা ছুটে আসে। মিছিলের সামনে-পিছনে পুলিশের গাড়ি এখন একবারের জন্যও আর বাদ পড়ে না।

চাকরি থেকে আগাম অবসর নেবার পরও পরীক্ষিৎকে তার সাপ্তাহিক কলাম 'বিষাদগাথা' লিখে যেতেই হয়। আজও তার কোনও কোনও অংশ গানের মিছিলে লাগে, তার অনেক কথাই দেওয়ালে দেওয়ালে দেখা যায়।

পরীক্ষিৎ মিতার কথাও লেখে। মিতা আজকাল তিকানের গাওয়া 'আমি যোগিনী হইয়ে যাব সেই দেশে' গুনগুন করে গায়। 'দে দে আমায় সাজায়ে দে গো' গাইতে গাইতে তার গলা বুজে আসে। তবু সারা দিন ওই একই পদ সে বার বার গায়। যখন গায় না তখন একমনে বসে কী ভাবে, পরীক্ষিৎ জিজ্ঞেস করার সাহস পায় না।

নিদ্দার বড় মেয়ে আগে যখন ভিক্ষে করতে আসত, একমুঠো চালের সঙ্গে একটা আলু বা পটল বা ঝিঙে চাইত, পেলেই তাড়াতাড়ি চলে যেত। পোয়াতি হবার পর এবার এই প্রথম এসে নাতবউরানিকে গান করতে দেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে গানের কথাগুলো মন দিয়ে শুনল। গান থামলে বলল, 'একমুঠো চাল আর একটু নুন দেবে মা? নুন দিয়েই ভাত কটা খেয়ে নেব।'

যামিনী সব বাড়িতেই আজকাল চাল আর নুন চায়। শুধু ভাত খেয়ে নুনটুকু জমিয়ে রাখে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর সবটুকু জমানো নুন সদ্যোজাত শিশুর মুখের হায়ের মধ্যে পুরে তার কচি গলা টিপে তার জীবনের প্রথম চিলচিৎকার চিরদিনের মতো থামিয়ে দিল।

দিন কয়েক আগে ভাইয়েরা ঘরের পিছনের আস্তাকুঁড় থেকে মাটি খুঁড়ে তিনটে বড় বড় মেটে আলু তুলেছিল, সেই গর্তে প্রাণহীন শিশুকে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে তার ওপর

পা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাবাতে লাগল । হঠাৎ একসময় হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে সে মাটির ওপর বসে মাটিমাখা দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদেই চলল ।

পরীক্ষিৎ গানের মিছিলে যাওয়া বন্ধ করায় কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে তার কাছে এসে দুয়েক ঘন্টা তাকে ঘিরে বসে থাকে । পরীক্ষিৎ মন দিয়ে প্রত্যেকের কথা শোনে । তাদের নিজেদের মধ্যের আলোচনায়ও কখনও কখনও কেউ কেউ তাকে দলে টানতে চায় ।

এরা সবাই কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, অধিকাংশই লক্ষ্মীদের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী । বেশ কিছুদিন একজন শিক্ষকের বদলি হিসেবে পরীক্ষিৎ লক্ষ্মীর অনুরোধে ক্লাস নিয়েছিল, এরা তার সেই সময়ের মুগ্ধ শ্রোতা । সুযোগ পেলেই গানের মিছিলে যায়, পরীক্ষিতের কাছে আসে ।

পরীক্ষিৎ তাদের অনেক বিষয়ে তার সংশয়াচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা ও কোনও কোনও বিষয়ে তার দ্বিধান্বিত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা বলে ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুগত হঠাৎ পরীক্ষিৎকে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার আপনি যামিনীর মর্মান্তিক পরিণামের কথা শুনেছেন?'

পরীক্ষিৎ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ও শোনার মূল্য কী? ঘৃণায় রাগে প্রতিবাদে আমি কি জ্বলে উঠতে পেরেছি?'

সুগতর সহপাঠী দেবালয় বলল, 'না স্যার, সেকথা না । চারজন পুলিশ রাতে তার কুঁড়ে ঘরে ঢুকে তার ছেলেমেয়েদের বাইরে অন্ধকারে বের করে দিয়ে তাকে আবার রেপ করে ।'

পরীক্ষিৎ শান্ত স্বরে বলল, 'তোমরা কী করলে?'

অনেকেই একসঙ্গে বলে ওঠে, 'শুনেই সকালে আমরা থানা ঘেরাও করেছি । এস পি এসে দোষীদের গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি দেবার পর আমরা ঘেরাও তুলেছি । চার পুলিশ নাকি আমাদের আসতে দেখে থানার পিছনের পথ দিয়ে পালিয়েছে । এখন, স্যার, চারজনের এগেনস্টেই পুলিশ কেস হচ্ছে ।'

তথাগত অস্বাভাবিক শান্ত স্বভাবের ছেলে, সকলের সব কথা একমনে শোনে, নিজে কিছু বলে না । প্রাচীন কাল থেকে ভারতভাগের সময় পর্যন্ত এদেশের পারিবারিক কাঠামো নিয়ে সে পি এইচ ডি-র থিসিস লিখছে, নানা প্রসঙ্গে পরীক্ষিতের কথা তাকে পথ দেখায়, অনেকক্ষণ থেকে পরীক্ষিতের চোখে চোখ রেখে কিছু বলার কথা ভাবছে দেখে পরীক্ষিৎ বলল, 'তথাগত, কিছু বলতে চাও?'

'পরে বলব, স্যার । আজ আমি উঠি ।' অন্যদের দিকে চেয়ে, 'তোমরা কথা বলো ।'

বরাবরের অভ্যেস মতো পরীক্ষিৎ তাকে বাইরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলে তথাগত নিচু স্বরে বলল, 'আমার মেজকা আপনার খুব বড় ফ্যান, স্যার । বিষাদগাথা

একবারের কিস্তিও ওর বাদ যায় না । আপনি তো জানেন, মেজকা পুলিশের বড় গোয়েন্দা অফিসার । নিজে এলে কারও চোখে পড়তে পারে বলে আমাকেই বলেছে আপনাকে জানাতে- পুলিশ আপনার চারপাশে জাল গুটিয়ে আনছে, যে-কোনও সময় আপনাকে অ্যারেস্ট করে এবার কোনও গোপন জায়গায় নিয়ে গিয়ে জেরা করবে । শাসকদল বিরোধীদল- কেউ কিন্তু আর আপনার পাশে নেই স্যার । আপনি কোনও পক্ষেরই কাজে লাগেননি । মেজকার পরামর্শ, আপনি আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা দরকার হলে মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য নিন । আফটার হল, দেশের মানুষ আপনার সঙ্গে আছে, হয়তো সরকার আপনার জন্য কিছু করে দেখাতে চাইবে ।'

তথাগত তার স্বভাববিরুদ্ধ একটানা দীর্ঘ কথা বলে দম নিল ।

ঘরে ফিরে এসে পরীক্ষিৎ ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে থেকে আগের কথার খেই ধরে বলল, 'সেই চারজন এস-আই কনস্টেবলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা তোমরা জানো?'

'না স্যার, ওরা এখনও পলাতক । পুলিশ তাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়েও কাউকে পায়নি । মজার কথা, দোষীরা কিন্তু এখনও একই অপরাধ করে বেড়াচ্ছে । দেবালয় সবটা জানে না, যামিনীকে এবার শুনেছি ওর ঘরে ঢুকে ধর্ষণের পর খুন করে ফেলতে চেয়েছিল, ওর ছেলেমেয়েদের প্রাণপণ চিৎকারে ভয় পেয়ে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গেছে ।'

আরেকজন যোগ করল, 'যামিনীর ভাই তিনটেকে তো আগেই ছিঁচকে চুরির অপরাধে জেলে পাঠিয়েছে ।'

পরীক্ষিৎ প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলে উঠল, 'সক্রেটিস কেন হেমলক পান করেছিলেন তোমরা জানো?'

যারা জানে এবং যারা জানে না, দুপক্ষই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ।

কয়েকদিনের মধ্যে বালিসোনা আদালতের সামনে ভিড় উপচে পড়ল । একদল বিক্ষুব্ধ মানুষের গালি-গালাজ ভেদ করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অ্যামব্যাসাডর গাড়িতে একজন প্রাক্তন সাংসদকে আদালতে হাজির করা হল । তার বাড়িতে তল্লাসি চালিয়ে সোনা-হিরের প্রচুর গয়নাগাটি ছাড়াও নগদ বিয়াল্লিশ কোটি টাকা পাওয়া গেছে । পুলিশবেষ্টিত সাংসদের পিছু-পিছু চার পলাতক পুলিশ সেদিনই তাদের উকিলের সঙ্গে আদালতে আত্মসমর্পণ করল ।

দিনের শেষে প্রাক্তন সাংসদ ও চার পুলিশ, কারও-ই জামিন হল না ।

যুবাবয়সি এক পাগল বারো মাস তিরিশ দিন আদালত চত্বরে ঘুরে ঘুরে দরদী গলায় একটার পর একটা গান গায় । সবই রবীন্দ্রসংগীত বা নজরুলগীতি । মাঝে মাঝে হঠাৎই পরিচিত গানের মধ্যে নিজের বানানো কোনও লাইন গেয়ে ওঠে, শুধু তখনই বোঝা যায় তার চোখের সামনের সব কিছুর ওপর তার তীক্ষ্ণ নজর । একবার এক কুখ্যাত অপরাধী লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় সমর্থকদের বিরাট বিজয় মিছিল বেরিয়েছিল । সেদিন সারা সন্ধ্যা পাগলের গভীর গলায় 'ওই মহাদানব আসে' শুনে পথচলতি অনেকেই দাঁড়িয়ে

পড়েছিল । আজও শেষবেলায় 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে/তখনও রাঘব-বোয়াল চুনোপুটি এক ঘাটে গো এক ঘাটে' গাইতে গাইতে সে বাউলদের মতো কোমর ভেঙে নাচতে লাগল ।

পরের সপ্তাহে অপরাধী শনাক্তকরণে যামিনীকে পুলিশের গাড়িতে জেলের ভেতরের বড় চত্বরে এনে চারজন আসামির সঙ্গে সাধারণ পোশাকের ষোলজন লোকের সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল । অনেকবার বোঝাবার পর, নানা ভাবে অভয় দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত যামিনীকে একজন অফিসার বললেন, 'দেখুন তো মা, যারা আপনার ওপর থানার ছাদে, আপনার বাড়িতে অত্যাচার করেছিল তারা কি কেউ এদের মধ্যে আছে?'

তিনজনকে চিনতে পেরে যামিনী থর থর করে কাঁপতে লাগল । নিমেষে তার পায়ের কাছে মাটি ভিজে কাদা হয়ে গেল, পরনের ছেঁড়া-ফাটা ময়লা কাপড়ে জলধারা আটকানোর কোনও চেষ্টাই সে করতে পারল না । আঙুল দিয়ে তিনজনকে দেখিয়ে সে কাঁপতে কাঁপতেই মাটিতে পড়ে গেল । মৃৎশয্যা ছেড়ে সে আর ওঠেনি ।

চার বছর সাত মাস মামলা চলার পর তিনজনের দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল । একজন খালাস হয়ে গেল ।

পরীক্ষিতের প্রাক্তন ছাত্রদল এসে তাকে জানাল, রায় ঘোষণার এগারো দিনের মাথায় আইনের ফাঁক গলে খালাস পাওয়া চতুর্থ আসামী রাতের টহলদারি ভ্যানে বসে মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় রাস্তায় পরস্পরের পশ্চাৎ জুড়ে থাকা বিপরীতমুখী এক কুকুর-কুকুরীকে দেখে আদর করতে গিয়েছিল, কুকুরের কামড় খেয়ে লাফিয়ে ভ্যানে উঠতে গিয়ে পা কেটে কয়েক দিনের মধ্যেই ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মারা যায় ।

ঘটনার বিবরণ শেষ হলে তাদের একজন প্রশ্ন করল, 'এটা কি স্যার যামিনীর অভিশাপ, নাকি পুলিশের নিয়তি?' একজন ছাত্রী যোগ করল, 'নাকি ধর্মের কলে বাতাস লাগা?' আরেকটি ছেলে বলল, 'প্রায় একই সময় অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের অপমৃত্যু নিছক একটা কাকতালীয় ঘটনাও তো হতে পারে?'

'তুমি যেভাবে দেখবে, সেটাই তোমার জীবনে চলার পথ হয়ে উঠবে । আমরা যত কিছুর মধ্য দিয়ে যাই সেগুলো যার প্রাণে যত গভীরে বাজে, তার জীবনের পথও তাকে ততই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায় ।' একমুহূর্ত থেমে, আবার, 'নিয়ে যায় কি? কী জানি, হয়তো যায়, হয়তো যায় না ।' বলে পরীক্ষিৎ লেখার কাগজে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে নীরব হয়ে গেল । আজ আর কিছু শোনা যাবে না বুঝে তার প্রাক্তন ছাত্রদল উঠে যায় ।



৪০

মাঘমাসের শেষে বৃষ্টি হতে দেখে চাষিদের মনে আশা, এবার জমিতে ভালো ফলন হবে। একজন বুড়ো কৃষক নাতির বয়েসী একজনের হাতে নিজের কলকে ধরিয়ে দিয়ে নিজের মনেই বলে উঠল, 'যদি বর্ষে মাঘের শেষ/ধন্য রাজার পুণ্য দেশ। খনার বচন কি মিথ্যে হয় রে!'

রবিশস্য উঠে যাবার পর ফাল্গুনের গোড়ায় বেশির ভাগ জমিতে তিল ছড়ানো হল। বালিসোনার বড় দুটি রপ্তানিসংস্থার দালালরা পৌষমাসে চাষিদের ভালোমতো দাদন দিয়ে গেছে। কে কত দাদন ধরাতে পারে তা নিয়ে রেষারেষির শেষ ছিল না। আরবদেশে সাদা তিলের বিরাট বাজার। দীঘির অদূরে সরস্বতীর হাঁসের মতো সাদা নতুন তেতলা বাড়ির আরবি বাসিন্দারা জনে জনে তিলের চাহিদার কথা বলে বেড়াচ্ছে। আরবিদের প্রিয় পদ হোমস-এ তো বেগুন বাটার চেয়ে তিলই বেশি। তাদের দেশে এরকম অনেক পদ ও মিষ্টিতে তিলের আধিক্য।

আরবদেশে মিস্ত্রি-মজুরের চাকরির আশায় নীচের তলার মাদ্রাসায় যারা আরবি শিখতে আসে, তাদেরও সে-দেশের তিলপ্রধান পদ ও মিষ্টির মহিমার কথা বলা হয়।

আগে আরবদেশীয় মাত্র দুয়েকজনকেই বালিসোনায় দেখা যেত, আজকাল তাদের আনাগোনা কেন বাড়ছে তা নিয়ে বর্ষীয়ানদের মনে নানা সংশয়। এভাবে বাড়ি করে তারা এখানে থাকছে কী করে সেটাও তাদের কাছে এক রহস্য। এ রহস্য ভেদ করার দায়িত্ব যাদের সেই পুলিশের বক্তব্য, এরা তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে আসে, যে বাড়িতে তারা থাকছে সেটাও তাদের আত্মীয়দেরই।

ব্যাখ্যা শুনে বিরক্ত এক অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক অফিসার বললেন, 'সব জেনেও দে হ্যাভ ক্লোজড দেয়ার আইজ।'

সোমনাথ মণ্ডল বন্দরের শুল্ক বিভাগে সুনামের সঙ্গে চাকরি করে সদ্য অবসর নিয়েছেন, আরবিদের কথায় বললেন, 'আপনি শুধু আরবদেশীদেরই দেখছেন, উর্দুভাষীদের সংখ্যাও বালিসোনায় কীরকম বেড়ে চলেছে লক্ষ করেননি?'

কর্মজীবনে ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ দপ্তরে ছিলেন, সেই অভিজ্ঞতার জের টেনে নিকুঞ্জবাবু বললেন, 'আরবিভাষী হোক, আর উর্দুভাষী হোক, এই যে সবাইকে নীলচাষের মতো তিলচাষে লাগিয়ে দিল এর ফল কী ভয়ানক হবে ভাবতে পারেন? তিলে-তিলে এরা বালিসোনার সর্বনাশ করে ছাড়বে।'

আসাম ত্রিপুরা আন্দামানে নিজের বেত সংগ্রহের ব্যবসা মার খাওয়ার পর থেকে বিষাদগ্রস্ত সুদেব হাজরা কানের নীচে ঘাড় ও গালের সন্ধিস্থল থেকে ঝুলে থাকা মৌচাকের মতো বহুদিনের পুরনো টিউমার অভ্যেস মতো বাঁহাতে ধরে রেখে নিস্পৃহ স্বরে বলল, 'সামনের মাসে মুসলমানদের স্তমা সমাবেশ। স্তমা, না ইস্তমা, না ইসমা জানি না, আমার মুরগি খামারের ছেলেরা স্তমা বলেই ছুটি চেয়ে রেখেছে।'

'মোছলমানদের এই বারো মাসে তের পার্বণের ঠেলায় আমাদের তো ত্রাহি-আল্লা অবস্থা! রমজান, ঈদ, মহরম তো ফি-বছর দেখছি-'

নিকুঞ্জবাবুর কথার মাঝখানে মণ্ডল বলে উঠল, 'সবেবরাত? সবেবরাত জানেন না?'

'স্তমা ওগুলোর মতো বার্ষিক পরব না, এ হল গিয়ে মুসলমানদের মহাসমাবেশ। চার বছর পর পর একেকবার একেক জায়গায় হয়।'

স্তমা উপলক্ষে বালিসোনায় রেল, বাস, লরি, দেশি-বিদেশি গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই দেশ-বিদেশের ইসলামধর্মাবলম্বীদের ভিড়ে এখানকার বাতাসের গন্ধই বদলে গেল। রাসমাঠে আগাছায় ঢাকা অসমাপ্ত শপিং মলের এক ফালি জায়গা বাদে সব জায়গার ঘাস ঢেকে খালি বাস লরি গাড়ি, ঘোড়া খুলে নেওয়া শকটের ভিড়। অধিকাংশ গাড়ি ধর্মসমাবেশ যতদিন চলবে ততদিন এখানেই থাকবে।

দুবাই, কাতার, সৌদি আরব, মিশর, তুর্কি, সিরিয়া, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনেই থেকে অনেকে স্তমায় যোগ দিতে বালিসোনায় এসেছে। আরব দেশের আপাদমস্তক ধপধপে সাদা পোশাকের দীর্ঘদেহী পুরুষদের দেখে বালিসোনার মানুষ অবাক চোখে চেয়ে থাকে। প্রথম ক'দিন একেকরকম মুখের আদল দেখে একেক দেশের মানুষকে আলাদা করার প্রতিযোগিতা চলল। সব দেশের মৌলবীরাই সুদর্শন। কালো বা সাদা শ্মশ্রু শোভিত, সাদা বা কালো আলখাল্লায় ঢাকা তাদের সম্ভ্রান্ত চেহারা নিয়ে বালিসোনায় পাড়ায় পাড়ায় নিন্দা-প্রশংসার ঢেউ বয়ে গেল।

রাসমাঠ থেকে আধমাইল এগিয়ে ফসল তুলে নেওয়া বিরাট চাষের খেতে অনুষ্ঠানের আকাশচুম্বী প্যান্ডেল, বহু দূর থেকে দেখা যায়। বাসরাস্তার ধারে বিদেশিদের জন্য অনেকগুলো ডিপ টিউবয়েল বসানো হয়েছে। বড়রাস্তা থেকে প্যান্ডেল পর্যন্ত তিরিশ ফুট চওড়া রাস্তা করা হয়েছে, আগাগোড়া লাল নীল সবুজ কাপড়ের আচ্ছাদনে ঘেরা। রাস্তার দুধারে বড় বড় ইলেক্টিক বাতির নীচে নানা পসরার সারি সারি দোকান। ছুরি কাঁচি রঙিন কাচের বাসন, তুর্কিদের সেরামিকের গাঢ় নীল রঙের বৃত্তাকার সৌভাগ্য-চাকতি, আতর,

সুর্মা, নানারকম মেঠাইয়ের দোকানে দোকানে মানুষের ভিড় । অনেক দোকানেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিনা পয়সায় পানি বা সরবত পানেরও ঢালাও ব্যবস্থা ।

প্যান্ডেলে ঢোকার অধিকার শুধু মুসলমানদের । ছোটরাও যাচ্ছে । তাদের সবাইকে শামিকাবাব দেওয়া হচ্ছে । যারা ভেতরে যেতে পারেনি তারা রাস্তায় ভিড় করে চারদিকের মাইক থেকে মৌলবীদের পাঠ শুনছে ।

বালিসোনার বড় বড় সব রাস্তায় ভিড় সামলাতে কাছাকাছি তিন থানার পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে । রোজই দিনের শেষে পুলিশদের সঙ্গে রাস্তার এইসব লোককেও কাবাব, মেঠাই, সরবত খাওয়ানো হয় ।

প্রায় পক্ষকাল পরে স্তমা শেষ হয়ে গেলে, বালিসোনার সাধারণ মানুষের মনে সরবত-মেঠাইয়ের মধুর স্মৃতি ছাড়াও তাদের আরও একটা বড় পাওনা হয়েছে- মিনি-মাগনায় সাত-সাতটা গভীর জলের নলকূপ!

রাসমাঠে রোজকার প্রাতঃভ্রমণের আড্ডায় সোমনাথ মণ্ডল, নিকুঞ্জ হালদার, অতীশ রায়, দাসগুপ্ত, সেনগুপ্ত, মুখুজ্যে, বাড়ুজ্যে প্রমুখ শিক্ষিত বয়োবৃদ্ধেরা রাসমাঠ জুড়ে বাস-লরি-গাড়ির রাত্রিবাসীদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর দুর্গন্ধে যারপরনাই বিরক্ত ।

'সে-আমলের ভুবন চৌধুরীর কবরটা এখানেই কোথাও না? তার অবস্থাটা ভাবো একবার ।' শশধর আঢ্যির এ-কথার পিঠে অবসর পাওয়া সংস্কৃতের হেড পণ্ডিত নিরাপদ ভটচায বরাবরের মতো পৈতেটা বুড়ো আঙুলে একপাক পেঁচিয়ে রেখে সেই আঙুলেই তর্জনী চেপে বড় একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'তাঁর অবিনশ্বর আত্মা এমন খোশবু সইতে পারলে হয়! নিজের জমিতে নিজের কবরে বারোভূতের মলমূত্র মস্তকধার্য করা কি চাট্টিখানি কথা!'

নিকুঞ্জবাবু বললেন, 'পণ্ডিতমশাই, মলমূত্র কী বলছেন, এ তো দুনিয়ার ম্লেচ্ছদের গু মাথায় নিয়ে বসে থাকা ।'

'শীট' থেকে এফিডেফিট করে সেন হওয়া বিনোদ বলল, 'তোমার আবার সব তাতে বাড়াবাড়ি! গুয়ের আবার ব্রাহ্মণ-ম্লেচ্ছ কী!'

কুঁড়ে কর্মকারের আসল নাম লোকে ভুলে গেছে । চাকুরিজীবনে কুঁড়েমি করে এত বেশি অফিস কামাই করেছিল যে একবার মাসের শেষে সর্বসাকুল্যে ছিয়াশি পয়সা বেতন পেয়েছিল । সেই কুঁড়েও সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে যোগ করল, 'ভুবন চৌধুরীর সেই ছেলেটা, যে বালিসোনায় খাটা-পায়খানা বন্ধ করেছিল, সেও তো বাপের পাশেই ঠাঁই পেয়েছে!'



৪১

গ্রীষ্মে তিলফুলে রাস্তার দুধার দিগন্ত অবধি সাদা হয়ে উঠেছে । এক রবিবার সংগীতমিছিলের শেষ পর্বে ফুলের সাগরে ঢেউ উঠেছে দেখে আনন্দে গান গাইতে গাইতেই একদল কিশোর-কিশোরী রাস্তা ছেড়ে তিলখেতে নেমে পড়ল । তারা আল ধরে এগিয়ে চলেছে ।

নীলাম্বরের মা মিছিলের বাইরে এসে তাদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘ওরে, মেয়েরা, তোরা ফিরে আয় । তিলফুল তুলে মালক্ষ্মীকেও বারো বছর বামুনের ঘরে দাসীর কাজ করতে হয়েছিল, তোরা জানিস না? মেয়েরা, তোরা ফুল ছুঁসনি যেন, বিয়ের আগে একটা তিলফুল ছিঁড়লেও শাপ লাগে, তোরা ফিরে আয় ।’

তার গলার স্বরে তার বয়েস এখনও ছাপ ফেলেনি দেখে অনেকেই আশ্চর্য হয় । কথাগুলো মেয়েদের উদ্দেশে বললেও তার আসল লক্ষ্য তাদেরই স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী তিস্তা, যেমন গানে, তেমনই লেখাপড়ায়, তেমনই পারিবারিক পরিচয়ে মেয়েটি একটি রত্নবিশেষ । একেই সে মনে মনে তার ভাবী পুত্রবধূ বলে ভেবে রেখেছে ।

মেয়েরা তিলফুল নিয়ে তার সতর্কবার্তা কেউ শুনে, কেউ না শুনে ছেলেদের সঙ্গে আনন্দে গাইতে গাইতে তিলখেতের মধ্যে এগিয়ে চলল ।

সেদিন গানের মিছিলের শেষে নন্দিনী নীলাম্বরের মাকে বলল, ‘সত্যিই তিলফুল তুললে মেয়েদের শাপ লাগে, দিদি?’

‘ওমা, তুমি লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়োনি? লক্ষ্মী তিলফুল তুলেছিল বলেই ব্রহ্মা তাকে শাপ দিয়েছিল । তাতেই তো মালক্ষ্মীকে বারো বছর অভিশপ্ত জীবন কাটাতে হয়েছে ।’

‘সর্বনাশ! তাহলে আমার কী হবে দিদি?’

‘তাহলে বলি, কোনওদিন তোমায় বলিনি, আজ বলছি, দিবাকরকে ওভাবে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করল শুনেই আমার মনে হয়েছিল তুমি নিশ্চয়ই বিয়ের আগে তিলফুল তুলেছিলে!’

'আমার দুর্ভাগ্যের কথা না। ওই যে মেয়েরা তিলখেতে ছুটে গেল, ওদের মধ্যে একটা মেয়ের সঙ্গে আমার মেঘাবৃতর বিয়ের কথা হয়ে আছে। সে যদি ফুল ছিঁড়ে থাকে?'

'কোন মেয়েটা বলো তো?'

'তোমাদের স্কুলেই পড়ে। তিস্তা।'

পরের রবিবার খুব সকালে রাসমাঠে নেমে এসে পরীক্ষিৎ সংগীতমিছিলের যাত্রা শুরু করিয়ে মিছিল দৃষ্টির বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত বাবার কবরের কাছে বসে রইল। সমবেত কণ্ঠের গান ভেসে এলেও মিছিলের সম্মুখভাগ যখন আর চোখে পড়ে না, তখনও মিছিলের শেষটুকু ধীরে ধীরে রাসমাঠ পার হচ্ছে দেখা গেল। সেইসময়টা পরীক্ষিৎ নিজের মনে কথা বলে চলল। ভোর থেকেই আকাশ খুব মেঘলা দেখে জাহাঙ্গীরও চলে এল। অম্বরীশ নিজের কবরের ওপরে কায়ক্লেশে এসে বসল।

সাদা তিলখেতের মধ্য দিয়ে একমুহূর্তের জন্য পরীক্ষিৎ সাদা শাড়ি পরা রাঙা-জ্যাঠাইমাকে আসতে দেখল। কোথা থেকে আসছিলেন, কোথায় যাচ্ছেন, কিছুই জানা হল না। তাঁর নতুন সেনাবাহিনী গড়ার কাজ এখন দিশেহারা, গতিহারা নিছক একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়নি কি? পরীক্ষিৎ ভাবে, এ তো বড় রঙ্গ- কাজ শেষ না হলেও জীবন শেষ হয়ে যায়! তার নিজেরই বছরের পর বছর সমুদ্রে ঘোরার স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসছে, কোথাও কোনও কূল এখনও দেখা গেল না। রাঙা-জ্যাঠাইমাও তার জীবন থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। দিনের শেষে তাঁকে না দেখে তার বুক মোচড়ায়, দুঃখে মন অসাড় হয়ে যায়। ভাবতে ভাবতে ভেজা চোখে হঠাৎ দেখল, সাদা ফুলে ভরা তিলখেতের হাওয়ায় সাদা আঁচল উড়িয়ে রাঙা-জ্যাঠাইমা বহু দূরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, পরীক্ষিৎ তাঁকে দেখছে, তিনি জানতেও পারছেন না। জানলে একবার অন্তত পরীক্ষিতের দিকে তাকাতেন।

দুপুর গড়িয়ে গেলে ভণ্ডুলরা এসে পরীক্ষিৎকে পাঁজাকোলা করে বাড়ি নিয়ে গেল।

মাঝরাতে জ্বর বাড়লে নীলাঞ্জনা তার মাথায় আইসব্যাগ ধরে। পরদিন সকালে ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে জানালেন- 'মেজর মেন্টাল শক। তাছাড়া হয়তো কোনও ব্যাপারে সাংঘাতিক ফ্রাসট্রেশনে ভুগছেন।'

ওষুধে জ্বর নামছে না দেখে সন্ধ্যায় অন্য ডাক্তার আনা হল। তাঁর ডায়াগনোসিস- মারাত্মক স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি, একাকীত্বের ক্লান্তি। সেইমতো আরও দুটো ওষুধ বাড়িয়ে দেওয়া হল।

জ্বর নেমে যাবার পর মিতা একটা দুর্গামূর্তি দেখিয়ে পরীক্ষিৎকে জিজ্ঞেস করল, 'পেতলের দুর্গাঠাকুর তুই কোথায় পেলি রে? তোর জোড়ের 'হিসট্রি অফ সিভিলাইজেশন'-এর খণ্ডগুলোর ধুলো ঝাড়তে গিয়ে বইয়ের পিছনে পেলাম।'

পরীক্ষিৎ হাতে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখে বলল, 'পেতলের? বাবা ভেবেছিলেন সোনার। নদী খুঁড়তে খুঁড়তে পেয়েছেন। এটা, আর একটা অজ্ঞাত আমলের স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে বাবার ধারণা হয়েছিল হারানো নদীও খুঁজে পাওয়া যাবে। ঘাটের ধ্বংসাবশেষটাও বাবাকে হাতছানি দিত। ডায়েরিতে এসব লিখে গেছেন। তুমি বলছ ওটা সোনার নয়, পেতলের?'

'দেখে বুঝতে পারছিস না?'

'স্যাঁকরাকে দেখিয়ে নিলে হয়।'

পাঁচ পুরুষ ধরে জমিদারবাড়ির সোনা-রুপোর গয়না, থালা-বাটি, ঠাকুরের সিংহাসন বানায় যে স্যাঁকরাবংশ তাদের এখনকার তরুণ বংশধর রাধাবল্লভ দুর্গামূর্তি যাচাই করে এসে জানাল, এটা অনেক আগের আমলের জিনিস। তেইশ ক্যারেট সোনার তৈরি। নদী খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া গেছে মানে এ তো এখন সরকারের সম্পত্তি। সেকথা সালংকারে ব্যাখা করে জিজ্ঞেস করল, 'গলিয়ে ফেলি কত্তাবাবু? জিনিসটা তাহলে আর সরকারের ঘরে যায় না। সোনার দাম দিন দিন যেভাবে বেড়ে চলেছে, আখেরে আপনাদেরই লাভ! আজকাল সোনা ঢেলে বিশেষ কেউ আর তেমন গয়নাগাটিও বানাচ্ছে না।'

পরীক্ষিৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'সরকারের জিনিস গলাবি কী রে! পরিচয়লিপি তৈরি করে দুর্গামূর্তি সরকারকেই দান করে দেব।'

পরীক্ষিতের আত্মঘাতী পিসির দুই ছেলে রাসমাঠ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে শুনে কিছুদিন হল মামার বাড়িতে এসে বসে আছে, তারা দুজন একসঙ্গে বলে উঠল, 'এটা তো মামা পেয়েছিল, এতে আমাদের মায়েরও ভাগ আছে।'

এবার একজনের গলা, 'মার অবর্তমানে তার অংশ তো আমরাই পাব।' দুজনে আবার একসঙ্গে বলে ওঠে, 'তোমরা এটা কাউকে দান করতে পারো না।'

পরীক্ষিৎ, নীলাঞ্জনা, পারমিতা তিনজনই বিরক্ত হয়ে যে যার মতো চুপ করে রইল।

দুই ভাই পরপর তিনজনের মুখ দেখে নিল। এক ভাই বলল, 'এবার কিন্তু আমরা আমাদের মায়ের সম্পত্তির ভাগ বুঝে নিতেই এসেছি। আমাদের পাওনা-গণ্ডা নিয়ে তবেই ফিরব।'

অন্য ভাই বলল, 'রাসমাঠের কীরকম দাম পাওয়া যাবে পরীক্ষিৎ?'

পরীক্ষিৎ ক্লান্ত স্বরে বলে, 'আমি বেঁচে থাকতে রাসমাঠ বিক্রি হতে দেব না।'

একভাই এবার হেসে ফেলল, 'জন্মালে মরতে হবে, অমর কে কোথা থাকবে ভাই? তুমি আর কদ্দিন, যা তোমার শরীরের অবস্থা!'

পারমিতা ক্রোধ চেপে বলল, 'গঙ্গার ধারে তোমাদের পৈতৃক বাড়িতে শুনেছি তোমরা দুভাই চিতার কাঠের ব্যবসা করো, বাড়িতে চ্যালা কাঠ ডাঁই দিয়ে রাখো। বারো মাস তিরিশ দিন, দিন নেই রাত নেই শবযাত্রীরা, চণ্ডালরা এসে কাঠ প্যাঁকাটি নিয়ে যায়। এই

করে যারা সংসার চালায় তারা চৌধুরী বাড়ির কে? কেউ না! তোমরা আর এসো না । কিছু টাকা দিয়ে দিচ্ছি, নিয়ে চিরকালের মতো চলে যাও!'

দুভাই একসঙ্গে, 'কত টাকা?'

পরীক্ষিৎ শ্রান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কত আশা করো?'

'কাল রাসমাঠ ঘুরে এসে বলব । স্বর্ণদুর্গার কীরকম ওজন?'

নীলাঞ্জনা কথা না বলবার সংকল্প ভেঙে বলে উঠল, 'স্বর্ণদুর্গায় তোমাদের কোনও অধিকার নেই । ওতে তোমাদের মা'র কোনও অংশ নেই । আমি পরীক্ষিতের মাথা ধোয়াব, তোমরা বাইরে যাও ।'

'স্বর্ণদুর্গা কত ভরি বললে না তো?'

সেজোভাই আনন্দমোহন দরজার বাইরে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিল, হঠাৎ ঘরে ঢুকে বলল, 'আমি সব খবর নিয়েছি । তোদের দামড়া ছেলে তিনটেকে চিতার কাঠ শ্মশানে ডেলিভারি দেওয়ার কাজেও লাগিয়েছিস!'

এক ভাই রাগে উন্মত্ত দৃষ্টিতে আনন্দমোহনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেও ঠান্ডা মাথায় বলল, 'এ জায়গাটা আমাদের সতীদাহগঞ্জো হলে আজ রাতেই তোমার ধড় গঙ্গায় ভাসত, মামা । মুণ্ডুটা আমরা পাইকারদের কাছে বেচি, খুলিও কাজে লাগে ।'

'মামা! কে তোদের মামা!' রাগে কাঁপতে কাঁপতে আনন্দমোহন দারোয়ান ভূধরকে হাঁক পাড়লেন, দরজার দিকে ঘুরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভূধর! ভণ্ডুল! এ দুটোকে ঘাড় ধরে বাড়ির বাইরে বার করে দে । একেবারে বালিসোনা পার করে দিয়ে আসবি । দরকার হলে আমাদের দলের ছেলেদের খবর দিবি ।'

এক ভাই ভণ্ডুলদের দিকে হাতের তালু তুলে রেখে বলল, 'তার দরকার নেই মামা । আমরা রাসমাঠ দেখে ফিরে যাচ্ছি । আবার আসব ।'

'খবরদার আর বালিসোনায় কখনও পা দিবি না! দাসপাড়ার প্রমোদ-ছোঁড়ার সঙ্গে তোর মা যেদিন স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা না দিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল সেদিনই চৌধুরীবাড়ির মুখে চুনকালি দিয়েছিল । তারপর আত্মঘাতী হয়ে আরও এক পোচ কালি লাগাল । এখন তো কাঠপোড়া কালি লাগাচ্ছিস! চিতার কাঠ বেচে খাস, এবার এসেছিস সম্পত্তির ভাগ নিতে! সহোদর বোন না হলে কবেই মেয়েটাকে কুচি কুচি করে কেটে হাতানিয়া- দোয়ানিয়ায় ভাসিয়ে দিতাম! কে রে তোরা? তোদের পদবি আলাদা, গোত্র আলাদা, তোদের বাপ ছিল জোচ্চর রেশন-দোকানদার, রেশনের চাল-চিনি ব্ল্যাক করত, তোরা হলি চিতার চ্যালাকাঠ সাপ্লায়ার!'

'চিতায় আমরা তুলতেও জানি । ওদের বলে দাও কেউ যেন আমাদের গায়ে হাত না দেয়! রাসমাঠ একচক্কর ঘুরে চলে যাব । এত তড়পালে, তাই বলে যাচ্ছি, এখানে তোমাদের যে দল, ওখানে আমরাও কিন্তু সেই দলই করি ।'

‘চোপ! বেরো, বেরো এখান থেকে!’

‘বেরব তো নিশ্চয়ই, আবার আসবও ঠিকই! বলো তো একশো ভাগ শুকনো কিছু কাঠ আগাম পাঠিয়ে দিই । শ্মশানে এই কাঠকে কী বলে জানো তো? বারুদমাখা কাঠ । সামনের ভোটে কিন্তু ভিজে কাঠও ব্ল্যাকে বিকোবে!’

নীলঞ্জনা আর পারমিতা পরীক্ষিৎকে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মাথা ধুইয়ে দিচ্ছিল, যাতে দেওয়াল ভেদ করেও যম-রাক্ষসের বাগযুদ্ধ জলের শব্দে ঢাকা পড়ে যায়, কিছুতেই পরীক্ষিতের কানে না পৌঁছয় ।

মাথা ধোওয়ানো শেষ হবার অল্প পরেই প্রদীপ পরীক্ষিতের খবর নিতে এল । রোজ রাতে সে একবার এসে দেখে যায় পরীক্ষিৎ কতটা সুস্থ হল, কাল তাদের বেরনো হবে কিনা ।

ততক্ষণে পরীক্ষিতের ধুম জ্বর ফিরে এসেছে ।

তিলখেতেই আবার রাঙা-জ্যাঠাইমার সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল । এবার তাকেও দেখেছে । ভরা জ্যোৎস্নায় সাদা তিলফুলের মধ্যে গ্রিক দেবীর মতো সাদা গাউনে আবক্ষ ঢাকা সরোজিনী পরীক্ষিতের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ‘ভেঙে পড়িস না রে । বালিসোনানদী না বাঁচলে বালিসোনা-ও বাঁচবে না । তোর বাবা এখনও মাটি খুঁড়ে চলেছে, নদীর খোঁজ ও একদিন পাবেই ।’

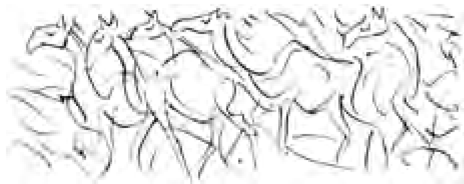
পরীক্ষিতের খুব কৌতূহল, সে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি এখন কী করছ রাঙাজেঠি?’

‘আমার অনেক কাজ । চ’ এবার বাড়ি ফিরি । তুই শুয়ে থাকবি, আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দেব ।’

বাড়ি ফিরে সত্যিই রাঙা-জ্যাঠাইমা তার শিয়রে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকল ।

শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়বার আগে পরীক্ষিৎ বলল, ‘তুমি যে বেঁচে আছো আমি জানতাম না । আর কখনও চলে যেয়ো না ।’

নীলাঞ্জনা পরীক্ষিতের কপালে জলপটি দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, জ্বরের ঘোরে তার ভুলবকার শব্দে জেগে উঠে আইসব্যাগ এনে মাথায় চাপাল ।



৪২

সেবছরই প্রথম বালিসোনার রাস্তায় উটের সারি দেখা গেল ।

কুরবানি ঈদের কিছু আগে থেকে দরজিদের কাঁচি ধার দেবার দোকানগুলোয় গোরু হালাল করার ছুরিতে শান দেওয়া শুরু হয়ে গেছে । ঈদের দুদিন আগেই মাঝরাতে রাস্তা জুড়ে গোরুর দীর্ঘ সারি দেখা গেল । সকালের দিকে সাতটা উট যেতে দেখে অনেকেই জানলা দিয়ে ছোটদের দেখাতে লাগল ।

ঈদের দিন সকাল থেকে কুরবানির রক্তমাখা নতুন থামি ও গেঞ্জি পরে থালায়, বাটিতে, হাঁড়িতে, গামলায়, ব্যাগে, বস্তায় বড় বড় মাংসের খণ্ড প্রতিবেশীদের বাড়ি-বাড়ি বিলোন শুরু হল । ট্রেনের কামরায় কাঁচা মাংসের থলে থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়তে দেখে হিন্দু যাত্রীরা নাক ঢাকে, মুখ বিকৃত করে । তাদের ক্রুদ্ধ গালিগালাজের মধ্যেই লম্বা-চওড়া চেহারার এক বুড়ি ট্রেন ছাড়বার মুখে একটা মাংসের বস্তা কামরার দরজায় ভিড় করে দাঁড়ানো যাত্রীদের পায়ের কাছে ধপাস করে নামিয়ে দুহাত দিয়ে বস্তাটা ভেতরে ঠেলতে ঠেলতে বলল, 'চর্বি সব জমে গেছে গো, তোমাদের গায়ে এক ফোঁটা রক্তও লাগবেনি!'

হুইশিল পড়ে গেছে, যাত্রীরা তবু অনড় দেখে বুড়ি অনুনয় করল, 'সাতটা ইস্টিশন পরেই শহরের দোকানে নাম্যে দে চলে আসব, আমারে একটু তুলে নেন বাবুরা ।'

ট্রেন চলতে শুরু করেছে । লম্বা-চওড়া বুড়ি এক গুঁতোয় জায়গা করে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে বস্তাটা কামরায় ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমরা যে দুগ্গাপুজোয় পাঁঠা বলি, মোষ বলির রক্ত মাখো তখন কি মোছলমানরা কিছু বলে?'

দরজায় দাঁড়ানো যাত্রীদের দুজন ছাত্র হাত বাড়িয়ে বুড়িকে সাহায্য করতে ঝুঁকলে বয়স্করা হইহই করে ওঠে ।

পিছনের কামরা থেকে উচ্চ রবে সমবেত কণ্ঠের 'জয় জয় রাম, জয় জয় রাম' শুনে এ-কামরার অনেকে তালে তালে মাথা নাড়ছিল, সেদিকে ইঙ্গিত করে মাংসের বস্তাওলা বুড়ি দুঃখ করে বলল, 'রামনামের কামরায় তো পায়ের নাতি উঁচিয়ে দরজা থেকে তেইড়্যে দিল, এখানে তবু যা হোক একটু জায়গা দিলে বাবুরা!'

এক মাঝবয়েসি মহিলা সিটে বসে অনেকক্ষণ ধরে ব্যাপারটা লক্ষ করছিলেন, পুজোয় বলির কথাটা শুনে পাশের কলেজ ছাত্রীকে বললেন, 'আমরা যখন ছোট ছিলাম, স্কুল ছুটির পর হিন্দু-মুসলমান মেয়েরা বাড়ির পথে কিছুটা এগিয়ে দু-দল দুদিকে চলে যাবার সময় আমরা ওদের খ্যাপাবার জন্য মজা করে বলতাম, আল্লা আল্লা করিস তোরা, আল্লা আছে ঘরে? লুঙ্গি টুপি পরে আল্লা ঝিঙে চুরি করে । ওরাও আমাদের দিকে ফিরে বলত, কালী কালী করিস তোরা- তোদের কালী ল্যাংটা, স্বামীর বুকে দু-ঠ্যাং তুলে নাচছে খালি খ্যামটা ।'

ছাত্রীটি হেসে ফেলে বলল, 'এখন তো এরকম ঠাট্টা তামাসা থেকে দাঙ্গা লেগে যেতে পারে, মাসিমা ।'

দুধসাদা দু-তিনতলা বাড়ির বাসিন্দারা গোরু-উটের মাংস তিনভাগ করে একভাগ গরিব-দুঃখীদের (বেশিটাই তিলচাষিদের), আরেক ভাগ আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে বাকি একভাগ নিজেদের প্রয়োজনে রাখে । বেশ কিছুটা মাংস অনেকদিন ধরে রোদে শুকনো হয় । তখন অন্ত্যজ হিন্দুরাও নাকে গামছা চাপা দিয়ে রাস্তা পার হয় ।

পরের মাসেই উত্তুরে হিমেল হাওয়া শুরুর বদলে দখনে-বাতাস বইছে দেখে বালিসোনার বয়োবৃদ্ধরা ভয় পেল । পৌষের পর মাঘ শেষ হয়ে এল, মাঝে মকরসংক্রান্তির সময় দিন তিনেকের কনকনে হাওয়া ছাড়া গোটা শীতকালটাই তেমন জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়ল না ।

পরীক্ষিৎ তার রাঙাজ্যাঠার ওষুধের বাক্স ঘেঁটে চিকেন পক্সের হোমিওপ্যাথি প্রতিষেধকের বড় শিশি বের করে দেখল ভেতরের সব দানা গোলাপি বর্ণ ধারণ করেছে ।

দোকান থেকে চার ড্রামের চার শিশি নতুন ওষুধ কিনে সরোজিনীর বালসেনাবাহিনীর ছেলেমেয়েদের দিয়ে আলাদা আলাদা মোড়ক বানিয়ে বালিসোনার দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করল । একাজের মূল দায়িত্ব দেওয়া হল তার স্নেহভাজন, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর ।

শীতঋতু থাকতেই গরম পড়ে যাওয়ায় সাপেরা গর্তের শীতঘুম ছেড়ে উঠে এসেছে । মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষেই সাতজন চাষিকে সাপে কাটার খবর পাওয়া গেল । বৃদ্ধরা গুড়ুক গুড়ুক শব্দে তামাক টানে আর ভাবে এসব নতুন বছরের অশুভ সংকেত নয় তো?

সকাল থেকে বসন্তের ওষুধ বিলির তদারকি সেরে বাড়ির কাছাকাছি এসে পরীক্ষিতের ভুরু কুঁচকে গেল । তাদের গেটের সামনেটা ঢেকে বিরাট একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে ।

লালকমল-নীলকমলের সামনে ট্রাক থেকে ভারি ভারি যন্ত্র নামানো হচ্ছে, আর্মির পোশাকে দুজনকে চিনতে খানিকটা সময় নিয়ে পরীক্ষিৎ অজানা শংকায় বলে ওঠল, 'এসব কী? এ কি কোনও যুদ্ধের প্রস্তুতি?' বলতে বলতে লালকমল-নীলকমলের দিকে

এগিয়ে গিয়ে অদ্ভুত একটা আবেগে দুজনকে একসঙ্গে বুকে টেনে নেয়। 'এতদিন কোথায় ছিলে? তোমরা কেমন আছো? এখন এলে কোথা থেকে?'- তার প্রশ্নের যেন শেষ নেই।

পরীক্ষিতের চেয়ে মাথায় লম্বা লালকমলের গলার স্বরও বদলে গেছে। বাবার বুক থেকে আলগা হয়ে ভরাট গলায় বলল, 'ঠাকুরদা নদীর একটা রুটম্যাপ করেছিলেন না? ওটা একবার দেখা দরকার। বালিসোনা থেকে সাগরমোহনা মোট পঁয়ষট্টি মাইল।'

নীলকমলও তার বদলে যাওয়া স্বরে যোগ করল, 'ভারতের সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে দীর্ঘ খাল আমরাই বানাব।'

'ইন্ডিয়ান আর্মি এই ধরনের কাজ করতে রাজি হবে?'

'আর্মির সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা দুভাই বালিসোনাকে তার হারানো নদী ফিরিয়ে দেব।'

'তোমরা আর্মিতে নেই? আর্মির পোশাক কেন তাহলে?'

'এ তো ওল্ড মিলিটারি গুডসের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। আমরা কিনেছি হিমাচলের একটা দোকান থেকে।'

'যন্ত্রগুলো কীসের? ওগুলোও কি তোমাদের?'

'দুটোই জার্মানির তৈরি। রাজস্থানে লুপ্ত নদী সরস্বতীর সন্ধানে এরকম অনেক যন্ত্র ওরা ব্যবহার করে। পুরনো হয়ে গেলে বেচে দেয়। আমরা এই দুটো কিনে নিয়েছি।'

বাড়িতে ঢুকে মৃদুস্বরে কীর্তন শুনে পরীক্ষিৎ উত্তেজনায় চমকে ওঠে। মিতার ঘরে তার সামনে বসে তিকান নয়, পরী গাইছে। পরীর পাশে ছ-সাত বছরের একটা শান্ত চেহারার মেয়ে।

লালকমল-নীলকমল একসঙ্গে ঘরে এসে বলল, 'ভালো আছো মিতাঠাম্মা?' লালকমল আলাদা বলল, 'তোমার কীর্তন শোনার জন্য কেমন পরীকে এনে দিলাম। পরীর মেয়ে শিউলির কচি গলার কীর্তন শুনেও তুমি অবাক হয়ে যাবে।'

'তিকান এল না কেন?' পরীক্ষিৎ জড়োসড়ো পরীর দিকে উত্তরের অপেক্ষায় চেয়ে রইল।

দু-ভাই একটা কম্পাস আর একটা দূরবীন কেনার খবর বাবাকে দিতে যাচ্ছিল, তাছাড়া পাহাড়ের নীলা আর চুনিও বাবাকে দেখাতে চায়, বলল, 'দোল পূর্ণিমায় পাড়ার প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে বৃন্দাবনে গিয়ে আর ফেরেনি। অন্যরা সবাই ফিরে এসেছে, তাদের কেউ কেউ বলছে- যমুনায় স্নান করতে গিয়ে তিকান মাসি জোয়ারে ভেসে গেছে।'

পরী গান থামিয়ে মুখ নিচু করে বসে ছিল, এই প্রথম কথা বলল, 'পাড়ার মাতব্বররা আমাকে মায়ের শ্রাদ্ধ করতে বলেছিল, আমার মন সায় দেয়নি। মা হয়তো পথ হারিয়ে ঘুরে মরছে, একদিন ঠিক ফিরে আসবে। ঠিক আসবে, দেখো তোমরা।'

মিতা বলল, 'তা-ই যেন হয় রে! মেয়েটা সারাজীবন শুধু দুঃখই পেয়ে গেল।' শিউলির কপাল থেকে নরম চুলসারি সরিয়ে দিয়ে বলল, 'ধর মা, একটা কীর্তন ধর দেখি।'

পরীর চোখে জল দেখে শিউলি ফোঁপাতে শুরু করেছিল, এবার কেঁদে উঠল।

পরীক্ষিৎ বলল, 'মেয়েটা পরীর, বুঝতে পারছি। তোমাদের মধ্যে ওর বাবা কে?'

'ওর বাবাকে কি তুমি দেখেছ? পরীকে এ-বাড়িতে প্রাইভেট পরীক্ষার টিউশান দিতে আসত। শিউলি পেটে আসার খবর শুনেই পালিয়েছে! পালাবে কোথায়!'

পরীক্ষিতের সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়ে লালকমল নীলকমল অম্বরীশের তৈরি লুপ্ত নদীপ্রবাহের পথচিত্র খুঁজতে খুঁজতে প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রাটা দেখতে পেল। লালকমল বলল, 'আমরা পাথরের প্রাচীন মুদ্রা পেয়েছি বাবা, জেড পাথরের, মোট এগারোটা। হাতির দাঁত বসানো মুকুট-পরা মাথার ছবিওলা সেই মুদ্রা কোথাকার, কার সময়ের, জানতে পারিনি।'

নীলকমল বলে উঠল, 'জানো বাবা, মুদ্রার কাছেই জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের মধ্যে একটা কাঠের মূর্তি আছে। হয়তো কোনও দেবতার মূর্তি', থেমে লালকমলের দিকে চেয়ে, 'বলি, লাল?'

'না বললে বাবা বুঝবে কী করে?'

'জানো বাবা, একটা অদ্ভুত ব্যাপার, মূর্তির লিঙ্গটা একহাতের বেশি লম্বা। সেই পাহাড়ে পাথরের মধ্যে আমরা চুনি আর নীলার অনেক পাথর পেয়েছি।'

'মূর্তিটা হয়তো কোনও আদিবাসীগোষ্ঠীর পৌরাণিক দেবতা। পাথরের মুদ্রাও হয়তো তাদের গোষ্ঠীপতি বা রাজার।'

অম্বরীশের কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে পরীক্ষিৎ বলল, 'লুপ্তপ্রবাহের পথচিত্র মোহনার অনেক আগে শকুনতলি গ্রামে শেষ হয়ে গেছে। শকুনতলির বাসিন্দারা পুরুষানুক্রমে বিশ্বাস করে আসছে যে এখানেই বালিসোনা-নদীতে লখিন্দরের শবের গন্ধে শকুনির ঝাঁক সারা দিন ধরে আকাশে চরকি কেটেছিল।'

শকুনতলির পরে আরও পাঁচটা গ্রাম ছুঁয়ে সেকালে এই নদী সাগরে গিয়ে মিশত। হারানো নদীর বুকে কালে কালে কোথাও শনিমন্দির হয়েছে, কোথাও চালাঘর তুলে লোকজন বসবাস করছে, কোথাও ডোবা খুঁড়ে, পুকুর কেটে মাছ ধরা চলছে, কোথাও বাজার বসে গেছে, অম্বরীশের করা ম্যাপ থেকে সেগুলো আলাদা করে লিখে নেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে নীলকমল।

চৌধুরীবাড়ির স্যাঁকরা রাধাবল্লভ হুগলি থেকে রত্নপাথর কাটার কারিগর আনিয়ে চুনি ও নীলা পাথরগুলোর উপযুক্ত আকার ও উজ্জ্বলতা আনল। রাধাবল্লভ নিজে সাতটা বিভিন্ন ক্যারেটের চুনি ও তিনটে নীলা কিনে নিল, বাকিগুলোও তার কাছে রইল, যখন যেটা ভালো দাম পাবে, কলকাতার বউবাজারের দোকানে বেচে নিজের কমিশন রেখে লালকমলদের টাকা দিয়ে যাবে। রাধাবল্লভ একসঙ্গে এতগুলো রত্নপাথর দেখে এগুলোর

কোনও ইতিহাস জানতে চায়নি, ভেলভেটের হাতখানেক লম্বা থলি ভরে নীলা-চুনি নিয়ে চলে যাবার সময় শুধু বলে গেল, 'সাতপুরুষ ধরে আপনাদের সেবা করে আসছি কত্তাবাবু, আপনাদের বিশ্বাসই আমাদের মূলধন । ভালো দামই পাবেন আপনারা । এ হল আসল বার্মিজ রুবি, বার্মিজ স্যাফায়ার ।'

লালকমল বলল, 'বর্মার জঙ্গলে আমরা অনেক দিন ছিলাম ।'

নীলকমল বলল, 'নীলা-চুনির মান গোত্র ওজন দাম একটা কাগজে লিখে নাম সই করে আমাদের কাছে রেখে যান, কার্বন কপি আপনি নিয়ে যাবেন ।'

বালিসোনা গ্রাম বাদে বাকি আঠেরটি গ্রাম ঘুরে দেখে চাপা পড়া নদীর বুকে চালাঘর, বাজার, মন্দির, সেলুন, চায়ের দোকানের প্রত্যেককে তাদের চাহিদা মতো টাকা বিলি করতে ফাল্গুন শেষ হয়ে গেল । চৈত্র থেকে মাটি খোঁড়ার বড় বড় দুটো যন্ত্র চালু করা হল । দিন রাত কাজের জন্য প্রচুর লোকও লাগানো হয়েছে ।

তিন মাস অবিরাম মাটি তোলার পর ঊনত্রিশ জায়গায় মাটি ফুঁড়ে জল চুঁইয়ে উঠতে লাগল । নদীখাত যত মোহনার দিকে এগোয়, তত বেশি জলমুখের সংখ্যা ও পরিধি বাড়ে । শ্রাবণের শেষাশেষি বৃষ্টিতে অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটুজল হলেও ভাদ্রের মাঝামাঝি জল শুকিয়ে গেল । সকলে আশা করেছিল হয়তো মোহনায় জোয়ারের সময় পুরো পঁয়ষট্টি মাইল বা তার অনেকটা জলে ভরে যাবে ।

সেই আশাতে লুপ্ত নদীখাতের দুপাড়ে মাটির স্তূপে গ্রামের মানুষ ভাগে ভাগে শাক-সবজির চাষ শুরু করেছে ।

প্রদীপও অনেক দিন পর নতুন উৎসাহে খালের দুপাড়ের জন্য ফল ফুল তাল সুপুরি নারকেল গাছের চারা বিলোবার ব্যবস্থা করল । লালকমল-নীলকমলকে পেয়ে প্রদীপ তাদের বোঝায়, 'পৃথিবীতে তৃতীয় মহাযুদ্ধ কাদের সঙ্গে কাদের হবে জানিস?পরমাণুযুদ্ধের আশংকা আর নেই, এবার বিশ্বযুদ্ধ হবে যারা প্রকৃতি ধ্বংস করে আর যারা প্রকৃতি রক্ষা করে সেই দু-দল মানুষের মধ্যে । মানুষের প্রাণবায়ুর জন্য এই মহাযুদ্ধ বালিসোনায় আমরা শুরু করে দিয়েছি । পৃথিবীর যেখানেই ভালো গাছের বীজ পাবি বালিসোনায় এনে ছড়িয়ে দিস ।' হঠাৎ লালকমলের কাছে ঘেঁসে এসে চোখের তারা ঘুরিয়ে চারদিক দেখে নিল । তারপর পাতলা কাগজের সাতটা পুরিয়া হাতে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'এতে ভালো ভালো মানুষের বীজ আছে, খালপাড়ের নতুন মাটিতে বুনে দে গিয়ে । ভালো মাটি পেয়েছি, এবার দরকার শুধু ভালো গাছের বীজ আর ভালো মানুষের বীজ । যত পারিস ছড়িয়ে যা ।'

নীলকমল হেসে বলে, 'তোমার বিয়ে হল না কেন, ছোটদাদু?'

'গাছপালার সঙ্গে কবেই আমার নাবালক-বিয়ে হয়ে গেছে! তোরা আর সেসব জানবি কী করে! তোরাও কি সেই এক কন্যেকে দুজনে মিলে বাল্যবিয়েই করলি?'

লালকমল বলল, ‘আমাদের ঠাকুর্দা মনে হয় আমাদের জন্মের বহু আগে বালিসোনার হারানো নদীর সঙ্গে আমাদের দু-ভাইয়ের বিয়ের কথা পাকা করে গেছেন ।’

লক্ষ্মী হাসপাতালের নানা দুর্নীতির খবরে হতাশ ও বিরক্ত হয়ে হাসপাতালে যাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে । রোগীর অপারেশনের পর সেলাই করার মোটা সুতোর বদলে রোগীর আত্মীয়রা ভালো সুতো চাইতে গেলে ওয়ার্ডবয় টাকা দাবি করে । তাই নিয়ে বচসা ও তার পরিণামে বিনা সেলাইয়ে প্রচুর রক্তপাত হয়ে এক রোগীর মৃত্যু হয় । তারপর থেকেই লক্ষ্মী হাসপাতালে যাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে । মাঝে মাঝে খালপাড়ে এসে লালকমল-নীলকমলদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কাটিয়ে যায় । বালিসোনার মানুষের কাছে এটা খাল না, তাদের বিশ্বাস লালকমল-নীলকমল বালিসোনার হারানো নদীই ফিরিয়ে আনছে । কেউ কেউ কল্পনায় দুই পাড়ে নারকেল তাল সুপারিবনের সারি এখন থেকেই দেখতে শুরু করেছে ।

মাঝে মাঝে ভোরে এসে লক্ষ্মী নদীখাতের ধার বরাবর হাঁটতে হাঁটতে মোহনার দিকে অনেক দূর অবধি চলে যায় । গ্রামের মানুষের রোগব্যাধির খবর নেয় । নদীর বুকে একটা ভাসমান হাসপাতাল তার এখন ধ্যান-জ্ঞান । একজন ডাক্তার, একজন কম্পাউন্ডার, একজন নার্স আর একজন মাঝি ও রাঁধুনি নিয়ে ছোট্ট চলমান হাসপাতাল । এরও নাম সরোজিনীর নামে হবে ভেবে রেখেছে । সরোজিনী আরোগ্য তরী । পুরো পঁয়ষট্টি মাইল উনিশটি গ্রামের প্রত্যেকটিতে একদিন করে বজরা নোঙর করে রেখে, সেই গ্রামের অসহায় মানুষদের চিকিৎসা হচ্ছে- সে চোখ বুঝলে দেখতে পায় । খাল কাটা বা নদী উদ্ধার শেষ হবার আগেই সে হুগলির বলাগড় থেকে লিওনের নকশা মতো ছোট বজরা বানাতে উদ্যোগী হল ।

সরোজিনী গ্রামীণ হাসপাতালে সরকার থেকে একজন প্রশাসক বসানো হয়েছে । একদিন সেই প্রশাসক ডাঃ খাস্তগীর ভোরবেলা মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে নদীর ধারে লক্ষ্মীকে ধরে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ‘আপনি নাকি নৌকো-হাসপাতাল করার কথা ভাবছেন? এভাবে মানুষের চিকিৎসা হয়? এসব করে আপনি কী পান মিসেস চৌধুরী-উনগারেত্তি?’

‘ঠিক জানি না, হয়তো শান্তি পাই ।’

বালিসোনা নদীর জলে-কাদায় বালিসোনার মানুষও শান্তি দেখার আশায় বুক বেঁধেছে । নদী যেদিন ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে সেদিনটার কল্পনা করে কেউ কেউ নবান্নের মতো ঘরে ঘরে নদী-উৎসব পালন করার বিষয়ে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে ।

দীর্ঘ নদীখাত ‘ল্যাজা হইতে মুড়া খুঁইজ্যা’ দেখেও ‘জলে সোনা, থলে সোনা, বালি সোনাগুঁড়া’ পাওয়া যায়নি বলে লালকমল-নীলকমলের মনে খেদ নেই, তারা ঊনত্রিশটা

জলমুখ নিয়েই তুষ্ট, বিভিন্ন ঋতুতে জলের স্বাদ গন্ধ ও কমাবাড়ার বিশ্লেষণে তারা বেশি মনোযোগ দিল ।

নদী বেঁচে উঠলে কী কী হবে, তা নিয়ে মানুষের মনেও জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই । নদীর ধারে ঘাসজমিতে অনেক বেশি গোরু চরতে দেখে তারা আনন্দ পাবে । একদিন নিশ্চয়ই আমবন জামবন বট অশথের মাথায় ভোরে ও সন্ধ্যায় পাখিদের উচ্চ কলকাকলিও শোনা যাবে ।

বালিসোনায় মানুষের আশা-আকাÉার নতুন ঢেউ উঠতে দেখে লালকমল-নীলকমলের আনন্দের সীমা নেই । রোববারের ভোরের মিছিল যখন হাজার হাজার লোকের গানে-স্লোগানে মুখর, পরীক্ষিৎ যথারীতি মিছিল রওনা করিয়ে অম্বরীশকে নদী উদ্ধারের কথা বলে যাচ্ছে, তখন রাস্তা জুড়ে পর পর আটটি মিলিটারি ট্রাককে পথ ছেড়ে দিয়ে মিছিল বেঁকে নদীখাতের ধার ধরে এগিয়ে চলল ।

মিছিলের কয়েকজন সবার আগে দেখল হাঁটুজলে বুজকুরির মধ্যে কার শব ভেসে আছে । একজন বলল, তবে কি কাল রাতে মোহনার জোয়ারে ভেসে এসে ভাঁটায় এখানে আটকে পড়েছে!

মেঘাবৃতর হাতে সম্পূর্ণ হওয়া ডানাওলা দুটো সাইকেলে লালকমল-নীলকমল নদীখাত ও মিছিলের মাঝখান দিয়ে দ্রুত চলে যাবার সময় শুধু বলে গেল, ‘আগে বাঢ়ো, আগে বাঢ়ো, শবের কথা পরে ভাবো ।’

রোজকার মতো খাল থেকেই এক ঘটি গঙ্গাজল নিতে এসে পরী শবদেহ দেখে আঁৎকে উঠে চোখ ঢাকল । ভয়ে ভয়ে হাত সরিয়ে দ্বিতীয়বার শবের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার দৃষ্টি পাথরের মতো নিষ্পন্দ হয়ে গেল । সেদিন থেকে পরী আর কখনও গঙ্গাজল নিতে খালে যায়নি ।



৪৩

গভীর রাতে কয়েকজন মিলিটারি-পুলিশ লালকমল-নীলকমলকে তুলে নিয়ে গেল । তিরিশে আগস্টের কয়েকদিন আগে সৈনিক স্কুলের পাহাড়ি স্টেশন থেকে যে তিনজন বালিসোনায় এসেছে, এত বছর পরেও তাদের প্রত্যেককে সেই রাতেই নিঃশব্দ অভিযান চালিয়ে অজানা কোথায় নিয়ে যাওয়া হল কেউ জানে না । টানা তিনদিন জেরা করে লালকমল ও নীলকমলকে রেখে অন্যজনকে বালিসোনায় ফিরে যাবার ট্রেনের টিকিট ও পথের খাওয়াখরচ হাতে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল । তিরিশে আগস্টের মিছিলে পুলিশকে লক্ষ করে ছোড়া গ্রেনেডগুলো সৈনিক স্কুলের পাহাড়ি স্টেশনের জন্য পাঠানো লুঠ হওয়া গ্রেনেড হিসেবে চিহ্নিত করা গেছে । তিরিশে আগস্টের ঘটনার প্রধান উদ্যোক্তা চৌধুরী পরিবারের যে-দুজনকে সেদিন ভিড়ের মধ্যে দেখা গেছে তারা আগের দিনই পাহাড়ি স্টেশন থেকে বালিসোনায় এসেছিল ।

রাজধানীতে স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা সচিবালয়ে অনেক অনুসন্ধানের পর পরীক্ষিৎ জানতে পারল, গুডস ট্রেনের সিল ভেঙে আর্মির অস্ত্র লুটের অভিযোগে লালকমল-নীলকমলকে প্রাথমিক জেরার পর তাদের উত্তর-পূর্ব ভারতের সেনা-অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । স্বরাষ্ট্র দপ্তরে সদ্য ভারপ্রাপ্ত সহকারি সচিব, তার প্রাক্তন ছাত্রী ঊষা অফিসের বাইরে এসে মনের দ্বিধা কাটিয়ে পরীক্ষিৎকে বলল, ‘আপনাদের তিন পুরুষের আই বি রিপোর্ট রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে আনানো হয়েছে । আপনার আলাদা পুলিশ রিপোর্টের ফাইলও দেখা হচ্ছে, স্যার । এগুলো ওদের বিরুদ্ধে যাবে মনে হয় ।’

নীলা হঠাৎ ঊষার একটা হাত ধরে কাতর স্বরে বলল, ‘বিশ্বাস করো ভাই, আমার ছেলে-দুটো বদমাস নয়, কোনওদিনই ওরা সন্ত্রাসবাদী নয়, দোষ ওদের একটাই, বালিসোনাকে বড্ড ভালোবাসে । সে তো ওদের বংশেরই দোষ । আমার শ্বশুরমশাইয়ের সময় থেকে চলছে ।’

‘জানি, ম্যাম, জানি । আমি তো লক্ষ্মী-বড়দির স্কুলের ছাত্রী, স্যারের কাছেও পড়েছি ।’

যাওয়া-আসায় প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার ট্রেন জার্নিতে বিধ্বস্ত পরীক্ষিৎ নীলাকে বাড়ির দিকে এগিয়ে দিয়ে নদীখাতের ধারে এসে বসে পড়ল । এখনও হাঁটুজল আছে, জলের ওপর হাওয়া বিলি কাটছে ।

সারা বছর বুকজল, হাঁটুজল, কাদাজল নিয়ে টিঁকে থাকার চেষ্টা সত্ত্বেও সামনের গ্রীষ্ম পর্যন্ত নদী বাঁচল না । জৈষ্ঠে পঁয়ষট্টি মাইলের বেশিটাই ধুলো বালি শুকনো মাটিতে মরুপথের চেহারা নিল ।

বালিসোনার কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে লালকমল-নীলকমলের পক্ষে কথা বলতে গেলে তাদের সকলকেই জানানো হল, তাদের কিছু করার নেই, এটা পুরোপুরি সামরিক বাহিনীর হাতে ।

প্রদীপ খবরের কাগজ ফুÅটো করে সেই ফুটো চোখের সামনে ধরে কুঁজো হয়ে বসে লিখছিল, পরীক্ষিৎ ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে বলল, 'লেখায় ব্যাঘাত ঘটালাম হয়তো । প্রদীপদাদা, তোমাকে একবার দিল্লি যেতে হবে ।'

প্রদীপ মুখ তুলে ভুরু কুচকে পরীক্ষিতের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'দিল্লির পাঠ আমি তুলে দিয়েছি রে । আমার হাঁটুও আর ঠিক নেই ।'

'তোমাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে প্লেনে নিয়ে যাব । আমাদের বড় বিপদ । বালিসোনার সামনে মস্ত ফাঁড়া । লালকমল-নীলকমলকে হয়তো প্রাণ দণ্ড দেওয়া হবে! একবার চলো, হয়তো তুমিই বাঁচাতে পারো ।'

দিল্লির অফিসেও লিফট থেকে হুইল চেয়ারে বসেই নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিরক্ষা সচিবের ঘরে ঢুকে প্রদীপ বলল, 'কল্লোল, একে তুমি চেনো?'

'বিষাদগাথার লেখককে কোন বাঙালি না চেনে, স্যর! রোজ সকালের ফ্লাইটে কলকাতা থেকে আমার বাংলা কাগজ আসে ।' কল্লোল উঠে দাঁড়িয়ে পরীক্ষিতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে এখানে দেখা হবে ভাবিনি । আমি ভাগ্যবান । আপনি কেমন আছেন স্যর?' শেষ কথাটা প্রদীপের উদ্দেশে ।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে প্রদীপের চাকরির শেষ দুবছর কল্লোল ছিল তার অনেক জুনিয়র, প্রদীপের উপদেশে ও সুপারিশে, সেইসঙ্গে শিডিউল কাস্ট হবার বিশেষ সুযোগে সে ক্রমশ ওপরে উঠে আসে । সকলের জন্য কফি বলে দিয়ে প্রদীপকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি আপনার জন্য কিছু করতে পারি স্যর?'

'পরীক্ষিতের দুই ছেলে লালকমল আর নীলকমলকে ভুল করে মিলিটারি পুলিশ তুলে নিয়ে এসেছে । ওরা দুটি যমজ ভাই, মানুষ হিসেবে দুটি রত্ন । তুমি কিছু করো । তোমরা চাইলে আমি পরীক্ষিৎ দুজনেই বন্ড দিয়ে যেতে পারি ।'

কল্লোলের কাছ থেকে ফেরার পথে প্রদীপ হঠাৎ পরীক্ষিৎকে বলল, 'শীতের ফুলকপির মতো এখন নাকি ছোট ছোট অ্যাটম বোমাও বাজারে উঠছে?'

চিন্তামগ্ন পরীক্ষিৎ হঠাৎ ঘোর ভেঙে বলে উঠল, ‘ছেলে-দুটোর সাহস যদি আমার থাকত আমি দেশের দূষিত শাসনব্যবস্থাটাই বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দিতাম! দুর্নীতির দুর্গন্ধে আজকাল আমার গা গুলোয় ।’

গান্ধিজীর ডান্ডি অভিযানের ভাস্কর্য ছাড়িয়ে এসে পরীক্ষিৎ আবার তার নীরবতা ভাঙল, ‘গানের মিছিল রাজধানীর রাস্তায় আনা যায় কিনা ভাবতে হবে ।’

প্রদীপ পরীক্ষিৎ কেউ জানত না, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের যে গাড়িতে তাদের এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে তাতে যে-কোনও কথা বা শব্দ অলক্ষ্যে রেকর্ড হয়ে যায় ।

বালিসোনায় ফিরে প্রদীপ সেই রাতেই পরীক্ষিৎকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে বলল, ‘লাল-নীল আমার মতো একই ভুল করল, ওরাও বিয়ে করল না । রাঙাকাকা আত্মনিধনের ঠিক আগে আমার ঘরে- তুই যেখানে বসে আছিস, সেখানে দাঁড়িয়ে বলে গিয়েছিলেন, ভালো মানুষের বীজের বড় অভাব রে । এটাই হয়তো রাঙাকাকার শেষ কথা ।’

পরীক্ষিতের গভীর দীর্ঘশ্বাসে তার বুকের কাছাকাছি শুকনো ডালপালা থেকে ধুলো উড়ল । কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে কথা বলতে পারল, ‘জাহাঙ্গীর সাহেবও মানুষ আনার কথা বলতেন ।’

একটু বেলার দিকে গরমে ঘেমে পরীক্ষিতের ঘুম ভেঙে গেল । চারদিকে ভাদ্রের গুমোট । প্রচণ্ড গরমে রাসমাঠে মাপজোক তদারকি করতে করতে আনন্দমোহন হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেছে, হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথেই তার মৃত্যু হল । ডাক্তার একমুহূর্ত পরীক্ষা করে বললেন, ‘ম্যাসিভ হার্টঅ্যাটাক!’

নীলা, পরী, মিতা, নন্দিনী, চিরন্তনী, অরণ্য, মেঘাবৃত সকলেই দিনের পর দিন লালকমল-নীলকমলের পথ চেয়ে থাকে । শিউলিও তার লালমামা নীলমামার কথা জিজ্ঞেস করে । লক্ষ্মী-লিওন দুবেলা খোঁজ নিয়ে যায় । পরীক্ষিৎ ছেলে দুটোর ভবিষ্যৎ জানতে চেয়ে নানা জায়গায় যাতায়াত করে রোজই বিফল হয়ে ঘরে ঘরে ।

দু-ভাইকে বালিসোনায় আর দেখা গেল না । তাদের নিয়ে নানা গুজব এখানকার বাতাসে ভাসে । কখনও শোনা যায়, কোনও দুর্গম অঞ্চলে জেলের দুটি আলাদা সেলে দুজনকে রাখা হয়েছে । কখনও রটে, তারা জেল ভেঙে বেরিয়ে গেছে । এমনও শোনা গেল, পালাতে গিয়ে রক্ষীদের গুলিতে তারা মারা গেছে । শহরের এক অল্পবয়েসি সাংবাদিক বলল, মণিপুর, নাগাল্যান্ড হয়ে লুকিয়ে বালিসোনায় ফেরার পথে সশস্ত্র বাহিনীর চোখে পড়ে গিয়ে গ্রেপ্তার এড়াতে দুজনে একসঙ্গে কপালে রিভলবার ঠেকিয়ে নিজেদের গুলি করেছে ।

পরীক্ষিতের এক প্রাক্তন ছাত্রের তরুণপুত্র গর্বভরে জানিয়ে গেল, লালকমল-নীলকমল ভারতীয় গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে চিনে ঢুকে গেছে ।

মনসা পুজোর আগেরদিন সন্ধেবেলা রান্নাপুজোর বাজার করে ফেরার পথে সাসপেন্ডেড পুলিশ অফিসার নবীন গুছাইত তথাগতর মাধ্যমে খবর পাঠাল, বালিসোনা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বিশেষ আদালতের পথে হ্যান্ডকাফের আঘাতে লালকমল একজন রক্ষীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়ায় তাকে আর্মির গাড়ি থেকে নামিয়ে সেই মুহূর্তে গুলি করা হয়। নীলকমলেরও দ্রুত বিচার শেষ করে তাকে হয়তো মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। গুছাইত বলে পাঠিয়েছে, তাকে এয়ার ফেয়ার সমেত হাজার-পনের টাকা দিলে সে আর্মির হেডকোয়ার্টার থেকে লেটেস্ট খবর এনে দিতে পারে।

টাকা নিয়ে চলে যাবার পর, একদিন মাঝরাতে বিরাট পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে এসে পরীক্ষিৎকে ঘিরে ধরে গাড়িতে তোলবার আগে পর্যন্ত তথাগত বা নীলাঞ্জনারা কেউই গুছাইতের দেখা পায়নি।

পরীক্ষিৎ সারা রাত জেগে বসে বিষাদগাথা লেখে। হঠাৎ যদি রিফিল ফুরিয়ে যায় তাই আরও একটা কালো কালির বলপেন হাতের কাছেই রাখা থাকে। লাল কালি নীল কালির আলাদা দুটো কলমও তার আছে। একটা দিয়ে লালকমলের বাল্য-কৈশোরের কথা যখন যেমন মনে পড়ে লিখে রাখে, অন্যটা দিয়ে একইভাবে নীলকমলের বাল্য-কৈশোর লিখে যায়। তাদের দুঃসাহসিক দুষ্টুমির কথা লিখতে লিখতে কোনও শব্দ চোখের জল পড়ে অবোধ্য আকার নিলে শব্দটি সে নিঃস্ব লোকের শেষ সম্বল আগলানোর মতো তক্ষুনি আবার লিখে ফেলে।

প্রায় পাঁচ বছরের সমুদ্রযাত্রায় দেখা অদ্ভুত যে-সব দেশের কথা তার বালকপুত্রদের বলা হয়নি, সেই সব কথা সেই বালকবয়েসি লালকমল-নীলকমলকে সামনে বসিয়ে রাতের পর রাত শুনিয়ে যাওয়া তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল।

নীলাঞ্জনা সারা বছরই পরীক্ষিতের প্রিয় কিছু জিনিস যেভাবেই হোক জোগাড় করে আনে। গ্রীষ্মে ফলসা, বর্ষায় কদমফুল, শরতে শিউলি, হেমন্তে ছাতিম, শীতে পাটালি গুড়ের পায়েস, বসন্তে সজনেডাটার সুক্তো বাড়ি থেকে বয়ে এনে কালো ভারী একটা টেবিলে পরীক্ষিতের উদ্দেশে পিণ্ডদানের মতো নামিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত সময় শেষ হলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফিরে যায়। নীলাঞ্জনা অনেক আবেদন-নিবেদন করে, পরীক্ষিতের লেখার অভ্যাসের কথা বলে, শেষ পর্যন্ত কারামন্ত্রীর অনুগ্রহে তার হাতের শিকলিবেড়ি খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেও পায়ের ডান্ডাবেড়ি কাটাতে পারেনি।

বংশে আত্মহত্যার ইতিহাস আছে বলে চারখানা কলম রাখার অনুমতি পেতেও নীলাঞ্জনাকে অনেক উদ্যোগ করতে হয়েছে।

একেকদিন কাছে-পিঠে সেপাই সান্ত্রী বা গোয়েন্দা অফিসারকে দেখা না গেলে পরীক্ষিৎ হঠাৎ ঝুঁকে এসে জালের ওপর ঠোঁট চেপে নীলাঞ্জনাকে ফিসফিস করে বলে, ‘একটা

ঘোড়া আর এক বাক্স হোমিওপ্যাথি এনে দেবে? একটা গাধা হলেও হবে। দাও না গো।'



৪৪

দুয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ছাড়া মেঘাবৃত এমনিতে খুব কম কথা বলে । কিন্তু তিস্তার সঙ্গে দেখা হলে তার কথা আর শেষ হয় না । রোজই ছাড়াছাড়ি হবার সময় মনে হয় কী যেন বলা হয়নি ।

দুজনে দুটো উভচর সাইকেলে যখন উড়তে থাকে, তখনও তারা কথা বলে । তখনও মেঘাবৃতই বক্তা । একটু পর পর তিস্তাকে শুধু বলতে হয়, বলো শুনছি । হাওয়া কাটিয়ে মেঘাবৃতর কথা তিস্তার কানে ঠিকমতো পৌঁছচ্ছে কি না তারই প্রমাণ দিতে হয় তাকে । তাতেও কাজ না হলে সাইকেলের সুরেলা বাঁশি বাজাতে হয় । ক্রিং ক্রিংয়ের বদলে সাঁওতালি বাঁশির সুর । লালকমল-নীলকমলের কাছে পাওয়া ।

তিস্তা যদি কথা বলে, মেঘাবৃত সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ওড়ে, শুনতে পাওয়ার প্রমাণ দেয় না । তিস্তা যদি বলে, ‘আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ তুমি?’ মেঘাবৃত উত্তর দেয়, ‘তোমার শিউলি রঙের কথা আমি মেঘের ওপর থেকেও শুনতে পাব । তুমি বিশ্বাস করো না, কিন্তু তোমার কথা আমি দেখতে পাই । সাদা আর কমলা মেশানো । শিউলিফুলের মতো ।’

‘তুমি একটা পাগল! তোমার মেঘাবৃত নাম কে রেখেছে বলো তো! আমি তোমাকে শুধু ‘মেঘ’ বলে ডাকব ।’

‘মেঘ, মেঘা, মেঘু, মেঘবর্ণ, যা খুশি ডাকতে পারো । মেঘাবৃত নামটা আমার পরীক্ষিৎমামার দেওয়া ।’

দূর থেকে দীর্ঘ বকের সারি লম্বা চাঁদমালার মতো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে দেখে দুজনেই সাইকেলের গতিমুখ কিছুটা বদলে নিল ।

‘তোমার মনের সবটাই সাদা, তোমাকে আমি মাঝেমাঝে সাদা মেঘও বলব । আচ্ছা, পরীক্ষিৎমামাকে ছেড়ে দেবার জন্য আমরা গভর্নমেন্টের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারি না? গানের মিছিল থেকে আরও বড় জনমত তৈরি করতে পারি না? গান্ধিজীর মতো অহিংস আন্দোলন তো এখনও করা যায়, তাই না?’

বকের সারির নীচ দিয়ে যেতে যেতে মেঘাবৃত বলল, 'আমার সে শক্তি নেই । অরণ্যদা কিছু করার কথা ভাবছে । লক্ষ্মীমাসিদের সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা হয় ।' বলে চুপ হয়ে গেল ।

'থামলে কেন? বলো, শুনছি ।'

'নীলামাসি, আমার মা- সবাই পরীক্ষিৎমামাকে নিয়ে ভাবছে ।'

তিস্তা ও মেঘাবৃতকে একসঙ্গে সাইকেলে ঘুরতে দেখলে বা আকাশে উড়তে দেখলে নীলাম্বরের মাথা গরম হয়ে ওঠে । তাদের সাইকেল না থামা পর্যন্ত সে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করে ।

কিছুদিন ধরে সব কিছুতেই তার বিরক্তি ও অধৈর্য উমাশশীরও চোখে পড়েছে । তার আলমারি থেকে টাকা চুরি যাবার দুয়েকদিনের মধ্যেই তার মুখের ভাবে, চালচলনে হঠাৎ বদল দেখে উমাশশীর ভাবনা হয় ।

পশ্চিমপাড়ায় এক রাতে একটা মেয়ের ঘরে একজন রাজনৈতিক নেতার ছেলে খুন হওয়ায় ক'দিন পতিতাপল্লিতে যখন-তখন পুলিশি তল্লাসি চলার পর পাড়ায় আবার স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে এল । সেই ভরা ব্যবসার সময় পল্লির লাগোয়া অ্যাসবেসটসের ছাদ দেওয়া নতুন কয়েকটা ঘরে পুলিশ আচমকা তল্লাসি করতে এসে দ্যাখে দরজায় দরজায় 'গৃহস্থের বাড়ি', 'গেরস্তপাড়া', 'ব্রাহ্মণকুটির' লেখা রয়েছে । ব্রাহ্মণকুটিরে হারমোনিয়ামের সঙ্গে মেয়েকণ্ঠে 'রেশম ফিরিরি, রেশম ফিরিরি' শোনা যাচ্ছে ।

পুলিশ অফিসার গানের ভাষা বোঝবার চেষ্টায় দরমার দরজায় কান পাতল । কয়েকটা ছেলে একসঙ্গে কিছু বলছে বলে কারও কথা বোঝা গেল না । গান থামিয়ে মেয়েটা বলল, 'ব্লাউজ খুললে এসট্রা দশ টাকা, লুঙ্গি খুললে এসট্রা কুড়ি । কে আসবে ঠিক করো, বাকি দুজনকে কিন্তু বাইরে অপেক্ষা করতে হবে ।'

দুজন পুলিশ আস্তে দরজা ফাঁক করল । লুঙ্গি ও ব্লাউজ পরা একটা নেপালি মেয়ের সামনে তিনটে ছেলে বসে আছে । তাদের একজন খুব চেনা, সুষমা-স্কুলের উমাশশীর ছেলে নীলাম্বর ।

আজই প্রথম আগের স্কুলের দুজন বন্ধুর সঙ্গে নীলাম্বর এপাড়ায় এসেছিল । মেয়েটার সঙ্গে তাদের তিনজনকে থানায় নিয়ে গিয়ে শুধু মেয়েটার নামে কেস দিয়ে তিনজনকেই ছেড়ে দেওয়া হল । কাউকে খবরটা জানানো হবে না- এই শর্তে মাথাপিছু চারশো করে ঘুষের টাকা নীলাম্বরই প্যান্টের ভেতরের পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিল । এটা আলমারির টাকা চুরির পরদিনের ঘটনা ।

সেই থেকে নীলাম্বরের হাবভাবের বদল উমাশশীর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠল । বিরহ বা উদাস-উদাস ভাব নয়, এ অন্য কিছু । নন্দিনীর ছেলের সঙ্গে তিস্তার মেলামেশার কথা সেও শুনেছে, নীলুর মুখে হয়তো তার মনের সেই ঈর্ষা । ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করা,

ঘুমের সময় ঘুমনো- এসবও আর আগের মতো নেই দেখে উমাশশী সমস্যার মীমাংসা খোঁজে । তিস্তাকে তিলফুল ছুঁতে সে নিজে দ্যাখেনি, কিন্তু তিলখেতে ছোটাছুটির সময় ফুলের ছোঁওয়া তার গায়ে লাগেনি বলে মেনে নেওয়াও তো শক্ত । নীলুর অবস্থা দেখে শেষ পর্যন্ত সন্দেহের সুযোগ নিয়ে তিস্তাকে তিলস্পর্শদোষ থেকে মনে মনে অব্যাহতি দিয়ে উমাশশী তিস্তার মায়ের কাছে ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথাটা পাড়ল ।

'বিয়ের মন বলো, বয়েস বলো, তিস্তার তো এখনও কোনওটাই হয়নি, দিদি । তাছাড়া ও তো লেখাপড়া শেষ না করে নিজের সংসার শুরুই করবে না ।'

'তিস্তাকে একবার ডাকো না ভাই ।'

'ও তো এখন বাড়ি নেই । তোমাদের সুষমা-স্কুলের খুব সুনাম শুনতে পাই, ছেলেটাকে তৈরি করছ? তোমার পরে তো ওকেই সব দায়িত্ব নিতে হবে ।'

'স্কুলের পরিচালনার ভার তো লিওন-লক্ষ্মীর ওপর । ওদের চেষ্টাতেই গতবছর আমাদের হাই স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল হল । সুষমা গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ।'

'সুষমা কি তোমার মেইডেন নেম? মানে কুমারীকালের নাম?'

উমাশশী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মুখ তুলে বলল, 'ও-নাম এখানে আর কে-ই বা জানে! দেখি, দরখাস্ত তো দেওয়া হয়েছে ।

'কিসের দরখাস্ত?'

'স্কুলের নাম বদলাবার ।'

উড়ন্ত সাইকেলের গতিপথ অনুসরণ করে নীলাম্বর বুঝে নিল, ওরা আজ ঘোড়াদহের মাঠে নামবে । বছরে দুবার ধান কাটার পর এই মাঠেই চাষিদের ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা জমিদারি আমল থেকে চলে আসছে । তখন বিজয়ীদের পুরস্কারও দিতেন জমিদারবাবুরা । এখন দেয় ধানের মহাজনরা ।

দুজনে মাঠে নামতেই নীলাম্বর দৌড়ে গিয়ে কপট বিনয়ে হাত জোড় করে বলল, 'দোলের দিন অপরাহ্ণে আমাদের স্কুলের ছাদে ঘরোয়া বসন্ত-উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে । আপনারা পায়ের, থুড়ি, সাইকেলের ধূলি দিয়া, কপালে আবির দিয়া নিজেদের ও অন্যদের আনন্দবর্ধন করিয়া আমাদের বাধিত করিবেন । পত্র ছাড়া নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয় ।'

দুজনে এতক্ষণ শুনছিল, নীলাম্বরের কথা শেষ হতেই হো হো করে হেসে উঠল ।

নীলাম্বর বলল, 'তোমাদের কিন্তু আসতেই হবে । আবির খেলা হবে, গান হবে, ভালো সরবতের সঙ্গে জলযোগের ব্যবস্থাও থাকবে ।'

রাস্তা দিয়ে ফেরার সময় মেঘাবৃত নীলাম্বরকে সাইকেলে তুলে নিল ।

হিন্দি ও বাংলায় হোলির গানের পর তিনটি রবীন্দ্রসংগীত শেষ হতে আবির দেওয়া শুরু হল । সমবয়সিদের কপালে ও বড়দের পায়ে ছাড়া শরীরের আর কোথাও আবির

দেওয়া বারণ।

মিষ্টিমুখের শুরুতেই ছোট-বড় সবাইকে মাটির গেলাসে শাঁস ঘেঁটে দেওয়া ডাবের জল, রূহআফজা সিরাপ, দুধ-বাদাম-মধু দিয়ে সরবত, বাদামবাটা মেশানো সিদ্ধি যার যার পছন্দমতো পরিবেশন করা হল।

'তুমি কী নেবে?' এক হাতে সিদ্ধি, আরেক হাতে দুধ-বাদাম-মধুর সরবত তিস্তার সামনে ধরে নীলাম্বর অপেক্ষা করে আছে।

তিস্তা হেসে হাত বাড়িয়ে সরবতের গ্লাস নিল।

'তুমি, মেঘাবৃত?'

'আমাকেও সরবত দিতে পারো।'

নীলাম্বর মেঘাবৃতর সরবত নিয়ে না ফেরা পর্যন্ত তিস্তা গ্লাস হাতে বসে থাকে, সাদামেঘের সঙ্গে গ্লাস ঠোকাঠুকি করে পান করবে।

নীলাম্বর মেঘাবৃতর হাতে সরবত তুলে দিয়ে আরেজনকে রূহআফজার লাল সরবত দিতে চলে গেল।

তিস্তা মেঘাবৃতর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে নিজের গ্লাসটা তাকে দিয়ে খুশিতে চোখে-চোখে হাসল।

মেঘাবৃতর সরবত শেষ হয়েছে দেখে নীলাম্বর কাছে এসে দুজনের চোখে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আরেক গ্লাস হবে নাকি? এবার একটা সিদ্ধি নিয়ে দেখবে? সব কিন্তু বাবার কয়লাখনির সময়কার ওস্তাদ কারিগরের পাকা হাতের কাজ। পুরী-মোহনভোগও ওরাই বানাচ্ছে। খাঁটি ঘিয়ের। হতে আরও খানিকটা সময় লাগবে। পোস্ত দিয়ে হাতে-গরম আলুর খোসাভাজা আসছে, এক গ্লাস সিদ্ধি এনে দিই?'

'আমাকে আর-এক গ্লাস ওই দুধ-বাদামের সরবত দিতে পারো।'

'তিস্তা, তোমাকে?'

'আগেরটা সরবতের বদলে সিদ্ধি দাওনি তো? মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে।'

'সরবত খেয়ে মাথা ঝিমঝিম! তাহলে এক গ্লাস সিদ্ধি খেয়ে দেখো, মাথা ছেড়ে যাবে।'

নীলাম্বর একহাতে সরবত, আরেক হাতে সিদ্ধি এনে দুজনকে দিয়ে গেল।

তিস্তা চুমুক দেবার আগে মেঘাবৃত তার হাত থেকে সিদ্ধির বড় গ্লাসটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের সরবত তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এতটা সিদ্ধি খেলে আর দেখতে হবে না! তুমি সরবতেই থাকো।'

সরবতের চমৎকার স্বাদে ও মৃদু নেশায় নীলাম্বরের হাত থেকে তৃতীয় বারের সরবতও নিয়ে মজার খেলা হিসেবে নিজেদের মধ্যে পালটা-পালটি করে নিল।

তিস্তা একচুমুকে অর্ধেক গ্লাস শেষ করে মেঘাবৃতর একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'চলো না, আমরা আকাশে উড়ি!'

মেঘাবৃত জড়ানো গলায় বলল, 'তোমার নেশা হয়ে গেছে। চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'আমি বাড়ি যাব না। আমার মোটেই নেশা হয়নি। আমি মেঘের মধ্যে উড়ব। চলো, আমরা দুজনে উড়ে বেড়াই।'

মেঘাবৃত তিস্তার চোখে নিজের ঘোর-লাগা চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে মেঘের মধ্যে থাকবে? আমি বাসা বানাব?'

চতুর্থ দফায় মেঘাবৃত সিদ্ধি নিল, তিস্তা নিল সরবত। এবার তিস্তাই জোর করে গ্লাস বদলে নিল।

অর্ধেক গ্লাসও শেষ হয়নি, তিস্তা দুহাতে নিজের মাথা শক্ত করে চেপে ধরে 'অসহ্য যন্ত্রণা, অসহ্য যন্ত্রণা, মাথা জ্বলে যাচ্ছে, মাথা বার্স্ট করবে' বলতে বলতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

চেঁচামেচি শুনে নীলাম্বর দৌড়ে এল। তিস্তার আধখাওয়া সরবতের গ্লাস তুলে নিয়ে আর্তনাদ করে উঠল, 'এ কি! এ তো সিদ্ধি!' এবার মেঘাবৃতর দিকে চেয়ে, 'এটা তোমাকে দিয়েছিলাম! তোমার প্রথম সরবতটা তুমি খেয়েছিলে?'

'আগে ডাক্তার, এখুনি একজন ডাক্তার চাই!' বলতে বলতে সে কোলে করে নিজেই তিস্তাকে হাসপাতালে নিয়ে চলল।

'আমি গাড়ি বের করতে বলছি। চলো, তুমি আমি দুজনে ধরে গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাই। পয়লা সরবত তুমি খেয়েছিলে?'

'তিস্তা গ্লাস বদলাবদলি করে নিয়েছিল।'

হাসপাতালে পেট পাম্প করে সবটুকু সরবত তুলে ফেলেও তিস্তার মাথার যন্ত্রণা কমল না। তাকে একসপ্তাহ পর্যবেক্ষণে রাখা হল। নিওরোলজির ডাক্তার যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করে, গ্লাসের অবশিষ্ট সরবতের রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রায় দিলেন, 'মেয়েটাকে পাগল করে দেওয়া হয়েছে। চার-গ্লাস সরবতের মধ্যেই ধুতরোর বিচি বেটে মেশানো হয়েছিল। মধুর পরিমাণ খুব বেশি ছিল বলে জিভে টের পাওয়া যায়নি।'

পুলিশ কয়লাখনির পুরনো লোক, বাড়ির অন্যান্য কাজের লোক, উমাশশী, নীলাম্বর, মেঘাবৃত- সবাইকে আলাদা আলাদা জেরা করে শেষ পর্যন্ত নীলাম্বরকে গ্রেপ্তার করল। ধুতরো বাটার শিল-নোড়াও সঙ্গে নিয়ে গেছে। যে মেয়েটি বেটেছে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হল। কী বাটছে না জেনে সে শুধু দাদাবাবুর নির্দেশ মতো বেটেছে।

পুলিশি হেপাজত ও জেল হেপাজতে মিলিয়ে ন-মাস আটক থাকার পর বড় বড় উকিলদের যুক্তিতর্কে একমত হয়ে বিচারক আসামীকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিলেন। দুটি

শর্ত, বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসামী বালিসোনার বাইরে যেতে পারবে না এবং প্রতি সপ্তাহে একবার করে থানায় হাজিরা দিতে হবে ।

হাসপাতালে, বাড়িতে, নার্সিং হোমে অনেক চিকিৎসা করিয়েও তিস্তার সুস্থ মনটাকে আর জাগানো গেল না । সিদ্ধ যোগীপুরুষের মন্ত্রপড়া ছাই মাথায় দিয়ে, নানা জনের পরামর্শে নানান শেকড়বাকড় শুঁকিয়ে, মন্ত্রপূত লোহার বালা পরিয়ে, কিছুতেই মানসিক সুস্থতার সামান্য লক্ষণও দেখা গেল না । এই ঘটনার পর বালিসোনার কোনও কোনও বাড়িতে দোল খেলাই বন্ধ হয়ে গেল ।

তিস্তাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার পর যখনই মেঘাবৃত তার কাছে গিয়ে নির্বাক বসে থাকে, তখনই অন্তত একবার সে বলবে, 'আমাকে মারতে চেয়েছিলি, তার বদলে তিস্তার জীবনটা শেষ করে দিলি কেন?' একথা সে কার উদ্দেশে বলে সবাই জানে, কিন্তু এ বাড়িতে কথাটা কাকে শোনায় সে নিজেও জানে না ।

বাড়ির ঝিরা সবাই মিলে তিস্তাকে জোর করে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে স্নান করাবার পর সে আর জামাকাপড় পরবে না । হাতের কাছে লাঠি, খুন্তি, ঝুলঝাড়া, যা পাবে তা-ই নিয়ে সে মা-কালীর বেশে উঠোনের কাক মারতে যায় । শেষ পর্যন্ত তাকে নিজের ঘরে ঢুকিয়ে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়াবার পর জামাকাপড় পরানো হয় ।

সব শুনেও উমাশশী নীলাম্বরকে অপরাধী ভাবতে পারল না । তার ধারণা, তার ছেলেকে বিনা দোষে যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে । তিস্তার যে এরকম কিছু ঘটবে সে তো আগেই জানত । তিলফুল তুলে মা-লক্ষ্মীই নিস্তার পাননি, এ তো এক সামান্য মেয়ে ।

কলকাতার সরকারি হাসপাতালের নিউরোলজির প্রফেসর-ডাক্তার, পরীক্ষিতের স্কুলের বন্ধু সুব্রত একদিন এসে তিস্তাকে পুরো তিনঘন্টা পর্যবেক্ষণ করে বেশ কয়েকটা ওষুধ বন্ধ করে, কয়েকটা বদলে দিয়ে বিধান দিলেন- পিসবোর্ডে ভালো করে রাংতা সেঁটে কালীর হাতের খড়্গের মতো একটা খড়্গা বানিয়ে রোগীর চোখের সামনে রেখে দিন ।

খড়্গা দেখে তিস্তা ক্রমশ শান্ত হল । চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কালীর বেশে কাক তাড়া করে উঠোনময় ছুটে বেড়ানো এখন বন্ধ হয়েছে । বেশির ভাগ সময় সে হাতের খড়্গা কখনও কোলে নিয়ে কখনও বুকে নিয়ে, সেটাকে নাচাতে নাচাতে 'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে' বলতে বলতে একসময় হুহু করে কেঁদে ওঠে ।

সরস্বতীপুজোর দিন সকালে রোজকার গামছা-পরা শুচিবায়ুগ্রস্ত গয়লার বদলে তার জিনস পরা ছেলেটা দুধ দিতে এলে তিস্তা ঝাঁপিয়ে পড়ে খড়্গাটা তুলে নিল । এক লাফে ছেলেটার সামনে গিয়ে দুহাতে খড়্গাটা উঁচিয়ে ধরে কুড়ুলের কোপের মতো গয়লার ছেলের মাথায় মারল । ছেলেটার নাক কেটে রক্ত পড়তে লাগল, কপালেও অনেকখানি কেটে গেছে ।

অরণ্য একদিন গভীর সহানুভূতিতে মেঘাবৃতর সঙ্গে তিস্তাদের বাড়িতে এল। তার মা-বাবাকে দেখে মনে হল তাঁদের কথা ফুরিয়ে গেছে, জীবন্মৃত অবস্থায় দিন কাটানো ছাড়া তাঁদের আর কিছু করারও নেই।

তিস্তাকে শান্ত হয়ে বসে থাকতে দেখে সাহস করে অরণ্য তার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল, 'তুমি বড্ড কষ্ট পাচ্ছ, বোন। কিসে তোমার একটু শান্তি হবে আমাকে বলো। তোমাকে সুস্থ দেখতে, আগের মতো হাসতে দেখতে তুমি যা বলবে আমরা তা-ই করব।'

তিস্তা মাথা নামিয়ে কোলের খড়োর দিকে চেয়ে শান্ত হয়ে বসে আছে। তাকে পাগল বলে চেনাই যায় না। অরণ্য আগের কথাটা আরেকবার বলতে বলতে থেমে গেল- তিস্তা চোখ খোলা রেখেই ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেছে।

মেঘাবৃত কী ভেবে তার সাইকেলের বাঁশির সুর বাজাতে লাগল। তিস্তার নিদ্রামগ্ন দৃষ্টিতে তার কোনও ছাপ পড়ছে কিনা বোঝা গেল না।



৪৫

সন্ত্রাসবিরোধী আটক আইনে সেনাবাহিনীর অস্ত্র লুঠের অভিযোগে গ্রেপ্তারের এগারো মাসের মাথায় তৃতীয় দফার জেরায়ও লালকমল নীলকমল আগের মতোই জানাল- মালগাড়ির সিল ভেঙে অস্ত্র লুঠের ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না । পাহাড়ে খানিকটা উঠে জঙ্গলের মধ্যে একইরকম কয়েকটা বাক্সের একটা মুখ-খোলা বাক্স থেকে দুজনে দুটো গ্রেনেড তুলে নিয়েছিল । সেই গ্রেনেড দুটোই তাদের হাতে ছিল, পরদিন মিছিলে লোকেদের ছোটাছুটিতে জোর ধাক্কা লেগে হাত থেকে ছিটকে গিয়েছিল । দুজনকে আলাদা আলাদা এবং একসঙ্গে জেরা করেও এর বেশি আর কিছু জানা যায়নি ।

তৃতীয় বারের জেরার বেশ কিছুদিন পর একদিন গভীর রাতে দুজন সান্ত্রী এসে তাদের কুঠুরির দরজা খুলে দুজনকে আর্মির ট্রাকে তুলে দিল । পরদিন ভোর রাতে পাহাড়ি গ্রামের রেল স্টেশনের অনেকটা আগে গাড়ি থামিয়ে সঙ্গের সেনা অফিসার বললেন, 'এখানেই তোমাদের নামিয়ে দেওয়া হবে । পাহাড়ে জঙ্গলের ঠিক যেখানে গ্রেনেড পেয়েছিলে সেই জায়গাটা এদের দেখাবে । তোমাদের দেখে পাহাড়ের সন্ত্রাসবাদীরা যদি আক্রমণও করে তোমাদের ভয় নেই, সঙ্গে সঙ্গেই তাদের গুলি করা হবে ।'

দুই ভাইয়ের হ্যান্ডকাফ খুলে ছেড়ে দেওয়া হল । একই সময়ে ট্রাক থেকে নেমে সাধারণ পোশাকের ছ-জন এদিক ওদিক কে কোথায় মিলিয়ে গেল, দু-ভাই জানবার সুযোগই পেল না ।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর নীলকমল প্রথম জায়গাটা দেখতে পেয়ে ভাবছে কাকে দেখাবে, এদিক-ওদিক তাকাবার আগেই একজন বুড়ো ডাকহরকরা পাহাড়ের গা বেয়ে ঝুমঝুম শব্দে নেমে এসে বলল, 'ঠিক আছে, ট্রাকের কাছে ফিরে যাও ।'

দু-ভাই সাবধানে পা ফেলে জঙ্গল থেকে বেরতে যাচ্ছে, গর্ত থেকে সাপের মতো চারজন লিকলিকে চেহারার যুবক জঙ্গল ফুঁড়ে এসে তাদের ঘিরে ধরল । দুজনের হাতে রিভলবার, একজনের দুহাতে দুটো, দুজনের হাতে বন্দুক । গামছা দিয়ে সকলের মুখ বাঁধা । 'তোরাই সেই স্পাই!' বলে খুঁড়িয়ে হাঁটা লোকটা লাফিয়ে এসে লালকমল-নীলকমলের

কপালে দুহাতে দুটো রিভলবার ঠেকিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে বলল, 'চল শালা, খোচরের বাচ্চা!' কয়েক পা এগিয়ে খোঁড়াটাই সঙ্গের অন্য দুজনকে বলল, 'আলো ফোটবার আগেই হাত-পা কাটা ধড় দুটো স্টেশনের কাছে ফেলে আসবি। 'গুপ্তচরের শাস্তি' লেখা কাগজ-দুটো মুণ্ডু দিয়ে চাপা দিয়ে রাখবি!'

লালকমল-নীলকমলকে নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরবার মুখে সশস্ত্র চারজনই মাথায় গুলি খেয়ে গুলি চালাবার আগেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

'খান্ডেলওয়ালা, তোমার ট্র্যাপ খুব কার্যকর হয়েছে। ওয়েল প্ল্যান্ড, ওয়েল লেড আউট। অ্যান্ড ইট ইন্ডেড দ্য ভেরি বেস্ট রেজাল্ট।' ট্রাকে অপেক্ষায় থাকা অফিসার অপারেশন করে ফেরা ছ'জনের দলটার লিডারকে একথা বলে লালকমল-নীলকমলকে দেখিয়ে আবার বললেন, 'নাউ উই আর কনভিন্সড, দে আর ইনোসেন্ট।'

'ইয়েস স্যার, দে অলসো হেল্পড আস গেট ক্লোজার টু দ্য মিলিটারি ওয়াগান ব্রেকার। এই জঙ্গলেই তাদের ডেরা। ডিলেড কম্বিংয়ে তারা আরও গভীর জঙ্গলে সরে যাবে।'

চলন্ত ট্রাক থেকে ওয়ারলেসে কোড ল্যাঙ্গোয়েজে দূরের কারও সঙ্গে বার্তা চালাচালি চলতে লাগল। কর্নেল খাণ্ডেলওয়ালা ওয়ারলেসেই লালকমল-নীলকমলের উদ্দেশে ক্যাপ্টেন বিৎসের অভিনন্দন শুনিয়ে দিলেন।

নিরাপত্তার কারণে লালকমল-নীলকমলকে আরও তিন মাস বি-এস-এফ গেস্ট হাউসে অন্তরীণ রেখে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হল।

অনেকদিন পর এক রবিবার ভোরের ট্রেনে বালিসোনা পৌঁছে দুজনে বাড়িতে ঢোকার আগে রাসমাঠের সামনে এসে থমকে গেল। মাঠের সামনের অংশ জুড়ে বিরাট একটা অট্টালিকার অল্প খানিকটা গাঁথা হয়ে পড়ে আছে। বেশিটাই নিমচারা খেজুরচারা চোরকাঁটা বুনো লতাগুল্মে ঢাকা। তার পিছনে গানের মিছিল বেরবার তোড়জোড় চলছে। আগের মতো দৈর্ঘ্য আর নেই, কিন্তু পুরো মিছিল জুড়ে শুধুই বিষাদগাথা।

সাদা কাগজে, সাদা কাপড়ে লাল-কালো কালিতে লেখা পরীক্ষিতের নানা সময়ের লেখার টুকরো উঁচুবাড়ির বারান্দা থেকে পড়া যায় না, দূর থেকে শুধু সাদা প্ল্যাকার্ড আর ফেস্টুনের ঢেউ চোখে পড়ে। তবে কয়েকশো মানুষের একসঙ্গে গাওয়া গান বালিসোনার সব জায়গা থেকে শোনা যাচ্ছিল।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন-পুরনো অনেকে এসে মিছিলে যোগ দিল। নন্দিনীও এই প্রথম গানের মিছিলে এসেছে। অরণ্য অনেক কাল পরে আবার নিয়মিত আসতে শুরু করেছে।

জনশূন্যি মোড়ে মিছিলের সামনের দিকে কিসের গোলমালে সমবেত গান ক্রমশ এলোমেলো হয়ে গেল। প্রথমে মনে হয়েছিল মিছিলে লালকমল-নীলকমলের ভূত দেখার গুজবে ভয় পেয়ে অনেকে পালাচ্ছে, অনেকে গানের খেই হারিয়ে ফেলেছে। আসল

ব্যাপারটা কী বুঝতে লক্ষ্মী-সরস্বতী, লিওন, চিরন্তনী এগিয়ে গিয়ে দেখল, বন্ধ একটা রেশন দোকানের রোয়াকে আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলা যুবক-যুবতীদের দলটা সকলে মিলে নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে শুধু আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলে চলেছে । তারা নাকি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ বর্ণনা করছে । তা দেখতে হাটভাঙা মানুষ রাস্তায় এসে ভিড় করেছে । কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে একজন একটা মেয়ের গা থেকে শাড়ি ধরে টেনেই চলেছে, মেয়েটাও উল্টো পাকে ঘুরে যাচ্ছে । সবটা খোলার কিছু আগে বস্ত্রহরণ থামিয়ে দলের অন্যরা কতগুলো ঝুলি খুলে উৎসাহী জনতাকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব জিনিস দেখাতে লাগল । প্রত্যেকটা জিনিসের সঙ্গে কাগজে জিনিসটার গুণ লেখা আছে । কোনওটা কুরূপাকে সুরূপা করে, কোনওটা চোখে দিলে নারী পুরুষ পরস্পরের দৃষ্টির বশীভূত হয়, কোনওটা মধু মিশিয়ে খেলে বৃদ্ধ বয়েসে যৌবন ফিরে পাওয়া যায়- এরকম আরও অনেক জিনিস চোখের নিমেষে বিক্রি হয়ে যাবার পর আবার বস্ত্রহরণ শুরু হল ।

শাড়ি খুলেই চলেছে । পুরোটা খুলে যাবার পর দেখা গেল বুকে দুটো নারকোল মালা লাগানো ল্যাঙট-পরা একটা লোক দ্রৌপদী সেজেছিল । শুধু হাত-মুখের আকারে-ইঙ্গিতে দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ পালার কথা শুনে প্রথমে যারা এসেছিল, তার পরও অনেকে এসেছে, তাদের ধারণা ছিল রাস্তায় নাচগানের আসর বসেছে । তারও পরে যারা এসেছে তারা কিছু শোনেওনি, ভাবেওনি, ভিড় দেখে চলে এসেছে । ফলে রাস্তা বন্ধ । মিছিল এগোবার উপায় নেই । বাজারে, স্টেশনে, চৌরাস্তায় আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলা নারী-পুরুষের দল কিছুদিন ধরে অনেকেরই চোখে পড়েছে । পুরুষই বেশি । অচেনা হলেও বোবা-কালা ধরে নিয়ে এইসব মানুষের প্রতি সহানুভূতিতে কেউ বিরক্ত বা বিরূপ হয় না । কিছু দিন পর পর এরকম আরও একটা করে দল এসে এদের সঙ্গে মিশে যায় । এরা সবসময় অন্যদের দেখিয়ে দেখিয়ে, নিজেরা তাদের দিকে না তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে শুধু আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলে ।

লক্ষ্মী-লিওন দুজন ভিড়ের সামনের দিকের কয়েকজনের উদ্দেশে দু-হাত তুলে তাদের কথা শোনবার অনুরোধ জানালে সামনের লোকেরা আগ্রহে লক্ষ্মীদের কাছে এসে নমস্কার করে দাঁড়াল ।

লক্ষ্মী বলল, 'আপনারা যদি রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে এদের মূকাভিনয় দেখেন, গানের মিছিল তাহলে এগিয়ে যেতে পারে ।'

ভিড় থেকে আরও কয়েকজন সামনে চলে এসেছে । কেউ কেউ গানের মিছিলেও কয়েকবার হেঁটেছে । সবাই মিলে রাস্তার একটা পাশ পরিষ্কার করে দিল । হাটের অনেকে মিছিলে চলে এল ।

আরও এগিয়ে এবার সারি সারি মুড়কি-বাতাসার দোকানের সামনে দোকানদারদের সঙ্গে লম্বা জুলফিওলা চাঁদা পার্টির হুমকি-হাতাহাতির ভিড়ে সন্ত্রস্ত পরীকে দেখে লক্ষ্মী

মিছিল ছেড়ে পরীকে উদ্ধার করতে এগিয়ে গেল ।

লক্ষ্মী শক্ত করে তার হাত ধরে আছে । ওই অবস্থায় পরী কেঁদে ফেলে বলল, 'আমার বাতাসার ঠোঙা ধুলোয় পড়ে গেছে! চাঁদার ছেলেরা দোকানদারদের পেটাতে পেটাতে বাতাসার টিন লুট করছিল! তারাও একটা গুণ্ডার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে ।'

গান গাইতে গাইতে দীর্ঘ মিছিল এগোতে লাগল । চাঁদা তোলার ছেলেরাও ততক্ষণে উধাও, লালকমল-নীলকমলের ভূত তারা স্বচক্ষে দেখেছে ।

অরণ্য সুস্থ হয়ে ফিরে এসে বাবাকে আর বাড়িতে দেখেনি ।

দিন-রাতের বেশিটাই সে পরীক্ষিতের পড়ার ঘরে কাটায় । কখনও ঘন্টার পর ঘন্টা পরীক্ষিতের লেখা পংক্তির প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন বানায় । রাতে প্রদীপ এসে পরদার পিছনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কাল পারবি রে পরীক্ষিৎ? নতুন রাস্তার দুধারে অনেক জায়গায় এখনও বীজ ছড়ানো বাকি, বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে । কাল যাবি তো?'

অরণ্য বাবার হয়ে প্রক্সি দেয় 'না প্রদীপদা, কাল পারব না । পরশু তোমাকে নিয়ে নিশ্চয়ই বেরব ।'

'রাতে আমার ঘরে একবার আসিস । অবনীকাকার তৈরি মেডিসিনাল প্ল্যান্টের তালিকায় আরও অনেক গাছ লতা-গুল্ভম আমি যোগ করেছি । একুশ একর খালি জমির একটা ম্যাপও এঁকেছি । তোকে দেখাব ।'

লালকমল-নীলকমলকে সন্ধেবেলা ঘরে ঢুকতে দেখে নীলাঞ্জনা দুহাতে দুজনকে বুকে টেনে নিয়ে একবার লালের গালে একবার নীলের গালে মুখ ঘষতে ঘষতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ।

লাল বলল, 'কান্না না, তোমার হাসি দেখতে এসেছি মা ।'

নীল বলল, 'মাগো, হাসো তো দেখি ।'

চোখের জল নিয়ে নীলাঞ্জনা হেসে ফেলল, 'তোমরা বুঝি এখন দাড়ি কামাও?'

'তুমি আমাদের চিরকাল ছোটই ভাববে?'

নীলের কথার পিঠে লালের সংযোজন, 'আমাদের তুমি যুদ্ধফেরতও বলতে পারো ।'

দুই ছেলেকে তখনও ধরে রেখে নীলাঞ্জনা বলল, 'তোমরা সিগ্রেট ধরেছ! তামাকের বিশ্রী গন্ধ পাচ্ছি!'

লালের অকপট কৈফিয়ৎ- 'রেলে বিরাট পাগড়িওলা এক গুজরাটি বিড়ি-ব্যবসায়ী বস্তাবস্তা বিড়ি নিয়ে ডিব্রুগড় যাচ্ছিল, সে-ই আমাদের দুজনকে দুটো গুজরাটি বিড়ি চাখতে দিয়েছিল ।'

নীল যোগ করল, 'তার মাথায় যেমন দুহাত উঁচু পাগড়ি, তার বিড়িও তেমনই চার ইঞ্চি লম্বা । কাশতে কাশতে আমাদের যা অবস্থা হয়েছিল দেখলে তুমি ভয় পেতে মা । বাবাকে দেখছি না তো!'

পায়ে শেকল দিয়ে বাবাকে জেলে আটকে রাখা হয়েছে শুনে দুভাই শিকারের ওপর সিংহীঝাঁপ মেরে বলল, 'আমরা এখুনি যাব।'

নতুন দুজনের অনুমতি জোগাড় করতে পুরো সপ্তাহ কাটল। দু-ফেরতা মোটা জালের ওপর দুহাতের জোড়া ঘুঁষি মেরে লালকমল চেঁচিয়ে বলল, 'তোমাকে আটকে রাখে সাধ্য কার!' ঘুঁষি ও হুংকার শুনে দুজন কারারক্ষী ও একজন গোয়েন্দা অফিসার একসঙ্গে দৌড়ে এসে প্রথমজন লালকমলের কাঁধে জোর একটা চাপড় মেরে বলল, 'দেশে আইন-কানুন নেই? চুপচাপ দেখে চলে যান!'

'কাঁধ থেকে হাত নামান! আমাদেরও একই প্রশ্ন- এ কি মগের মুল্লুক নাকি?'

নীলকমলের গলার স্বরে ও কথা বলার ধরনে লালকমলের কাঁধ থেকে কারারক্ষীর হাত আপনিই নেমে এল।

লালকমল-নীলকমলকে চিনতে পেরেছে কিনা বোঝা গেল না, তবে পরীক্ষিতের মরা চোখে ঝিলিক দেখা গেল, ফ্যাসফেসে গলায় জোর এনে বলল, 'তোদের সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।' যতবারই জালের ওপর ঝুঁকে কথা বলতে যায়, জালের ওপারে যে-কোনও নড়াচড়া দেখলেই সে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে। কিছু বলতে পারে না।

লালকমল-নীলকমল গোয়েন্দা ও কারারক্ষীদের আলাদাভাবে অনুরোধ করল, 'আপনারা কাইন্ডলি একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়াবেন? বাবা আমাদের কিছু বলতে চাইছেন।'

রক্ষীরা দুজন রাজি হলেও গোয়েন্দা অফিসার এক ইঞ্চিও সরবেন না।

শেষ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান আর্মির ক্যাপ্টেন বিৎসের নামে কাজ হল। পরীক্ষিৎ তবু চোখ ঘুরিয়ে সামনের দু-পাশটা দেখবার চেষ্টা করে জালের ওপর ঝুঁকে এসে বলল, 'কুয়াশাদ্বীপের সাধু আমাকে অনেক ওষুধ দিয়ে গেছে, তোরা একটা ঘোড়া এনে দে, মানুষ বড় কষ্টে আছে রে।'

লালকমল ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বলল, 'বাবা, আমাদের চিনতে পারছ না?'

পরীক্ষিৎ গোঁফ-দাড়িতে হাসি ছড়িয়ে বলল, 'তোরা তো সেই লালকমল-নীলকমল!'

তারপরই চোখের তারা ঘুরিয়ে গায়ের পায়ের শেকল দেখতে দেখতে খুব মৃদু স্বরে বলল, 'আমাকে কেন শেকলে বেঁধেছে রে? কে বেঁধেছে?'

নীলকমল লোহার জালে কপাল ঠেকিয়ে বলল, 'এ শেকল আমরা ভাঙবই।'

লালকমলও একইভাবে জালে কপাল চেপে বলল, 'এই মুহূর্ত থেকে লড়াই শুরু!'

লক্ষ্মী সরস্বতী নীলাঞ্জনা লিওনের সঙ্গে সেদিন সন্ধের আলোচনায় পরীক্ষিতের ব্যাপারে দেশের বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিক সমাজসেবকদের সমর্থনের বিষয়ে বিশদ জানা গেল। বিদেশ থেকেও কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক, দার্শনিকের কাছ থেকে

পরীক্ষিতের মুক্তির জন্য সরকারের কাছে আবেদন মাঝেমাঝে খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছে । এর পাশাপাশি কেস রিওপেন করার বিষয়ে আইনজ্ঞদের সঙ্গে কথা চলছে ।

'আমাদের অ্যাকশন প্ল্যান কোথায়?' লালকমলের কথার পিঠে নীলকমল বলল, 'একটা দিনও আর নষ্ট করা যাবে না ।'

লালকমল-নীকমলের কাছে সকলেই তাদের বন্দীজীবনের কথা জানতে চায় । সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে লালকমল বলল, 'আমাদের কথা শোনবার অনেক সময় পাবে । বাবাকে বাইরে আনা এখন সবচেয়ে বড় কাজ । এটাই আমাদের টপ মোস্ট প্রায়রিটি ।'

রাসমাঠের শপিং মল নির্মাণ নিয়ে হরেন ভদ্রের বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলা ও সেই সূত্রে স্ট্যাটাস কোর মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে অরণ্যকে মেজো-জ্যাঠার বাড়িতে যেতে হয়েছিল । রাতে বাড়ি ফিরে লালকমল-নীলকমলকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'তোদের ফিরে পেয়ে নতুন শক্তি পাচ্ছি রে! বাবাকে এবার মুক্ত করবই । বাবার জন্য খুব বড় অ্যাডভোকেটও মেজো-জ্যাঠা ঠিক করে দিচ্ছে ।'

চৌধুরীবাড়িতে যেন সান্ত্বনার পরব চলছে । নীলাঞ্জনা মিতাকে, সরস্বতী নন্দিনীকে, লালকমল-নীলকমল পরীকে- নিরুপায় হয়ে সবাই সবাইকে সান্ত্বনা দিচ্ছে ।



৪৬

তিস্তাদের বাড়িতে সাইকেলটা রেখে মেঘাবৃত রাত করে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। নীলাম্বর তার তিনবন্ধুকে নিয়ে কোথাও যাবার পথে মেঘাবৃতকে দেখে বলে উঠল, 'তোমার সঙ্গে আমার ভি-ভি-আই-পি কথা আছে, একটু দাঁড়াবে?'

থানায় সাপ্তাহিক হাজিরার দিন বাদে বাকি ছ-দিন নীলাম্বর বন্ধুদের নিয়ে মদের আসর বসায়। পোস্ট অফিসের সামনে এই নির্জন রাস্তায়ও তাদের মুখ থেকে মদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

বন্ধুদের ছেড়ে দিয়ে মেঘাবৃতর একটা হাত টেনে নিয়ে নীলাম্বর বলল, 'এভাবে মনের যন্ত্রণা ভোলা যায় না বন্ধু। শকুন্তলার কাছে চলো, ও সব কষ্ট ভুলিয়ে দেবে।'

'ডাক্তার শকুন্তলা মিত্র, সাইকিয়াট্রিস্ট?'

'সাইকিয়াট্রিস্ট না, পতিগৃহে যাত্রার শকুন্তলাও না, নতুন এসেছে।'

'আমাদের হাসপাতালে? কিসের ডাক্তার?'

'যাব্বাবা! ব্যাটাছেলের জন্য মেয়েছেলের ডাক্তারি তো একটাই।' রহস্যময় হেসে নীলাম্বর আবার বলল, 'তুমি তো লেখাপড়ায় এক নম্বর, বলো তো পণ্ডিত, তপোবনের সেই শকুন্তলার বয়েস কত?'

বিস্ফোরণের আগে ক্রোধ স্তরে স্তরে পুঞ্জীভুত হতে যেটুকু সময় লাগে, সেই সময়টুকুতে নীলাম্বর অবুঝের মতো বলল, 'তুমি হেরে গেলে। আমি বলব? চোদ্দ।'

মেঘাবৃতর চড়ে নীলাম্বর লাট খেয়ে রাস্তায় পড়ে গেল।

বাড়ি ফেরার পরই মেঘাবৃতর মুখ দেখে লালকমল-নীলকমল তার বড় কোনও অঘটন সন্দেহ করেছিল, তিস্তার সম্পূর্ণ কাহিনি শুনে তাদের মনের ভাব কী হল বোঝা গেল না।

পরের সপ্তাহে থানায় হাজিরার আগের রাতে জঙ্গলে নীলাম্বরের ধড়-মুণ্ড পাশাপাশি পাওয়া গেল।

অনেক রাতে লালকমল-নীলকমল প্রদীপের দরজায় টোকা দিতে গিয়ে ভেতরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরেই দ্বিধা ঝেড়ে দরজার বাইরে

থেকে বলল, 'ছোটদাদু, জেগে আছ?'

প্রদীপ সময় নিয়ে ভেতর থেকে গলা তুলে বলল, 'আমি তো লিখছি রে, আমার কি ঘুমোলে চলে?'

আজকাল দরজা খুলতেও তার সময় লাগে ।

সারা ঘর ঝোপঝাড়ে ভরা । ধুলোর গন্ধে দম আটকে আসে । বেশির ভাগ লতা-পাতা শুকনো বিবর্ণ । মরা ডালপালার ফাঁকফেঁাকড় দিয়ে অল্প কয়েকটা সজীব গাছ কোনও রকমে মাথা তুলে আছে । মেঝেময় হিজিবিজি লেখা কাগজ ছড়ানো ।

দরজা খুলে দিয়ে প্রদীপ ভাঙা কোমরে ঝুঁকে হাঁটুতে এক হাত রেখে কয়েক পা হেঁটে মেঝেয় গিয়ে বসে পড়ল ।

ঘাড় না ঘুরিয়ে লালকমল-নীলকমলের উদ্দেশে বলল, 'তোমরা তো কেউ পরীক্ষিৎ না । তোমরা কে?'

ঘরের কোথাও বসবার মতো জায়গা নেই । লালকমল-নীলকমল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দম প্রায় বন্ধ করে প্রদীপের কুঁজো চেহারা দেখছিল, প্রশ্ন শুনে লালকমল বলল, 'আমরা লালকমল আর নীলকমল ।'

'তোমাদের তো ঠিক চিনলাম না ।'

'আমরা পরীক্ষিতের দুই ছেলে ।'

প্রদীপ অবিশ্বাস্য এক ঝটকায় দুজনের দিকে ফিরে বলল, 'সে কী! ভগবান কি সত্যিই আছে নাকি রে!'

নীলকমল এই প্রথম কথা বলল, 'তখন বললে লিখছ, চোখে না দেখে তুমি লেখো কী করে?'

'অক্ষরের চেহারা, শব্দের রূপ কখনও ভোলা যায়!'

'এখন কী লিখছ, ছোটদাদু?'

লালকমলের প্রশ্ন শুনে প্রদীপ তাকে কাছে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কপিখেতের যুদ্ধের ইতিহাস ।'

মেঝেয় বসে তক্তাপোষে বিছানার ওপর কাগজ রেখে প্রদীপ দিনরাত লেখে, দুভাই মেঝে থেকে কয়েকটা কাগজ তুলে নিয়ে দেখল, লাইনের ওপর লাইন, শব্দের ওপর শব্দ জড়াজড়ি হয়ে কিছুই পড়া যায় না ।

নিওরোলজিস্ট সুব্রত সরকারি হাসপাতালের কাজে ইস্তফা দিয়ে কয়েক বছর বিদেশে কাজ করে বালিসোনায় ফিরে এসেছে, এখন এখানেই স্বাধীনভাবে প্র্যাক্টিস করার কথা ভাবছে ।

তার বিদেশি শিক্ষক বিশ্ববিখ্যাত নিউরোলজিস্ট ডাঃ জবাভিতেল কলকাতায় একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয়ে আসছেন শুনে সুব্রত তিস্তার কেস হিস্ট্রি ও

চিকিৎসার বিবরণ আগে ভাগে তাঁর ব্রাটিস্লাভার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিল । সম্মেলনের শেষ দিনের আনুষ্ঠানিক ডিনার বাদ দিয়ে ডাঃ জবাভিতেল সুব্রতর সঙ্গে বালিসোনায় এসে তিস্তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন । অধিকাংশ ওষুধ বন্ধ করে দিয়ে পরামর্শ দিলেন- রোজ তিস্তার নাগালে তার ডানাওলা সাইকেলটা রেখে, তার চোখের সামনে অন্য সাইকেলটা চড়ে তার প্রেমিক যেন মনের আনন্দে উড়ে বেড়ায় । যত উড়বে, যত দূরে যাবে ততই ভালো, তবে একেবারে মেয়েটির দৃষ্টির বাইরে যেন চলে না যায় ।

সেদিন ও তার পরদিন স্নায়ুবিজ্ঞানের অতল রহস্যসন্ধানী গুরুশিষ্য তিস্তাদের বাড়িতে থেকে নিজেরাই রোগীর পরিচর্যা করলেন । ওষুধ ও ইনজেকশানও নিজেরাই দিলেন ।

ন-মাস রোজ একা-একা সাইকেলে উড়ে মেঘাবৃত যখন ক্লান্ত ও বাকিরা হতাশ, চৈত্র-বৈশাখের আগুনে, খ্যাপা ঝড়জলে, শ্রাবণের চারদিক সাদা-করা বৃষ্টিতে তাকে মরিয়া হয়ে সাইকেল চালাতে দেখে সকলেই যখন চিন্তিত, তখন শরতের এক সকালে মেঘাবৃত টের পেল তার থেকে বেশ কিছুটা দূরত্বে অন্য সাইকেলটাও আসছে । ঘাড় ঘুরিয়ে সে ডানামেলা সাইকেলে সাদা প্যান্ট-শার্ট পরা তিস্তাকে দেখতে পেল । ঘন্টির বদলে বাঁশি বাজিয়ে বাঁশিতেই তার উত্তরও পাওয়া গেল ।

আরও পাঁচ মাস পর বসন্তের এক বিকেলে ঘোড়াদহের মাঠে দুজনে সাইকেল নামানোর আগে থেকেই অনেককে তাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ।

সকলের মুখ থমথমে । লিওনার্দো এগিয়ে এসে শান্ত স্বরে, অভ্যাসমতো ধীরে ধীরে মেঘাবৃতকে বলল, ‘অরণ্য নীলাঞ্জনা জেলে চলে গেছে, বালিসোনার বহু মানুষ তাদের সঙ্গে গেছে, পরীক্ষিৎকে নিয়ে ফিরবে বলে । ফিরবে ঠিকই, কিন্তু ফিরবে পরীক্ষিতের মরদেহ নিয়ে । শহরের মানুষও জেলের সামনে ভিড় করে আছে । খবর পাচ্ছি, ভিড় বেড়েই চলেছে । ভিড়ের মধ্যে দিয়ে মরদেহ বালিসোনায় আনতে হয়তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে ।’

লিওনার্দো আরও কী বলতে যাচ্ছিল, মেঘাবৃত বাধা দিয়ে বলল, ‘মরদেহ? তাঁর তো আজ মুক্তি পাবার কথা!’

তিস্তা স্তম্ভিত- ‘মুক্তির কথা শুনেই তো আজ আমরা বড় আনন্দে উড়াল দিয়েছিলাম!’

কথার সঙ্গে তিস্তার দু-চোখ জলে ভরে উঠেছে ।

‘সেটা তোমরা কেউ ভুল শোনোনি । পরীক্ষিতের নিঃশর্ত মুক্তির রায় গতকালই বেরিয়ে গেছে । তা শুনেই বালিসোনার সবাই তাঁকে আনতে শহরে গেছে । কিন্তু আদালতের রায়ের কপি জেলে এসে পৌঁছয়নি বলে কাল তাঁকে ছাড়া যায়নি । আর আজ তার মৃত্যুর খবরটুকু পর্যন্ত ভোরের আগে জানানো হল না ।’

বালিসোনার দীর্ঘতম শবযাত্রায় প্ল্যাকার্ডে ফেস্টুনে পরীক্ষিতের সারাজীবনের কথাগুলো ছাড়া আর কোনও কথা ছিল না । অদ্ভুত নীরবতা ছাড়া কোনও সংগীতও শোনা যায়নি ।

পরীক্ষিতের মৃত্যু প্রদীপের মনে থাকে না। তাকে আর ঘরের বাইরেও বিশেষ দেখা যায় না। অনেকদিন পরে পরে হঠাৎ কখনও কোমর ভেঙে লাঠি ঠুকে ঠুকে পরীক্ষিতের দরজা পর্যন্ত এসে বলে যায়, 'কাল যাবি তো রে, পরীক্ষিৎ? বীজে পোকা ধরে যাচ্ছে!'

অরণ্য গলা পাল্টে উত্তর দেয়, 'কাল পারব না, প্রদীপদা। পরশু নিশ্চয়ই যাব।'

'মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, এখন কাল-পরশু করলে কি চলে! প্রকৃতিকে যারা ভালোবাসে না তারাই শুনছি এগিয়ে আছে।'

একদিন ফাল্গুনের হাওয়ায় তিস্তা-মেঘাবৃত ডানা মেলে অনেক উঁচু দিয়ে সাইকেলে উড়তে উড়তে দেখল, নীচে অরণ্য দুই ভাইকে নিয়ে আধখোড়া নদীখাত পার হয়ে শিমুলবনের ধার দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। তিনজনের চোখ মাটিতে। হয়তো কিছু খুঁজছে।

শিমুলগাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে হঠাৎই একঝাঁক বন্দুকের গুলি এসে লালকমল-নীলকমলের মাথা চুরমার করে দিল। কাগজ বাঁধা দুটো তীরও এসে দূরের মাটিতে গেঁথে গেছে।

মেঘাবৃত-তিস্তা চিলের মতো ডানা গুটিয়ে দ্রুত নেমে এল। তিস্তা অরণ্যের কাছে দৌড়ে গেল, মেঘাবৃত কাগজ দুটোর ভাঁজ খুলে দেখল, দুটোতে একই কথা লেখা- 'গুপ্তচরের শাস্তি।'

পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অরণ্য যখন লালকমল-নীলকমলের কাছে ফিরে এল তখনও তাদের শবদেহের ওপর শতাব্দীর শেষ শিমুলফুল ঝরে পড়ছে।

পুলিশের গাড়িতেই রক্তস্নাত দুই ভাইকে তুলে সকলে মিলে হাসপাতালের দিকে রওনা হল।

নতুন শতাব্দীও একটা 'কথার কথা'-র মতো নিজের পথে এগিয়ে চলে।

বছর বছর বালিসোনায় রক্তপাত বেড়েই চলল। বর্ষাকালে মরা গাঙ যেখানে যতটুকু প্রাণ পায় সেখানকার অস্বচ্ছ জলে রক্ত গিয়ে মিশে যায়।

প্রোমাটারের লোকজন চৌধুরীবাড়ি ভাঙা প্রায় শেষ করে মহালয়ার আগের দিন একতলার একটা বন্ধ দরজা বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে কেটে ফেলল।

শুকনো, মরা, ধুলো খাওয়া গাছপালা লতা-গুল্ভমের মধ্যে আস্ত একটা মানুষের কংকাল দেখেও অরণ্য কথা বলতে পারল না।

কংকালের খবর পেয়ে তরুণবয়সি প্রোমোটর গাড়ি থেকে নেমে হন্তদন্ত হয়ে কাটা দরজায় এসে দাঁড়াল। ভেতরে একপলক চোখ বুলিয়ে অরণ্যকে জিজ্ঞেস করল, 'কে ইনি? আপনার কে হয়?'

বলেই খেয়াল হল লোকটা বোবা। নিজের লোকদের বলল, 'চৌধুরীদের একজন আগের শাসকদলের কিছু একটা ছিল, হয়তো এ-ই। চুপিচুপি পাচার করে দে। করাত

দিয়ে টুকরো টুকরো করে বস্তায় ভরে নিবি ।'

এক যুগ আগে শিমুলতলায় গুলিবিদ্ধ দু-ভাইকে রেখে পুলিশ ডেকে আনার পরই অরণ্য তার ঠাকুর্দার মতো কণ্ঠস্বর হারিয়েছিল, প্রোমোটারের কথায় মুখ বেঁকিয়ে-চুরিয়ে কিছু একটা বলতে চাইল, কিন্তু তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরল না ।